কিতাবুস সুন্নাহ

মুফতী মাওলানা মনসূরুল হক
প্রধান মুফতী, জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
সাত মসজিদ, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

কিতাবুস সুন্নাহ
মুফতী মাওলানা মনসূরুল হক

প্রকাশক
মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান
মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫, ০১৭১১-১৪১৭৬৪

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর ২০০৮ ইংরেজি
ভাদ্র ১৪১৫ বাংলা
রমজান ১৪২৮ হিজরী

কম্পোজ
আসসালাম কম্পিউটার
৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৭১৪৩৫৬০৬৫

প্রচ্ছদ
নাজমুল হায়দার
কালাল ক্রিয়েশন, ঢাকা

মুদ্রণ
মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স
(মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)

৩/খ, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN :984-8291-00-0

মূল্য : ০০ টাকা মাত্র

সুচিপত্র

১

নবীজীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নাত

২
মাসনূন দু‘আ ও দরূদ

দ্বিতীয় অধ্যায়
দরূদ ও সালাম

নামায শিক্ষা ও ইমামদের দায়িত্ব-কর্তব্য

সূচীপত্র

৪
শরঈ পর্দা
সূচীপত্র

৫
জীবনের শেষ দিন
সূচীপত্র

নবীজীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নাত

باسمه تعالى

কুরআনে কারীম তিলাওয়াতের তিনটি বিশেষ উপকার

১. দিলের জং (গুনাহের কালিমা) মুছে যায়।

(শুআবুল ঈমান ৩ : ৩৯, হাঃ নং ১৮৫৯)

২. আল্লাহ তা‘আলার মুহাব্বত বৃদ্ধি পায়।

(সূরা আনফাল, ২/ শুআবুল ঈমান, ৩ : ৩৯৪, হাঃ নং ১৮৬৩)

৩. প্রত্যেক হরফে কমপক্ষে ১০টি করে নেকী পাওয়া যায়, না বুঝে পড়লেও। (তিরমিযী, হাঃ নং ২৯১০, মুস্তাদরাক, হাঃ নং ২০৪০) কেউ যদি বলে, না বুঝে পড়লে কোন লাভ নেই, তাহলে সে ব্যক্তি জাহেল বা বদদ্বীন অথবা উভয়টি।

কুরআনে কারীম তিলাওয়াতের দু‘টি আদব

১. তিলাওয়াতকারী মনে মনে এই ধারণা করবে যে, মহান আল্লাহ তা‘আলা হুকুম দিচ্ছেন- পড়, দেখি আমার কালাম কত সুন্দর করে পড়তে পার।

(৫ মুযযাম্মিল, ৪/ বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৭৫৪৪)

২. আর শ্রবণকারীরা অন্তরে এই ধারণা করবে যে, মহান আল্লাহ তা‘আলার পবিত্র কালাম তিলাওয়াত করা হচ্ছে, সুতরাং অত্যন্ত ভক্তি, মহাব্বত ও মনযোগসহ কুরআন শরীফ তিলাওয়াত শ্রবণ অপরিহার্য। (সূরা আ‘রাফ, ২০৪)

বি.দ্র. কুরআনে কারীম পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন গিলাফে রাখা এবং মাঝে মাঝে গিলাফ ধুয়ে পরিষ্কার করাও কুরআনের তা‘যীমের

অন্তর্ভুক্ত।

তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত

বযুর্গানে দ্বীন তাঁদের অভিজ্ঞতার আলোকে বলেছেন, তিনটি এমন সুন্নাত আছে, যেগুলোর উপর আমল করতে পারলে অন্তরে নূর পয়দা হয় এবং এর দ্বারা অন্য সকল সুন্নাতের উপর আমল করা সহজ হয়ে যায় এবং অন্তরে সুন্নাতের প্রতি আমল করার স্পৃহা জাগ্রত হয়।

১. সহীহ শুদ্ধ করে আগে আগে সালাম করা ও সর্বত্র সালামের ব্যাপক প্রসার করা। (মুসলিম শরীফ, হাঃ নং ৫৪; তিরমিযী, হাঃ নং ২৬৯৯)

বি.দ্র. السلام (আস্-সালামু) এর শুরুর হামযা এবং মীমের পেশ স্পষ্ট করে উচ্চারণ করতে হবে। সালামের উত্তর শুনিয়ে দেয়া ওয়াজিব।

(আলমগিরী, ৫ : ৩২৬)

২. প্রত্যেক ভাল কাজে ও ভাল স্থানে ডান দিককে প্রাধান্য দেয়া। যথা : মসজিদে ও ঘরে প্রবেশকালে ডান পা আগে রাখা। পোশাক পরিধানের সময় ডান হাত ও ডান পা আগে প্রবেশ করানো এবং প্রত্যেক নিম্নমানের কাজে এবং নিম্নমানের স্থানে বাম দিককে প্রাধান্য দেয়া। যথা : মসজিদ বা ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বাম পা আগে রাখা, বাম হাতে নাক পরিষ্কার করা, পোশাক থেকে বাম হাত বা বাম পা আগে বের করা।

(বুখারী শরীফ, হাঃ নং ১৬৮/ মুসনাদে আহমাদ, হাঃ নং ২৫০৪৩) মুস্তাদরাক, হাঃ নং ৭৯১/ মুসলিম শরীফ, হাঃ নং ২০৯৭)

৩. বেশি বেশি আল্লাহ তা‘আলার যিকির করা।

(সূরায়ে আহযাব, ৪১/ মুস্তাদরাক, হাঃ নং ১৮৩৯)

তাছাড়া ক. উপরে ওঠার সময় আল্লাহু আকবার, নীচে নামার সময় সুবহানাল্লাহ, সমতল ভূমিতে চলার সময় লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ্ পড়তে থাকা।

(বুখারী শরীফ, হাঃ নং ২৯৯৩/ তিরমিযী, হাঃ নং ৩৩৮৩)

খ. প্রতিদিন কুরআনে কারীম থেকে কিছু পরিমাণ তিলাওয়াত করা বা অন্যের তিলাওয়াত শ্রবণ করা।

(মুসলিম, হাঃ নং ৭৯১/ বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৫০৩৩)

গ. পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর সুন্নাত থাকলে সুন্নাতের পরে নতুবা ফরযের পরে তিনবার ইস্তিগফার, একবার আয়াতুল কুরসী, একবার সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক্ব, সূরা নাস এবং তাসবীহে ফাতেমী অর্থাত ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ্, ৩৩ বার আল-হামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়া।

(মুসলিম শরীফ, হাঃ নং ৫৯১/ ইমাম নাসায়ীর সুনানে কুবরা, হাঃ নং ৯৮৪৮, তাবারানী কাবীর, হাঃ নং ৭৫৩২/ নাসায়ী শরীফ, হাঃ নং ১৩৩৬/ আবু দাউদ, হাঃ নং ১৫২৩/ মুসলিম শরীফ, হাঃ নং ৫৯৬)

ঘ. সকাল-বিকাল তিন তাসবীহ আদায় করা অর্থাত ১০০ বার কালিমায়ে সুওম-সুবহানাল্লাহি ওয়াল্ হামদুলিল্লাহি ওয়া লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, ১০০ বার ইস্তিগফার ও ১০০ বার কোন সহীহ দরূদ শরীফ পড়া।

(মুসলিম শরীফ, হাঃ নং ২৬৯২, ২৬৯৫/ মুসলিম, হাঃ নং ২৭০২/ ইতহাফ, ৫ : ২৭৫)

ঙ. প্রত্যেক কাজে মাসনূন দু‘আ পড়া।

(মুসলিম, হাঃ ৩৭৩/ তিরমিযী শরীফ, হাঃ নং ৩৩৮৪)

ইস্তিঞ্জার সুন্নাতসমূহ

১. মাথা ঢেকে রাখা। (বাইহাকী শরীফ, হাঃ নং ৪৫৬)

২. জুতা-সেন্ডেল পরিধান করে যাওয়া।

(তাবাকাতে ইবনে সাআদ’, ১৮৫/ কানযুল উম্মাল, হাঃ নং-১৭৮৭২)

৩. পায়খানায় প্রবেশের পূর্বে এই দু‘আ পড়া :

بسم الله اللهم انى اعوذبك من الخبث والخبائث

(মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ, হাঃ নং ৫)

৪. দু‘আ পড়ার পর আগে বাম পা ঢুকানো। (আবু দাউদ, হাঃ নং ৩২)

৫. কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ দিয়ে না বসা। (বুখারী শরীফ, হাঃ নং ১৪৪)

৬. যথাসম্ভব বসার নিকটবর্তী হয়ে ছতর খোলা এবং বসা অবস্থায় পেশাব ও পায়খানা করা, দাঁড়িয়ে পেশাব না করা।

(নাসায়ী শরীফ, হাঃ নং ২৯/ তিরমিযী শরীফ, হাঃ নং ১৪)

৭. পেশাব ও নাপাক পানির ছিঁটা হতে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বেঁচে থাকা। (বুখারী শরীফ, হাঃ নং ২১৮)

৮. পানি খরচ করার পূর্বে ঢিলা-কুলুখ (বা টয়লেট পেপার) ব্যবহার করা।

(বাইহাকী, হাঃ নং ৫১৭)

৯. ঢিলা ও পানি খরচ করার সময় বাম হাত ব্যবহার করা।

(বুখারী শরীফ, হাঃ নং ১৫৪)

১০. পেশাবের ফোঁটা আসা বন্ধ হওয়ার জন্য আড়ালে সামান্য চলাফেরা করা। (ইবনে মাজাহ শরীফ, হাঃ নং ৩২৬)

১১. যেখানে পেশাব ও পায়খানার জন্য নির্ধারিত কোন জায়গা নেই, সেখানে এমনভাবে বসা যেন ছতর নজরে না পড়ে। (আবু দাউদ হাঃ নং ২)

১২. পেশাবের জন্য নরম বা এমন স্থান তালাশ করা যেখান থেকে পেশাবের ছিঁটা শরীরে বা কাপড়ে না লাগে। (আবু দাউদ, হাঃ নং ৩)

১৩. ঢিলা-কুলুখ ব্যবহারের পর পানি ব্যবহার করা।

(সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাঃ নং ৮৩)

১৪. ডান পা দিয়ে বের হওয়া। (আবু দাউদ, হাঃ নং ৩২)

১৫. বাইরে এসে এই দু'আ পড়া :

غفرانك الحمد لله الذى اذهب عنى الاذى وعافانى

(আবু দাউদ, হাঃ নং ৩০ : ইবনে মাজাহ, হাঃ নং ৩০১)

উযুর ফরয ৪টি

১. সমস্ত মুখ একবার ধৌত করা। (সূরা মায়িদা, আয়াত নং ৬)

২. দুই হাত কনুইসহ একবার ধৌত করা। (ঐ)

৩. মাথার এক চতুর্থাংশ একবার মাসাহ করা। (ঐ)

৪. উভয় পা টাখনুসহ একবার ধৌত করা। (ঐ)

ফায়দা : উপরোক্ত চারটি কাজের কোন একটি না করলে বা এর মধ্যে এক চুল পরিমাণও শুকনা থাকলে উযু সহীহ হবে না।

(প্রমাণ : শামী, ১ : ৯১/ আল বাহরুর রায়িক, ১ : ৯/ হিদায়া, ১ : ১৬)

উযুর সুন্নাতসমূহ

১. উযুর নিয়ত করা অর্থাত উযুকারী মনে মনে এই নিয়ত করবে যে, পবিত্রতা অর্জন করা ও নামায জায়েয হওয়ার জন্য আমি উযু করছি।

(সূরা বায়্যিনাহ, ৫/ বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৬৬৮৯)

২. বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়ে উযু আরম্ভ করা। হাদীসে পাকে আছে, বিসমিল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহ পড়ে উযু করলে যতক্ষণ ঐ উযু থাকবে, ফেরেশতাগণ তার নামে ততক্ষণ অনবরত সাওয়াব লিখতে থাকবে, যদিও সে কোন মুবাহ কাজে লিপ্ত থাকে।

(নাসায়ী শরীফ, হাঃ নং ৭৮/ তাবারানী সাগীর, ১ : ৭৩)

৩. উভয় হাত পৃথকভাবে কব্জিসহ তিনবার ধোয়া।

(বুখারী শরীফ, হাঃ নং ১৫৯)

৪. মিস্ওয়াক করা। যদি মিস্ওয়াক না থাকে তাহলে আঙ্গুল দ্বারা দাঁত মাজা মিস্ওয়াক অর্ধ হাতের চেয়ে বেশি লম্বা না হওয়া এবং গাছের ডাল হওয়া মুস্তাহাব।

(মুসনাদে আহমাদ, হাঃ নং ৯২১৬, ১৩৯, ৩৯৯০/ তিরমিযী, হাঃ নং ২৩/ বাইহাকী, হাঃ নং ১৭৪)

৫. তিনবার কুলি করা। (বুখারী শরীফ, হাঃ নং ১৮৫)

৬. তিনবার নাকে পানি দেয়া এবং নাক সাফ করা।

(সহীহ ইবনে হিব্বান, হাঃ নং ১০৭৭)

৭. ততসঙ্গে প্রতিবারই নাক ঝাড়া। (মুসলিম শরীফ, হাঃ নং ২৩৬)

৮. প্রত্যেক অঙ্গকে পূর্ণভাবে তিনবার করে ধোয়া। (বুখারী শরীফ, হাঃ নং ১৫৯) এর জন্য তিনবারের বেশি পানি নিতে হলে নিবে।

৯. দুই হাতে মুখ ধোয়া এবং মুখমণ্ডল ধোয়ার সময় দাড়ি খিলাল করা।

(তিরমিযী, হাঃ নং ৩১)

১০. হাত ও পা ধোয়ার সময় আঙ্গুলসমূহ খিলাল করা।

(তিরমিযী, হাঃ নং ৩৮)

১১. একবার সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ্ করা। (তিরমিযী, হাঃ নং ৩৪)

১২. উভয় কান মাসহ করা। উল্লেখ্য, কানের ছিদ্রের মধ্যে কনিষ্ঠ আঙ্গুল ঢুকিয়ে এবং ভিতর দিকে অবশিষ্ট অংশে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা মাসাহ করা।

(তিরমিযী, হাঃ নং ৩৩/ আবু দাউদ, হাঃ নং ১৩৫)

১৩. উযুর অঙ্গসমূহ হাত দ্বারা ঘষে-মেজে ধোয়া।

(মুস্তাদরাক, হাঃ নং ৫৭৬/ সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাঃ নং ১১৮)

১৪. এক অঙ্গ ধোয়ার পর অন্য অঙ্গ ধৌত করতে বিলম্ব না করা।

(মুসলিম, হাঃ নং ২৪৩/ আবু দাউদ, হাঃ নং ১৭৩)

১৫. তরতীবের সাথে উযু করা। অর্থাত উযুর অঙ্গসমূহ ধোয়ার সময় ধারাবাহিকতা বজায় রাখা। (আবু দাউদ, হাঃ নং ১৩৭)

১৬. ডান দিকের অঙ্গ আগে ধোয়া। (বুখারী শরীফ, হাঃ নং ১৬৮)

১৭. শীত অথবা অন্য কোন কারণে যখন উযু করতে ইচ্ছে না হয়, তখনও উযুর অঙ্গসমূহ উত্তমরূপে ধুয়ে উযু করা।

(তিরমিযী, হাঃ নং ৫১/ মুসলিম, হাঃ নং ২৫১)

১৮. উযুর মধ্যে নিম্নোক্ত দু‘আটি পড়া :

اللهم اغفرلى ذنبى ووسع لى فى دارى وبارك لى فى رزقى

(আমালুল্‌য়াওমি ওয়াল লাইলি লি ইবনিসসুন্নী, হাঃ নং ২৮)

এবং উযু শেষ করে কালিমায়ে শাহাদাত পড়া।

(মুসলিম শরীফ, হাঃ নং ২৩৪)

অতঃপর এ দু‘আ পড়া :

اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين

(তিরমিযী, হাঃ নং ৫৫)

উল্লেখ্য, গোসল এবং তায়াম্মুমের শুরু ও শেষে উযুতে বর্ণিত দু‘আ পড়বে।

বি.দ্র. শুধু এ সব বর্ণনা পড়ার দ্বারা সুন্নাত তরীকায় উযু করা সম্ভব নয়, এ জন্য কোন হাক্কানী আলেম থেকে সব বিষয়গুলো চাক্ষুষভাবে দেখে নিবে। আল্লাহ তা‘আলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে সকল বিষয় চাক্ষুষভাবে দেখিয়ে শিক্ষা দিয়েছেন।

(তিরমিযী, হাঃ নং ১৪৯)

গোসলের ফরয তিনটি

১. ভালভাবে একবার কুলি করা। (সূরা মায়িদা, আয়াত নং ৬)

২. নাকের নরম স্থান পর্যন্ত একবার পানি পৌঁছানো। (ঐ)

৩. সমস্ত শরীরে একবার পানি পৌঁছে দেয়া, যেন কোথাও এক চুল পরিমাণ শুকনো না থাকে।

(ঐ/ তিরমিযী, ১০৩; আল বাহরুর রায়িক, ১ : ৪৫/ শামী, ১ : ১৫১)

গোসলের সুন্নাতসমূহ

১. ফরয গোসলের পূর্বে ইস্তিঞ্জা অর্থাত পেশাব করা।

(মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাঃ নং ১০২০)

২. শুরুতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়া।

(মুসনাদে আহমাদ, হাঃ নং ১২৬৯৪)

৩. পৃথকভাবে উভয় হাত কব্জিসহ ধোয়া। (বুখারী শরীফ, হাঃ নং ২৪৮)

৪. শরীর বা কাপড়ের কোন স্থানে নাপাকী লেগে থাকলে প্রথমে তা তিনবার ধুয়ে পবিত্র করে নেয়া। (মুসলিম শরীফ, হাঃ নং ৩২১)

৫. নাপাকী লেগে থাকলে বা না লেগে থাকলে সর্ব অবস্থায় গুপ্তাঙ্গ

ধৌত করা। এরপর উভয় হাত ভালভাবে ধুয়ে নেয়া। (বুখারী শরীফ, হাঃ নং ২৪৯)

৬. সুন্নাত তরীকায় পূর্ণ উযু করা। তবে গোসলের স্থানে পানি জমে থাকলে, গোসল শেষ করে পা ধৌত করবে। (বুখারী শরীফ, হাঃ নং ২৬০)

৭. প্রথমে মাথায় পানি ঢালা। (বুখারী শরীফ, হাঃ নং ২৫৬)

৮. এরপর ডান কাঁধে। (বুখারী শরীফ, হাঃ নং ২৫৪)

৯. এরপর বাম কাঁধে। (বুখারী শরীফ, হাঃ নং ২৫৪)

১০. অতঃপর অবশিষ্ট শরীর ভিজানো। (বুখারী শরীফ, হাঃ নং ২৭৪)

১১. সমস্ত শরীরে এমনভাবে তিনবার পানি পৌঁছানো, যেন একটি পশমের গোড়াও শুষ্ক না থাকে।

(আবু দাউদ, হাঃ নং ২৪৯/ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাঃ নং ৮১৩)

তবে নদী-পুকুর ইত্যাদিতে গোসল করলে কিছুক্ষণ ডুব দিয়ে থাকলেই তিন বার পানি ঢালার সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে।

(আবু দাউদ, হাঃ নং ২৪৯/ মুসান্নাফে ইবনে আবী মাইবা, হাঃ নং ৮১৩)

১২. সমস্ত শরীর হাত দ্বারা ঘষে-মেজে ধৌত করা।

(তিরমিযী, হাঃ নং ১০৬)

তায়াম্মুমের ফরয ৩টি

১. নিয়ত করা অর্থাত নামায পড়া বা কুরআন তিলাওয়াতের জন্য পবিত্রতা অর্জনের নিয়ত করা। (সূরা নিসা, আয়াত : ৪৩)

২. অতঃপর মাটি বা মাটি জাতীয় কোন পবিত্র জিনিসে প্রথমবার হাত মেরে সমস্ত মুখমণ্ডল মাসাহ্ করা।

৩. অনুরূপভাবে দ্বিতীয়বার মাটিতে হাত মেরে দুই হাত কনুইসহ মাসাহ্ করা। (ঐ/ হিদায়া, ১ : ৫০-৫১/ আলমগীরী, ১ : ২৫-২৬)

তায়াম্মুমের সুন্নাতসমূহ

১. তায়াম্মুমের শুরুতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়া।

(মুসনাদে আহমাদ, হাঃ নং ১২৬৯৪)

২. মাটিতে হাত রাখার সময় আঙ্গুলসমূহ ফাঁক করে রাখা।

(মুসলিম, হাঃ নং ৩৬৮)

৩. মাটিতে উভয় হাত রাখার পর হস্তদ্বয় সামান্য আগে পিছে নিয়ে মাটিতে ঘর্ষণ করা। (মুসলিম, হাঃ নং ৩৬৮)

৪. তারপর উভয় হাত ঝেড়ে নেয়া। (মুসলিম, হাঃ নং ৩৬৮)

৫. তায়াম্মুমে অঙ্গসমূহ মাসাহ্ করার সময় ধারাবাহিকতা বজায় রাখা। অর্থাত প্রথমে সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল, তারপর ডান তারপর বাম হাত কনুইসহ মাসাহ্ করা। (আবু দাউদ, হাঃ নং ৩৩০)

৬. চেহারা ও হাতের মাসাহ্-এর মাঝে বিলম্ব না করা।

(আবু দাউদ, হাঃ নং ৩৩০)

কাপড় পরিধানের সুন্নাতসমূহ

১. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদা কাপড় বেশি পছন্দ করতেন। (মুস্তাদরাক, হাঃ নং ৭৩৭৯)

২. জামা-পায়জামাসহ সকল প্রকার পোশাক পরিধানের সময় ডান হাত ও ডান পা আগে প্রবেশ করানো। (আবু দাউদ, হাঃ নং ৪১৪১)

৩. পুরুষদের জন্য পায়জামা, লুঙ্গি এবং জামা, জুব্বা ও আবা-কাবা পায়ের টাখনুর উপরে রাখা। টাখনুর নীচে নামিয়ে পোশাক

পরিধান করা হারাম। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- 'যে ব্যক্তি টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে কোন পোশাক পরিধান করবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না।

(বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৫৭৮৪/ আবু দাউদ হাঃ নং ৪০৯৩, ৪১১৭/ সহীহ ইবনে হিব্বান, হাঃ নং ৫৪৪৭)

বি.দ্র. মোজার হুকুম-এর ব্যতিক্রম।

৪. সাধারণভাবে কাপড় পরিধান করার সময় এই দু'আ পড়া :

الحمد لله الذى كسانى هذا ورزقنيه من غير حول منى ولاقوة

(মুস্তাদরাক, হাঃ নং ৭৪০৯)

এবং নতুন কাপড় পরিধান করে এই দু'আ পড়া :

الحمد لله الذى كسانى ما اوارى به عورتى واتجمل به فى حياتى

(তিরমিযী, হাঃ নং ৩৫৬০/ ইবনে মাজাহ, হাঃ নং ৩৫৫৭)

৫. টুপি পরা। টুপির উপর পাগড়ী পরা মুস্তাহাব এবং লেবাসের আদব। তবে এটা নামাযের সুন্নাত নয়। টুপি ছাড়া পাগড়ী বাঁধা সুন্নাতের পরিপন্থী।

(আবু দাউদ, হাঃ নং ৪০৭৮)

৬. পাগড়ী বাঁধার পর মাথার পিছন দিকে এক হাত পরিমাণ ঝুলিয়ে রাখা।

(মুসলিম, হাঃ নং ১৩৫৯)

বি.দ্র.- কোন উযুর না থাকলে টুপির সাথে সব সময় পাগড়ী পরিধান করবে। শুধু নামাযের সময়পাগড়ী পরার হাদীস পাওয়া যায় না।

৭. বিসমিল্লাহ বলে কাপড় খোলা আরম্ভ করা এবং খোলার সময় বাম হাত ও বাম পা আগে বের করা।

(আমালুল্ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ, হাঃ নং ২৭৪ মুসান্নাফে ইবনে

আবী শাইবাহ, হাঃ নং ২৪৯১০)

৮. জুতা প্রথমে ডান পায়ে পরা, অতঃপর বাম পায়ে পরা।

(বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৫৮৫৫)

৯. জুতা খোলার সময় প্রথমে বাম পা থেকে অতঃপর ডান পা থেকে খোলা। (বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৫৮৫৫)

মসজিদে প্রবেশের সুন্নাতসমূহ

১. বিসমিল্লাহ পড়া।

(মুসনাদে আহমাদ, হাঃ নং ২৬৪৭৩ আমলুল্ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ, হাঃ নং ৮৮)

২. দরূদ শরীফ পড়া। (মুসনাদে আহমাদ, হাঃ নং ২৬৪৭২)

৩. অতঃপর এই দু'আ পড়া :

اللهم افتح لى ابواب رحمتك (মুসলিম, হাঃ নং ৭১৩)

উল্লেখিত দু'আ সমূহ একত্রে এভাবে পড়া যায়-

بسم الله والصلوة والسلام على رسول الله اللهم افتح لى ابواب رحمتك

৪. মসজিদে ডান পা আগে রাখা। (বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৪২৬)

৫. মসজিদে প্রবেশ করে ই'তিকাফের নিয়ত করা।

(শামী, ২ : ৪৪৩/ বুখারী শরীফ, হাঃ নং ২০৪২)

বি.দ্র. মসজিদে প্রবেশের সময় প্রথমে বাম পায়ের জুতা খুলে জুতার উপর বাম পায়ে দাঁড়াবে অতঃপর ডান পায়ের জুতা খুলে দু'আসমূহ পড়ে তারপর প্রথমে ডান পা মসজিদের ভিতরে রাখবে।

মসজিদ থেকে বের হওয়ার সুন্নাতসমূহ

১. বিসমিল্লাহ পড়া। (মুসনাদে আহমাদ, হাঃ নং ২৬৪৭৩)

২. দরূদ শরীফ পড়া। (মুসনাদে আহমাদ, হাঃ নং ২৬৪৭২)

৩. অতঃপর এই দু'আ পড়া :

اللهم انى اسئلك من فضلك (মুসলিম, হাঃ নং ৭১৩)

উল্লেখিত দু'আ সমূহ একত্রে এভাবে পড়া যায় :

بسم الله والصلوة والسلام على رسول الله اللهم انى اسئلك من فضلك

এ দু'আ গুলো বের হওয়ার পূর্বেই পড়বে।

৪. মসজিদের বাইরে (জুতার উপর) বাম পা আগে রাখা।

(মুস্তাদরাকে হাকিম, হাঃ নং ৭৯১)

৫. অতঃপর প্রথমে ডান পায়ে জুতা পরা। তারপর বাম পায়ে পরা।

(বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৫৮৫৫)

আযানের সুন্নাতসমূহ

১. পাক-পবিত্র অবস্থায় আযান দেয়া।

(মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাঃ নং ১৭৯৯)

২. কিবলামুখী হয়ে আযান দেয়া এবং উভয় পায়ের মাঝে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁক রেখে কিবলামুখী করে রাখা।

(আবু দাউদ, হাঃ নং ৫০৭/ মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাঃ নং ১৮০২)

৩. ক. প্রথম দুই তাকবীর এক শ্বাসে একত্রে বলে থামা।

খ. অতঃপর দুই তাকবীর এক শ্বাসে একত্রে বলে থামা।

বি.দ্র. উল্লেখিত তাকবীরসমূহের প্রত্যেকটির শেষে সাকিন করা, অর্থাত 'আল্লাহু আকবারুল্লাহু আকবার' এভাবে না বলা।

(মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ, হাঃ নং ২৩৭৭)

গ. অতঃপর মাঝের বাক্যগুলির মধ্য হতে এক একটি বাক্য এক শ্বাসে বলা এবং প্রত্যেক বাক্যের শেষে সাকিন করা ও থামা।

(মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ, হাঃ নং ২৩৭৭)

ঘ. শেষের দুই তাকবীর এক শ্বাসে একত্রে বলে থামা ও উভয় তাকবীরের শেষে সাকিন করা।

ঙ. সর্বশেষে লা-ইলা-হা-ইল্লাল্লাহ বলে আযান শেষ করা।

(নাসায়ী, হাঃ নং ৬৫২)

উল্লেখ্য, এক এক বাক্য বলে থামার পর এ পরিমাণ বিরতি দেয়া, যাতে পঠিত বাক্যটি একবার পড়া যায়; অর্থাত শ্রোতাগণ যেন উক্ত সময়ে আযানের জওয়াব দিতে পারেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ, হাঃ নং ২২৩৪)

৪. ডান দিকে চেহারা ফিরানোর পর 'হাইয়া আলাসসালাহ' বলা এবং বাম দিকে চেহারা ফিরানোর পর 'হাইয়া আলাল ফালাহ্' বলা। কিন্তু বুক ও পা কিবলার দিক থেকে ফিরাবে না। (বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৬৩৪)

৫. মহল্লার প্রথম আযান শ্রবণের সাথে সাথে আযান শেষ হওয়া পর্যন্ত শ্রোতাগণের তিলাওয়াত, যিকির, তাসবীহ ইত্যাদি বন্ধ করে দেয়া।

(মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাঃ নং ১৮৪৯)

৬. আযানের জওয়াব দেয়া। অর্থাত মুআজ্জিনের আযানের বাক্য উচ্চারণের ফাঁকে ফাঁকে শ্রোতাগণের হুবহু আযানের শব্দগুলোই বলা। তবে 'হাইয়া আলাসসালাহ'এবং'হাইয়া আলাল ফালাহ্' বলার পর জওয়াবে 'লা -হাউলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলা। আর ফজরের আযানে 'আসসালাতু খইরুম মিনান নাউম' এর জওয়াবে 'সদাক্কতা ওয়া বাাররতা' বলা।

(বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৬১১-৬১৩/ মুসলিম হাঃ নং ৩৮৫)

৭. আযান শেষে দরূদ শরীফ পড়া। (মুসলিম, হাঃ নং ৩৮৪)

৮. অতঃপর এই দু'আ পড়া :

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلوة القائمة ات محمدن الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمود الذى وعدته انك لاتخلف الميعاد

(বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৬১৪, ৪৭১৯/ বাইহাকী হাঃ নং ১৯৩৩)

বি.দ্র. আযানের তাকবীরসমূহ বিশেষত দ্বিতীয় তাকবীর এক আলিফ-এর চেয়ে বেশি লম্বা করা সহীহ নয় এবং আওয়াজের মধ্যে তরঙ্গ সৃষ্টি করা অর্থাত, ইচ্ছা পূর্বক আওয়াজ উঁচু-নীচু করা মারাত্মক অন্যায়।

(বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৬০৯/ দারাকুতনী, হাঃ নং ৯০৬ আদ/ দুররুল মুখতার, ১ : ৩৮৭)

ইকামাতের সুন্নাতসমূহ

১. পাক-পবিত্র অবস্থায় ইকামাত দেয়া। (তিরমিযী, হাঃ নং ২০০)

২. কিবলামুখী হয়ে ইকামাত দেয়া এবং উভয় পায়ের মাঝে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁক রেখে উভয় পা কিবলামুখী করে রাখা।

(আবু দাউদ, হাঃ নং ৪৯৯/ আদ্ দুররুল মুখতার, ১ : ৩৮৯)

৩. ক. ইকামাতে হদর করা অর্থাত, প্রথম চার তাকবীর একত্রে এক শ্বাসে বলে থামা এবং প্রত্যেক তাকবীরের শেষে সাকিন করা।

(তিরমিযী, হাঃ নং ১৯৫)

খ. অতঃপর মাঝের বাক্যগুলোর মধ্যে হতে দুই দুই বাক্য একত্রে এক শ্বাসে বলে থামা এবং প্রত্যেক বাক্যের শেষে সাকিন করা।

(কানযুল উম্মাল, হাঃ নং ২৩২১০)

গ. সর্বশেষ দুই তাকবীরের সাথে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ মিলিয়ে একত্রে এক শ্বাসে বলা এবং উভয় তাকবীরের শেষে সাকিন করা।

(মা‘আরিফুস সুনান, ২ : ১৯৫/ শামী, ১ : ৩৮৬)

৪. ইকামাতেও আযানের ন্যায় ডান দিকে চেহারা ফিরিয়ে তারপরে ‘হাইয়া আলাস্ সালাহ’ বলা। এরপর বাম দিকে চেহারা ফিরিয়ে ‘হাইয়া আলাল ফালাহ্’ বলা। (তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন সীনা না ঘুরে এবং চেহারা ঘুরানো শেষ হওয়ার পর হাইয়া...বলা শুরু করা।)

(মুসলিম, হাঃ নং ৫০৩/ আদ্ দুররুল মুখতার, ১ : ৩৮৭)

৫. আযানের জওয়াবের মতই মুসল্লীগণের ইকামাতের জওয়াব দেয়া। তবে ‘ক্বাদ ক্বামাতিস সালাহ’-এর জওয়াবে اقا مها الله وادامها (আক্বামাহাল্লাহু ওয়া আদামাহা) বলা। (আবু দাউদ, হাঃ নং ৫২৮)

নামাযের ফরয ১৩টি

নামাযের বাইরে ৭টি ফরয

১. শরীর পাক হওয়া। (সূরা মায়িদা আয়াত : ৬)

২. কাপড় পাক হওয়া। (সূরা মুদ্দাছ্ছির, আয়াত : ৪)

৩. নামাযের জায়গা পাক হওয়া। (সূরা বাকারা, আয়াত : ১২৫)

৪. ছতর ঢাকা (অর্থাত পুরুষগণের নাভী হতে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত এবং মহিলাদের চেহারা, কব্জি পর্যন্ত দুই হাত এবং পায়ের পাতা ব্যতিরেকে সমস্ত শরীর ঢেকে রাখা)। (সূরা আ'রাফ, আয়াত : ৩১)

৫. কিবলামুখী হওয়া। (সূরা বাকারা, আয়াত : ১৪৪)

৬. ওয়াক্তমত নামায পড়া। (সূরা নিসা আয়াত : ১০৩)

৭. অন্তরে নির্দিষ্ট নামাযের নিয়ত করা। (বুখারী শরীফ, হাঃ নং ১)

নামাযের ভিতরে ৬টি ফরয

১. তাকবীরে তাহরীমা অর্থাত শুরুতে আল্লাহু আকবার বলা। (সূরা মুদ্দাছ্ছির, আয়াত : ৩)

২. ফরয ও ওয়াজিব নামায দাঁড়িয়ে পড়া। (সূরা বাকারা, আয়াত : ২৩৮)

৩. ক্বিরা'আত পড়া (অর্থাত কুরআন শরীফ হতে ছোট এক আয়াত পরিমাণ পড়া।) (সূরা মুয্যাম্মিল ,আয়াত : ২০)

৪. রুকু করা। (সূরা হজ্ব, আয়াত : ৭৭)

৫. দুই সিজদা করা। (সূরা হজ্ব, আয়াত : ৭৭)

৬. শেষ বৈঠক (নামাযের শেষে তাশাহহুদ পরিমাণ বসা)

(আবু দাউদ, হাঃ নং ৯৭০)

বি.দ্র. নামাযী ব্যক্তির নিজস্ব কোন কাজের মাধ্যমে (যেমন-

সালাম ফিরানো) নামায থেকে বের হওয়াও একটা ফরয। (আল বাহরুর রায়িক, ১ : ৫১৩) নামাযের কোন ফরয বাদ পড়লে নামায বাতিল হয়ে যায়। সাহু সিজদা করলেও নামায সহীহ হয় না।

(প্রমাণ : আল বাহরুর রায়িক, ১ : ৫০৫) শামী, ১ : ৪৪৭/ হিদায়া, ১ : ৯৮)

নামাযের ওয়াজিব ১৪টি

১. সূরা ফাতিহা পূর্ণ পড়া। (বুখারী, হাঃ নং ৭৫৬)

২. সূরা ফাতিহার সঙ্গে অন্য একটি সূরা বা ছোট তিন আয়াত পরিমাণ মিলানো। (বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৭৭৬, মুসলিম, হাঃ নং ৪৫১)

৩. ফরযের প্রথম দুই রাক'আতকে ক্বিরা'আতের জন্য নির্দিষ্ট করা।

(বুখারী শরীফ, হা নং ৭৭৬/ মুসলিম, হাঃ নং ৪৫১)

৪. সূরা ফাতিহাকে অন্য সূরার আগে পড়া।

(তিরমিযী, হাঃ নং ২৪৬/ ত্বাহাবী, হাঃ নং ১১৭২)

৫. নামাযের সকল রোকন ধীর স্থিরভাবে আদায় করা। (অর্থাত রুকু, সিজদা এবং রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ও দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসে কমপক্ষে এক তাসবীহ পরিমাণ দেরী করা।)

(আবু দাউদ, হাঃ নং ৮৫৬, ৮৫৭, ৮৫৮)

৬. প্রথম বৈঠক করা (অর্থাত তিন অথবা চার রাক'আত বিশিষ্ট নামাযের দুই রাকআতের পর বসা)। (বুখারী, হাঃ নং ৮২৮)

৭. উভয় বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়া।

(বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৮৩০, ৮৩১/ মুসলিম, হাঃ নং ৪০২, ৪০৩)

৮. প্রত্যেক রাক‘আতের ফরয এবং ওয়াজিবগুলোর তরতীব বা সিরিয়াল ঠিক রাখা। (তিরমিযী, হাঃ নং ৩০২)

৯. ফরয ও ওয়াজিবগুলোকে স্ব স্ব স্থানে আদায় করা। (যেমন দ্বিতীয় সিজদা প্রথম সিজদার সাথে করা। প্রথম বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু শেষ করে ততক্ষণাত তৃতীয় রাকা‘আতের জন্য দাঁড়িয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

(বাদায়িউস সানায়ে, ১ : ৬৮৯)

১০. বিতরের নামাযে তৃতীয় রাক‘আতে কিরাআতের পর কোন দু‘আ পড়া। অবশ্য দু‘আ কুনূত পড়লে ওয়াজিবের সাথে সুন্নাতও আদায় হয়ে যাবে।

(নাসায়ী হাঃ নং ১৬৯৯/ ইবনে মাজাহ, হাঃ নং ১১৮২/ ত্বহাবী, হাঃ নং ১৪৫৫)

১১. দুই ইদের নামাযে অতিরিক্ত ছয় তাকবীর বলা।

(আবু দাউদ, হাঃ নং ১১৫৩)

১২. দুই ঈদের নামাযে দ্বিতীয় রাক‘আতে অতিরিক্ত তিন তাকবীর বলার পর রুকুর জন্য ভিন্নভাবে তাকবীর বলা।

(মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ, হাঃ নং ৫৭০৪/ মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাঃ নং ৫৬৮৫) বি.দ্র. এ তাকবীরটি অন্যান্য নামাযে সুন্নাত।

১৩. ইমামের জন্য যোহর, আসর এবং দিনের বেলায় সুন্নাত ও নফল নামাযে ক্বিরা‘আত আস্তে পড়া এবং ফজর, মাগরিব, ইশা, জুম‘আ, দুই ঈদ, তারাবীহ ও রমযান মাসের বিতর নামাযে ক্বিরা‘আত শব্দ করে পড়া।

(মারাসীলে আবু দাউদ, হাঃ নং ৪১/ মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাঃ ৫৭০০/ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ, হাঃ নং ৫৪৫২)

বি.দ্র. আস্তে পড়ার অর্থ মনে মনে নয়, কারণ তাতে নামায শুদ্ধ

হয় না। বরং আওয়াজ না করে মুখে পড়া জরুরী।

১৪. সালাম-এর মাধ্যমে নামায শেষ করা। (আবু দাউদ, হাঃ নং ৯৯৬)

বি.দ্র.- উল্লেখিত ওয়াজিবসমূহের মধ্য হতে কোন একটি ভুলে ছুটে গেলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। সিজদায়ে সাহু না করলে বা ইচ্ছাকৃত কোন ওয়াজিব তরক করলে নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। পুনরায় পড়া ওয়াজিব হবে।

(প্রমাণ : শামী, ১৪ : ৪৫৬/ আলমগীরী, ১ : ৭১/ আল বাহরুর রায়িক, ১ : ৫১০)

নামাযের সুন্নাতসমূহ

ক. দাঁড়ানো অবস্থায় সুন্নাত ১১টি

১. উভয় পায়ের আঙ্গুলসমূহ কিবলামুখী করে রাখা এবং উভয় পায়ের মাঝখানে চার আঙ্গুল, উর্ধ্বে একবিঘত পরিমাণ ফাঁকা রাখা।

(নাসায়ী হাঃ নং ৮৯২/ হিন্দিয়া, ১ : ৭৩)

২. তাকবীরে তাহরীমার সময় চেহারা কিবলার দিকে রেখে নজর সিজদার জায়গায় রাখা এবং হাত উঠানোর সময় মাথা না ঝুঁকানো।

(তিরমিযী, হাঃ নং ৩০৪/ মুস্তাদরাক, ১৭৬১)

৩. উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠানো। অর্থাত উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথা কানের লতি পর্যন্ত উঠানো। (মুসলিম, হাঃ নং ৩৯১)

৪. হাত উঠানোর সময় আঙ্গুলসমূহ ও হাতের তালু কিবলামুখী রাখা।

(তাবরানী আউসাত, হাঃ নং ৭৮০১)

৫. আঙ্গুলসমূহ স্বাভাবিকভাবে রাখা অর্থাত একেবারে মিলিয়েও না রাখা, আবার বেশি ফাঁক ফাঁক করেও না রাখা। (মুস্তাদরাক, হাঃ নং ৮৫৬)

৬. ইমামের তাকবীরে তাহরীমা বলার পর সাথে সাথে মুক্তাদীর তাকবীরে তাহরীমা যেন ইমামের তাকবীরে তাহরীমার পূর্বে শেষ না হয়। এরূপ হলে মুক্তাদীর নামায হবে না।

(মুসলিম, হা নং ৪১৪, ৪১৫/ বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৭৩৪)

৭. হাত বাঁধার সময় ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের (পাতার) উপর রাখা।

(আবু দাউদ, হাঃ নং ৭২৬/ মুসান্নাফে ইবন আবী শাইবাহ, হাঃ নং ৩৯৪২)

৮. ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা গোলাকার বৃত্ত বানিয়ে বাম হাতের কব্জি ধরা। (তিরমিযী, হাঃ নং ২৫২/ ইবনে মাজাহ, হাঃ নং ৮১১)

৯. অবশিষ্ট তিন আঙ্গুল বাম হাতের উপর স্বাভাবিকভাবে বিছিয়ে রাখা।

(ফাতহুল কাদীর, ১ : ২৫০)

১০. নাভীর নীচে হাত বাঁধা।

(আবু দাউদ, হাঃ নং ৭৫৬/ হিন্দিয়া, ১ : ৭৩)

১১. ছানা পড়া। (আবু দাউদ, হাঃ নং ৭৭৫, ৭৭৬)

খ. ক্বিরা'আতের সুন্নাত ৭টি

১. প্রথম রাকা'আতে ছানা পড়ার পর পূর্ণ আ'উযুবিল্লাহ পড়া।

(আবু দাউদ, হাঃ নং ৭৬৪/ ইবনে মাজাহ, হাঃ নং ৮০৭)

২. প্রতি রাকা'আতে সূরা ফাতিহা ও সূরা মিলানোর পূর্বে পূর্ণ বিসমিল্লাহ পড়া। (নাসায়ী শরীফ, হাঃ নং ৯০৫)

৩. সূরা ফাতিহার পর সকলের জন্য নীরবে 'আমীন' বলা।

(সুনানে দারাকুতনী, হাঃ নং ১২৫৬/ বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৭৮০)

৪. ফজর এবং যোহরের নামাযে ত্বিওয়ালে মুফাসসাল (লম্বা ক্বিরা'আত) অর্থাত সূরা 'হুজুরাত' থেকে সূরা 'বুরূজ' পর্যন্ত, আসর এবং ইশার নামাযে আউসাতে মুফাসসাল (মধ্যম ক্বিরা'আত) অর্থাত সূরা 'ত্বরিক' থেকে সূরা 'লাম-ইয়াকুন' পর্যন্ত এবং মাগরিবে ক্বিসারে মুফাসসাল (ছোট ক্বিরা'আত) অর্থাত সূরা 'ইযা-যুলযিলাত্' থেকে সূরা 'নাস' পর্যন্ত থেকে প্রতি রাকা'আতে যে কোন একটি সূরা বা কোন কোন সময় বড় সূরা থেকে এ পরিমাণ ক্বিরা'আত পড়া।

(নাসায়ী শরীফ, হাঃ নং ৯৮৩/ মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাঃ নং ২৬৭২)

৫. ফজরের প্রথম রাক'আত দ্বিতীয় রাক'আত অপেক্ষা লম্বা করা। অন্যান্য ওয়াক্তে উভয় রাক'আতে ক্বিরা'আতের পরিমাণ সমান রাখা উচিত।

(মুসলিম শরীফ, হাঃ নং ৪৫১, ৪৫২)

৬. ক্বিরা'আত অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বা একেবারে ধীর গতিতে না পড়া, বরং মধ্যম গতিতে পড়া। (মুসলিম শরীফ, হাঃ নং ৭৩৩)

৭. ফরয নামাযের তৃতীয় এবং চতুর্থ রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়া।

(বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৭৭৬)

গ. রুকুর সুন্নাত ৮টি

১. তাকবীর বলা অবস্থায় রুকুতে যাওয়া।

(বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৭৮৯)

২. উভয় হাত দ্বারা হাঁটু ধরা। (বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৭৯০)

৩. হাতের আঙ্গুলসমূহ ফাঁক করে ছড়িয়ে রাখা।

(আবু দাউদ, হাঃ নং ৭৩১)

৪. উভয় হাত সম্পূর্ণ সোজা রাখা, কনুই বাঁকা না করা।

(আবু দাউদ, হাঃ নং ৭৩৪)

৫. পায়ের গোছা, হাঁটু ও উরু সম্পূর্ণ সোজা রাখা। হাঁটু সামনের দিকে বাঁকা না করা। (আবু দাউদ, হাঃ নং ৮৬৩)

৬. মাথা, পিঠ ও কোমর সমান রাখা, উঁচু-নীচু না করা এবং পায়ের দিকে নজর রাখা। (মুসলিম শরীফ, হাঃ নং ৪৯৮/ বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৮২৮)

৭. রুকুতে কমপক্ষে তিনবার রুকুর তাসবীহ (সুবহানা রাব্বিয়াল্‌আযীম) পড়া। (আবু দাউদ, হাঃ নং ৮৮৯)

৮. রুকু হতে উঠার সময় ইমামের 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ্ এবং মুক্তাদীর 'রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ' এবং একাকী নামায আদায়কারীর উভয়টি বলা। (আলমগীরী, ১ : ১২/ বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৭৮৯, ৭৩৩)

বি.দ্র. রুকু থেকে উঠে সম্পূর্ণ সোজা হয়ে এক তাসবীহ পরিমাণ স্থিরভাবে দাঁড়ানো জরুরী। (বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৮০০, ৮০১, ৮০২)

ঘ. সিজদার সুন্নাত ১২টি

১. তাকবীর বলা অবস্থায় সিজদায় যাওয়া। (বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৮০৩)

বি.দ্র. সিজদায় যাওয়া ও সিজদা হতে দাঁড়ানোর সময় তাকবীর এক আলিফ থেকে অধিক টানা উচিত নয়। অবশ্য হদর এবং তারতীলের পার্থক্য থাকবে। (শামী, ১ : ৪৮০)

২. প্রথমে উভয় হাঁটু মাটিতে রাখা।

(নাসায়ী, হাঃ নং ১০৮৯/ আবু দাউদ, হাঃ নং ৮৩৮)

৩. তারপর হাঁটু থেকে আনুমানিক এক হাত দূরে উভয় হাত রাখা এবং হাতের আঙ্গুলসমূহ কিবলামুখী করে সম্পূর্ণরূপে মিলিয়ে রাখা।

(মুসনাদে আহমাদ, হাঃ নং ১৮৮৮২/ সহীহ ইবনে খুযাইমাহ, হাঃ নং ৬৪৩)

৪. তারপর উভয় বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথা বরাবর নাক রাখা।

(মুসনাদে আহমাদ, হাঃ নং ১৮৮৮০)

৫. তারপর কপাল রাখা। (মুসনাদে আহমদ, হাঃ নং ১৮৮৮০)

৬. অতঃপর দুই হাতের মাঝে সিজদা করা এবং দৃষ্টি নাকের অগ্রভাগের দিকে রাখা। (মুসলিম, হাঃ নং ৪০১/ মুস্তাদরাকে হাকেম, হাঃ নং ১৭৬১)

৭. সিজদায় পেট উরু থেকে পৃথক রাখা।

(মুসনাদে আহমাদ, হাঃ নং ২৩৬৬২/ আবু দাউদ, হাঃ নং ৭৩৫)

৮. পাঁজড়দ্বয় থেকে উভয় বাহু পৃথক রাখা। (বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৮০৭)

৯. কনুই মাটি ও হাঁটু থেকে পৃথক রাখা। (বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৮২২)

১০. সিজদায় কমপক্ষে তিনবার সিজদার তাসবীহ (সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা) পড়া।

১১. তাকবীর বলা অবস্থায় সিজদা হতে উঠা।

(বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৮২৫)

১২. প্রথমে কপাল, তারপর নাক, তারপর উভয় হাত, তারপর উভয় হাঁটু উঠানো। (তিরমিযী, হাঃ নং ২৬৮/ মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাঃ নং ২৯৫৮)

বি.দ্র.- দাঁড়ানো অবস্থা থেকে সিজদায় যাওয়ার সময় হাঁটু মাটিতে লাগার আগ পর্যন্ত বুক সম্পূর্ণ সোজা রাখা জরুরী। বিনা

ওজরে বুক ঝুঁকিয়ে সিজদায় গেলে একাধিক রুকু হয়ে সুন্নাতের খেলাফ হবে। দু'সিজদার মাঝে সম্পূর্ণ সোজা হয়ে এক তাসবীহ পরিমাণ স্থির হয়ে বসা জরুরী।

(আবু দাউদ হাঃ নং ৮৩৮/ শামী, ১ঃ৪৬৪)

৬. নামাযে বসার সুন্নাত ১৩টি

১. বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা। ডান পা সোজা ভাবে খাড়া রাখা। উভয় পায়ের আঙ্গুলসমূহ সাধ্যমত কিবলার দিকে মুড়িয়ে রাখা।

(নাসাঈ, হাঃ নং ১১৫৮)

২. উভয় হাত রানের উপর হাঁটু বরাবর করে রাখা এবং দৃষ্টি দুই হাঁটুর মাঝ বরাবর রাখা। (মুসনাদে আহমাদ, হাঃ নং ১৬১০৬)

৩. 'আশ্হাদু' বলার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথা এক সাথে মিলিয়ে গোলাকার বৃত্ত বানানো এবং অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বয় মুড়িয়ে রাখা এবং 'লা-ইলাহা' বলার সময় শাহাদাত আঙ্গুল সামান্য উঁচু করে ইশারা করা। অতঃপর 'ইল্লাল্লাহু' বলার সময় আঙ্গুলের মাথা সামান্য ঝুঁকানো। হাঁটুর সাথে না লাগানো। (আবু দাউদ, হাঃ নং ৭২৬/ নাসাঈ, হাঃ নং ১২৭৪)

৪. আখেরী বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়ার পর দরূদ শরীফ পড়া।

(তিরমিযী, হাঃ নং ৩৪৭৭)

৫. দরূদ শরীফের পর দু'আয়ে মাছুরা পড়া।

(বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৮৩৪/ তিরমিযী, হাঃ নং ৫৯৩)

৬. উভয় দিকে সালাম ফিরানো। (তিরমিযী, হাঃ নং ২৯৫)

৭. ডান দিকে আগে সালাম ফিরানো। উভয় সালাম কিবলার দিক থেকে আরম্ভ করা এবং সালামের সময় দৃষ্টি কাঁধের দিকে রাখা।

(মুসলিম, হাঃ নং ৫৮২)

৮. ইমামের উভয় সালামে মুক্তাদী, ফেরেশতা ও নামাযী জ্বিনদের প্রতি সালাম করার নিয়ত করা। (মুসলিম, হাঃ নং ৪৩১)

৯. মুক্তাদীগণের উভয় সালামে ইমাম, অন্যান্য মুসল্লী, ফেরেশতা ও নামাযী জ্বিনদের প্রতি সালাম করার নিয়ত করা।

(মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাঃ নং ৩১৪৯, ৩১৫২)

১০. একাকী নামাযী ব্যক্তি শুধু ফেরেশতাগণের প্রতি সালাম করার নিয়ত করা। (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাঃ নং ৩১৪০)

১১. মুক্তাদীগণের ইমামের সালাম ফিরানোর পরপরই সালাম ফিরানো।

(বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৮৩৮)

১২. দ্বিতীয় সালাম প্রথম সালাম অপেক্ষা আস্তে বলা।

(মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ, হাঃ নং ৩০৫৭)

১৩. ইমামের দ্বিতীয় সালাম ফিরানো শেষ হলে মাসবূকের ছুটে যাওয়া নামায আদায়ের জন্য দাঁড়ানো। (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাঃ নং ৩১৫৬)

মুনাজাতের সুন্নাতসমূহ

১. উযুর সাথে কিবলামুখী হয়ে দু'আ করা।

মুনাজাতের শুরুতে আল্লাহর প্রশংসা করা এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা।

(তিরমিযী, হাঃ নং ৩৪৭৬)

২. উভয় হাত সিনা বরাবর সামনে রাখা।

(মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাঃ নং ৩২৩৪)

৩. হাতের তালু আসমানের দিকে প্রশস্ত করে রাখা।

(তাবরানী কাবীর, হাঃ নং ৩৮৪২)

৪. হাতের আঙ্গুলসমূহ স্বাভাবিক ফাঁক রাখা। (হিসনে হাসীন, ২৭)

৫. দু'হাতের মাঝখানে সামান্য ফাঁক রাখা। (ত্বাহত্বাবী, ২০৫)

৬. মন দিয়ে কাকুতি-মিনতি করে দু'আ করা।

(সূরা আ'রাফ আয়াত নং ৫৫)

৭. আল্লাহর নিকট দু'আর বিষয়টি বিশ্বাস ও দৃঢ়তার সাথে বারবার চাওয়া।

(বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৬৩৩৮)

৮. ইখলাসের সাথে নিঃশব্দে দু'আ করা মুস্তাহাব। তবে দু'আ সম্মিলিতভাবে হলে এবং কারো নামাযে বা ইবাদতে বিঘ্ন সৃষ্টির আশংকা না থাকলে, সশব্দে দু'আকরাও জায়েয আছে।

(সূরা আ'রাফ, ২০৫/ বুখারী শরীফ, হাঃ নং ২৯৯২)

৯. আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও দরূদ-সালাম যেমন- 'সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইয্‌যাতি' শেষ। পর্যন্ত পড়া ও 'আমীন' বলে দু'আ শেষ করা।

(তাবরানী কাবীর, হাঃ নং ৫১২৪/ মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাঃ নং ৩১১৭/ আবু দাউদ, হাঃ নং ৯৩৮)

১০. মুনাজাতের পর হস্তদ্বয় দ্বারা মুখমণ্ডল মুছে নেয়া। (আবু দাউদ, হাঃ নং ১৪৮৫)

বি.দ্র.. ফরয নামাযের পর মুনাজাত করা মুস্তাহাব, সালাম শেষ হওয়ার পরে ইমামের ইকতিদাও শেষ সুতরাং মুনাজাতের মধ্যে ইমামের ইকতিদা নাই।

মহিলাদের নামাযের পার্থক্য

১. তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠানো।

(তাবারানী কাবীর ২২ : ১৯)

২. হাত কাপড়ের ভিতর হতে বের না করা। (তিরমিযী, হাঃ নং ১১৭৩)

৩. হাত বুকের উপর রাখা। (শামী, ১ : ৪৮৭)

৪. আঙ্গুলসমূহ মিলিয়ে ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপর স্বাভাবিকভাবে রাখা। পুরুষদের মত বাম হাতের কব্জি না ধরা।

(ফাতাওয়া রাহীমিয়া, ৭ : ২২২)

৫. রুকুতে পুরুষদের তুলনায় কম ঝুঁকা।

(মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাঃ নং ৫০৬৯)

৬. রুকুতে উভয় বাহু পাঁজরের সঙ্গে পরিপূর্ণ মিলিয়ে রাখা।

(মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাঃ নং ৫০৬৯)

৭. রুকুতে উভয় হাত হাঁটুর উপর স্বাভাবিক রাখা এবং হাতের আঙ্গুলসমূহ মিলিয়ে রাখা। পুরুষদের ন্যায় আঙ্গুল ছড়িয়ে হাঁটু না ধরা।

(ত্বাহত্বাবী, ২১৫)

৮. রুকুতে উভয় পায়ের গোড়ালী পরিপূর্ণ মিলিয়ে রাখা। (শামী, ১ঃ ৫০৪)

৯. অত্যন্ত জড়সড় ও সংকুচিত হয়ে সিজদা করা।

(মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাঃ নং ৫০৬৯)

১০. সিজদায় পুরুষদের ন্যায় কনুইদ্বয় খোলা ও ছড়িয়ে না রাখা।

(মারাসীলে আবী দাউদ, হাঃ নং ৮৭)

১১. উভয় রানের সঙ্গে পেট মিলিয়ে রাখা।

(মারাসীলে আবী দাউদ, হাঃ নং ৮৭)

১২. বাহুদ্বয় সাধ্যানুযায়ী পাঁজরের সঙ্গে মিলিয়ে রাখা।

(মারাসীলে আবী দাউদ, হাঃ নং ৮৭)

১৩. উভয় কনুই সাধ্যমত মাটিতে মিলিয়ে রাখা।

(মারাসীলে আবী দাউদ, হাঃ নং ৮৭)

১৪. সিজদায় উভয় পা খাড়া না রাখা, বরং ডান দিক দিয়ে উভয় পা বের করে মাটিতে বিছিয়ে রাখা এবং উভয় পায়ের আঙ্গুলসমূহ যথাসম্ভব কিবলামুখী করে রাখা। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাঃ নং ২৭৮১, ২৭৯২)

১৫. বৈঠকের সময় বাম নিতম্বের উপর বসা।

(মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, ৩ : ১৩৯)

১৬. এবং উভয় পা ডান দিকে দিয়ে বের করে কিবলামুখী করে মাটিতে বিছিয়ে রাখা। (আল ইস্তিযকার, ১ঃ ৪৮০)

১৭. বৈঠকের সময় হাতের আঙ্গুলসমূহ মিলিয়ে হাঁটু বরাবর রাখা।

(মুসানাফে ইবনে আবী শাইবা, হাঃ নং ২৭৮৫)

বি.দ্র. দাঁড়ানো অবস্থায় মহিলাদের উভয় পা মিলিয়ে রাখার স্পষ্ট কোন প্রমাণ না থাকায় হযরত থানবী (রহ.) দু'পায়ের মাঝে পুরুষদের ন্যায় চার আঙ্গুল ফাঁক রাখার ফতওয়া দিয়েছেন। (ইমদাদুল ফাতাওয়া, ১ : ২২২)

নামাযে সাধারণ ঘটে যাওয়া ভুলসমূহ

কাতারের ভুলসমূহ

১. দাগের উপরে বা দাগে আঙ্গুল রেখে দাগের পিছনে দাঁড়ানো। নিয়ম হলো দাগের আগে গোড়ালী রেখে উভয় পা কিবলামুখী সোজা করে দাঁড়ানো।

২. কাতার ইমামের ডানে বাড়িয়ে ফেলা। অথচ নিয়ম হলো, ইমামের সোজাসুজি পিছনে একজন দাঁড়িয়ে তাঁর দু'দিক থেকে

সমানভাবে কাতারে লোক দাঁড়াবে। কোন দিকে কাতার লম্বা করবে না। (আলমগীরী ১ : ৮৭)

৩. সামনের কাতারে খালি জায়গা রেখে পিছনের কাতারে বসে থাকা বা পিছের কাতারে দাঁড়ানো। নিয়ম হল সবচেয়ে সামনের যে কাতারে খালী পাওয়া যায় সেখানে চলে যাওয়া। (শামী, ১ : ৫৭০)

৪. কাতারে মিলে মিলে না দাঁড়ানো এবং দু'জনের মাঝে এতটুকু ফাঁকা রাখা যার মধ্যে আর একজন দাঁড়াতে পারে। (মাসায়িলে নামায, ৮৭ পৃষ্ঠা)

৫. শেষ কাতারে শুধু একজন দাঁড়ানো। নিয়ম হলো কেউ কাতারে একা হলে, সামনের কাতার হতে মাসআলা জানেন এমন একজন মুসল্লীকে হাতে ধরে পিছনে নিয়ে আসবে, তিনিও সিনা ঠিক রেখে দু-এক কদম হেঁটে পিছের কাতারে আসবেন। মাসআলা জানেন এমন লোক না পাওয়া গেলে সেক্ষেত্রে একাই পিছনে দাঁড়াবে। (শামী, ১ : ৫৬৮)

৬. জামা'আত শুরু হওয়ার পর কাতারে দাঁড়িয়ে সুন্নাত পড়া। নিয়ম হলো ইকামত শুরু হয়ে গেলে একমাত্র ফজরের সুন্নাত ছাড়া অন্য কোন সুন্নাত শুরু না করা। আর ফজরের সুন্নাত জামা'আত পাওয়ার শর্তে কাতারের পিছনে বা বারান্দায় পড়া। (আলমগীরী, ১ : ১০৮)

ইকামাতের সময় ভুলসমূহ

১. ইকামতের সময় বা তাহরীমা বাঁধার পূর্বে অনেকেই হাত বেঁধে দাঁড়ায়। অথচ এমনটি করা মাকরূহ। নিয়ম হলো এ সময় হাত ছেড়ে রাখা। (ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়া, ৩ : ১৪)

২. অনেকে ইকামাতের জবাব দেয় না। অথচ আযানের ন্যায় ইকামাতের জবাব দেয়াও মুস্তাহাব। (আবু দাউদ, হাঃ নং ৫২৮)

তাকবীরে তাহরীমার ক্ষেত্রে ভুলসমূহ

১. অনেকে তাকবীরে তাহরীমার জন্য হাত উঠানোর সময় মাথা ঝুঁকায়, এটা নাজায়েয। সুন্নাত হলো মাথা সোজা রেখে সিজদার জায়গায় নজর রাখা।

(শামী ১ : ৪৪৪)

২. তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় পুরুষদের অনেকে চাদরের ভিতর থেকে হাত বের করে না। অথচ পুরুষদের জন্য চাদর থেকে হাত বের করে কান পর্যন্ত উঠানো মুস্তাহাব। তবে মহিলারা কাপড়ের ভিতর হতে হাত বের করবে না।

(শামী, ১ : ৪৭৮)

৩. অনেকে হাতের তালু কিবলামুখী করে উঠায় না। বরং হাতের তালু কানমুখী করে দু'পার্শ্বে উঠিয়ে বা হাতের আঙ্গুলসমূহ কিবলার দিকে বাঁকা করে নিয়ত বাঁধ। এরূপ করা ভুল।

৪. হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি কানের লতি পর্যন্ত উঠাতে হয়। অথচ অনেকে তড়িঘড়ি করে হাত সামান্য একটু উঠিয়েই নিয়ত বাঁধে।

৫. আরবী নিয়ত বলতে গিয়ে অনেকে তাকবীরে উলা, আবার অনেকে রুকু পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে। অথচ আরবীতে নিয়ত বলা জরুরী নয়। বরং আরবীতে নিয়ত বলা জরুরী মনে করলে বিদ'আত হবে। বাংলায় নির্দিষ্ট নামাযের ও ইমামের ইকতিদার নিয়ত করাই মুস্তাহাব আদায়ের জন্য যথেষ্ট। অধিকন্তু শুধু অন্তরে নির্দিষ্ট নামাযের সংকল্প করার দ্বারাই নিয়ত করার ফরয আদায় হয়ে যায়। নিয়ত মুখে বলা ফরয নয়, মুস্তাহাব। সবচেয়ে মারাত্মক বিষয় হলো, অনেকে আরবী নিয়ত পড়তে যেয়ে সেদিকে অর্থ না বুঝে এত বেশী মনোনিবেশ করে যে, নির্দিষ্ট নামায ও ইমামের ইকতিদার এরাদা বা সংকল্প অন্তরে উপস্থিত থাকেনা সেক্ষেত্রে নিয়ত

ফরয এটা না পাওয়ায় তার নামায হয় না।

৬. অনেকে তাকবীরে তাহরীমা ও অন্যান্য তাকবীরে 'আল্লাহ' শব্দ এর লামকে এক আলিফের চেয়ে বেশি লম্বা করে থাকে-এটা ভুল। এক আলিফকে এক আলিফই রাখতে হবে। বেশি লম্বা করা অনুচিত।

৭. অনেক সময় ইমামের তাকবীরে তাহরীমার পূর্বেই অনেকে তাকবীরে তাহরীমা বলে ফেলে। সে ক্ষেত্রে ইমামের আগে যদি মুক্তাদীর তাকবীর শেষ হয়ে যায়, তাহলে তার ইকতিদা ও নামায সহীহ হবে না। পুনরায় তাকবীর বলে তাহরীমা বাঁধতে হবে।

৮. 'আল্লাহু আকবার' বলে হাত বাঁধার আগে অনেকে হাত দু'দিকে ছেড়ে দিয়ে ঝুলিয়ে তারপর বাঁধে। এরূপ না করে হাত উঠিয়ে সরাসরি বাঁধাই বাঞ্ছনীয়।

৯. ইমামের তাকবীরের পরে খামাখা তাকবীর বলতে দেরী করা। অথচ ইমামের তাকবীরের পর সাথে সাথেই তাকবীর বলতে হয়।

কিয়াম অবস্থায় ভুলসমূহ

১. উভয় পায়ের মাঝে গোড়ালী ও আঙ্গুলের দিকে সমানভাবে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁক রেখে আঙ্গুলসমূহ কিবলামুখী করে রাখা সুন্নাত। কিন্তু অনেকেই তা এভাবে রাখে না। বরং পায়ের আঙ্গুলসমূহ উত্তর ও দক্ষিণ দিকে ছড়িয়ে রাখে। এতে পায়ের আঙ্গুলসমূহ কিবলামুখী থাকে না যা সুন্নাতের পরিপন্থী।

২. অনেকে দাঁড়ানো অবস্থায় মাথা ঝুঁকিয়ে রাখে। অথচ দাঁড়ানো অবস্থায় মাথা সোজা রেখে সিজদার স্থানে নজর রাখা সুন্নাত।

৩. দাঁড়ানো অবস্থায় অনেকে দু'পায়ে সমান ভর না দিয়ে এক পায়ে ভর দিয়ে বেঁকে দাঁড়ায়। অথচ এভাবে দাঁড়ানো উচিত নয়।

৪. অনেকে নাভী বরাবর বা নাভীর উপর হাত বাঁধে। অথচ

হানাফী মাযহাবে নিয়ম হলো নাভীর নীচে হাত বাঁধা।

৫. ইমামের সাথে নামায পড়ার সময় ‘ছানা’ না পড়া। অথচ একা হোক বা জামা‘আতে হোক, সর্বাবস্থায় ছানা পড়া সুন্নাত। তবে যাহেরী ক্বিরা‘আতে ইমামের ক্বিরা‘আত শুরু হয়ে গেলে, ছানা পড়বে না। তাছাড়া মুক্তাদী আউযুবিল্লাহ এবং বিসমিল্লাহও পড়বে না।

ক্বিরা‘আত অবস্থায় ভুলসমূহ

১. অনেকে ইমামের পিছনে বিড়বিড় করে সূরা ফাতিহা বা অন্য কিছু পড়তে থাকে। অথচ মুক্তাদীর জন্য সূরা ফাতিহা বা অন্য কোন সূরা মুখে পড়া নিষেধ।

২. অনেকের ধারণা অনুচ্চ স্বরে ক্বিরা‘আত পড়লে মদ, গুন্নাহ, ইযহার, ইখফা ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য করার প্রয়োজন হয় না। এটা সঠিক নয়। বরং সব কিরাআতেই তাজবীদ জরুরী। তাই সিররী নামাযেও জাহরী নামাযের মত সময় ব্যয় করে তাজবীদসহ ক্বিরা‘আত পড়া উচিত।

৩. যোহরের নামাযে ‘তিওয়ালে মুফাসসাল’ (লম্বা ক্বিরা‘আত) বা কমপক্ষে ‘আওসাতে মুফাসসাল’ (মধ্যম ক্বিরা‘আত) পড়া সুন্নাত। অথচ অধিকাংশ ইমামগণ যোহরের নামাযে ‘কিসারে মুফাসসাল, (ছোট সূরা) পড়ে থাকেন যা সুন্নাত পরিপন্থী।

৪. অনেকে ক্বিরা‘আত এত বেশি ধীরে পড়েন যার কারণে সুন্নাত পরিমাণ ক্বিরা‘আত পড়া সম্ভব হয় উঠে না। অথচ নিয়ম হলো বেশি ধীরেও না পড়া, আবার বেশি তাড়াতাড়িও না পড়া; বরং মধ্যম গতিতে হদরের সাথে সুন্নাত পরিমাণ ক্বিরা‘আত পড়া।

তারাবীহ নামাযে অধিকাংশ হাফেযগণ এত দ্রুত ক্বিরা‘আত পড়ে থাকেন যে, তাদের পড়া বুঝাই যায় না। এমন দ্রুত পড়া

কুরআন বিকৃত করার শামিল, যা নাজায়েয। এতে নামাযের সওয়াব হাসিল হওয়া তো দূরের কথা, নামায সহীহ হওয়ার ব্যাপারেই সন্দেহ রয়েছে।

৫. অনেকে তিন রাক‘আত বা চার রাক‘আত বিশিষ্ট ফরয নামাযের সব রাক‘আতেই সূরা মিলিয়ে থাকে। অথচ ফরযের শুধু প্রথম দু’রাকা‘আতে সূরা মিলাতে হয়। আবার অনেকে চার রাকা‘আত বিশিষ্ট সুন্নাত ও নফরের মধ্যে শেষের দু’রাকা‘আতের মধ্যে শুধু সূরা ফাতিহা পড়ে থাকে। অথচ সুন্নাত ও নফরের সব রাকা‘আতেই সূরা ফাতিহার পর সূরা মিলানো জরুরী।

৬. অনেক ইমাম প্রথম রাকাআতকে দ্বিতীয় রাকাআত থেকে তিন আয়াত বা তার বেশি লম্বা করে থাকেন অথচ সুন্নাত হলো একমাত্র ফজরের নামায ব্যতীত অন্য চার ওয়াক্তে উভয় রাকা‘আতে কিরাআতের পরিমাণ সমান রাখা এবং এক দু‘আয়াতের বেশি না বাড়ানো।

রুকু অবস্থায় ভুলসমূহ

১. অনেকে রুকুতে গিয়ে মাথা, পিঠ, কোমর বরাবর করে না এবং পিঠ বিছিয়ে রাখে না এবং কেউ মাথা উঁচু করে রাখে, আবার কেউ মাথা নীচু করে রাখে, এসবই মাকরূহ। কেউ পিঠ গোল করে রাখে। অথচ মাথা, পিঠ, কোমর বরাবর রাখা এবং পিঠ বিছিয়ে রাখা সুন্নাত।

২. অনেকে হাঁটু বাঁকা করে তা সামনে বাড়িয়ে রাখে। আবার কেউ এমনভাবে দাঁড়ায় যে, উপরের অংশ পিছের দিকে বাঁকা হয়ে থাকে। উভয় পদ্ধতিই পা সম্পূর্ণ সোজা না থাকায় ভুল। পা সম্পূর্ণ সোজা রাখা সুন্নাত। এর নিয়ম হল শরীরের ভার সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকিয়ে রাখা।

৩. অনেকে রুকু অবস্থায় হাতের আঙ্গুলসমূহ মিলিয়ে রাখে এবং হাতকে হাঁটুর উপর একেবারে হালকাভাবে রেখে দেয়। অথচ পুরুষদের জন্য নিয়ম হল আঙ্গুলসমূহ ফাঁকা রাখা এবং উভয় হাত দ্বারা হাঁটুতে শক্তভাবে ধরা।

৪. অনেকে কনই বাঁকা করে রাখে, যা ভুল। রুকু অবস্থায় হাত সম্পূর্ণ সোজা রাখতে হয়।

৫. অনেকে কোন রকম রুকুতে গিয়েই তাড়াতাড়ি আবার দাঁড়িয়ে যায়। অথচ নিয়ম হলো রুকুতে গিয়ে ধীরস্থিরভাবে কমপক্ষে তিনবার তাসবীহ পড়ে তারপর দাঁড়ানো।

৬. অনেকে রুকু থেকে সোজা হয়ে হাত ছেড়ে স্থিরভাবে দাঁড়ায় না, বরং সামান্য মাথা উঁচিয়েই সিজদায় চলে যায়। এতে ইচ্ছাকৃতভাবে দু'টি ওয়াজিব (অর্থাত রুকু থেকে সম্পূর্ণ সোজা হওয়া এবং সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পর এক তাসবীহ পরিমাণ বিলম্ব করা।) তরক করায় নামায নষ্ট হয়ে যায়। এমন নামায পুনরায় পড়া ওয়াজিব।

সিজদা অবস্থায় ভুলসমূহ

১. অধিকাংশ লোকই দাঁড়ানো হতে সিজদায় যাওয়ার সময় বিনা ওযরে বুক ও মাথা নীচের দিকে ঝুঁকিয়ে সিজদায় যায়। এটা মারাত্মক ভুল। এতে এক রাকা'আতে দুই রুকু হয়ে নামায খেলাফে সুন্নাত হয়ে যায়। সিজদায় যাওয়ার সময় হাঁটু মাটিতে লাগার আগ পর্যন্ত বুক ও মাথা সম্পূর্ণ সোজা রাখা উচিত।

২. সিজদায় যাওয়ার সময় বা সিজদা থেকে উঠার সময় অনেকে তাকবীর এক আলিফ থেকে বেশি টানতে থাকে, এটা ভুল। তারতীলের সাথে এক আলিফ লম্বা করা উচিত।

৩. অনেকে সিজদায় গিয়ে দুই হাতের আঙ্গুলসমূহ ছড়িয়ে রাখে।

অথচ সিজদায় হাতের আঙ্গুলসমূহ মিলিয়ে রাখা সুন্নাত। এরূপ অনেকে হাতের আঙ্গুলসমূহ কান বরাবর রাখে না। বরং আগ-পাছ করে রাখে, এটাও ভুল।

৪. অনেকে সিজদায় উভয় পায়ের মাঝে দাঁড়ানোর ন্যায় চার আঙ্গুল ফাঁক রাখে না এবং আঙ্গুলসমূহ মুড়িয়ে কিবলা মুখী করে উভয় পা খাড়া করে রাখে না বরং উভয় গোড়ালী মিলিয়ে রাখে অথবা পায়ের আঙ্গুলগুলোর মাথা পূর্ব দিকে করে রাখে যা সুন্নাতের খেলাফ।

৫. অনেকে সিজদায় পা যমীন থেকে উঠিয়ে রাখে। অথচ সিজদা আদায় হওয়ার জন্য পা যমীনে লাগিয়ে রাখা জরুরী।

৬. সিজদা অবস্থায় অনেকে উভয় উরু সোজা খাড়া রাখে না। বরং উপরাংশ পূর্বদিকে বা পশ্চিম দিকে বাঁকা করে রাখে যা ভুল। এই ভুল থেকে বাঁচার পদ্ধতি হলো সিজদার সময় হাঁটু থেকে আনুমানিক এক হাত দূরে হাত রেখে উভয় হাতের মাঝে চেহারা রেখে সিজদা করবে।

৭. সিজদায় অনেক সময় পুরুষরা কনুই মাটির উপর বিছিয়ে রাখে বা কনুই হাঁটুর সাথে মিলিয়ে রাখে আবার অনেকে বাহু বা হাত পাঁজরের সাথে মিলিয়ে রাখে। অথচ এসব অঙ্গ পৃথক রাখতে হয়। তবে মহিলারা জড়সড় ও সংকুচিত হয়ে এক অঙ্গের সাথে আরেক অঙ্গ মিলিয়ে সিজদা করবে।

৮. মহিলারা অনেক সময় পুরুষদের মত পা খাড়া করে সিজদা করে। অথচ মহিলাদের সিজদা করার সময় উভয় পা ডান দিক দিয়ে বের করে কিবলামুখী করে বিছিয়ে রাখতে হয়।

নামাযে বসা অবস্থায় ভুলসমূহ

১. অনেকে দুই সিজদার মাঝে সোজা হয়ে না বসেই আরেক

সিজদায় চলে যায়। অথচ এতে ইচ্ছাকৃতভাবে দুটি ওয়াজিব (সিজদা থেকে সোজা হয়ে বসা এবং বসার পর এক তাসবীহ পরিমাণ বিলম্ব করা) তরক করায় নামায নষ্ট হয়ে যায়। এমতাবস্থায় নামায পুনরায় পড়া ওয়াজিব।

২. অনেকে দুই সিজদার মাঝে এবং তাশাহুদ (আত্তাহিয়্যাতু) পড়ার সময় ডান পা খাড়া রাখে না, বরং বাঁকা করে রাখে। অথচ তা সুন্নাতের খেলাফ।

৩. দ্বিতীয় সিজদা থেকে উঠার সময় বা মধ্যবর্তী বৈঠক হতে দাঁড়ানোর সময় অনেকে বিনা ওযরে হাত দিয় যমীনে ভর করে দাঁড়ায়। অথচ তা মাকরূহ।

সালামের ভুলসমূহ

১. অনেকে উভয় সালাম ফিরানোর সময় কোন নিয়ত করে না। অথচ উভয় দিকে সালাম ফিরানোর সময় মুসল্লী, ফেরেশতা, নামাযী জ্বিন ও ইমামের প্রতি সালাম করার নিয়ত করতে হয়।

২. অনেকে 'আসসালামু' বলা শুরু করার সাথে সাথে চেহারা ডানে বা বামে ঘুরিয়ে ফেলে অথচ 'আসসালামু' বলা পর্যন্ত উভয় সালামে চেহারা কিবলার দিকে রাখতে হয়। তারপর 'আলাইকুম' বলার সময় চেহারা ঘুরাতে হয়। অনেকেই দ্বিতীয় সালাম কিবলার দিক হতে শুরু করে না। বরং ডান দিকে চেহারা থাকা অবস্থাতেই দ্বিতীয় সালাম শুরু করে দেয়, এটা ভুল। এমনিভাবে সালামের সময় বুক ফিরানো ভুল। বরং শুধু চেহারা এতটুকু ঘুরাবে, যেন পিছনের কাতার হতে চোয়াল দেখা যায়।

৩. ইমামের জন্য দ্বিতীয় সালামের আওয়াজ প্রথম সালামের আওয়াজের তুলনায় ক্ষীনস্বরে বলা সুন্নাত। কিন্তু অনেকেই তা পালন করেনা এবং উভয় সালামে এক সমান আওয়াজ করে, যা ভুল।

৪. মাসবূক ইমামের দ্বিতীয় সালাম ফিরানো শুরু করার সাথে সাথে উঠে পড়ে। অথচ ইমামের দ্বিতীয় সালাম সম্পূর্ণ শেষ হওয়ার পরই মাসবূকের জন্য দাঁড়ানো উত্তম।

মুনাজাতের ভুলসমূহ

১. মুনাজাতের সময় অনেকে উভয় হাত কাঁধ থেকে উপরে উঠিয়ে রাখে। অথচ এ সময় উভয় হাত বুক বা কাঁধ বরাবর রাখাই নিয়ম।

২. মুনাজাতের সময় অনেকে উভয় হাত অনেক বেশি ফাঁকা করে অথবা একেবারে মিলিয়ে রাখে। আবার কেউ কেউ দড়ি পাকানোর মত করতে থাকে। এসবই ভুল। নিয়ম হল, উভয় হাতের মাঝখানে দু'এক আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁকা রাখা।

৩. অনেকে হাতের তালু চেহারামুখী করে রাখে। অথচ হাতের তালু আসমানের দিকে করে রাখা উচিত।

৪. আল্লাহর হামদ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি দরূদ দ্বারা মুনাজাত আরম্ভ করা এবং হামদ ও দরূদ এবং আমীন দ্বারা মুনাজাত শেষ করা সুন্নাত। অথচ অনেকে এ নিয়ম ব্যতিরেকেই 'আল্লাহুম্মা আমীন' বলে মুনাজাত শুরু করে এবং 'বাহক্কে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলে মুনাজাত শেষ করে। এরূপ সব সময় করতে থাকা বিদ'আত।

৫। অনেকে ফরয নামাযের পর দু'আ, যিকির না পড়েই সালাম ফিরানোর সাথে সাথে সুন্নাত বা নফল পড়ার জন্য দাঁড়িয়ে যায়। এটাও সুন্নাতের খেলাফ। ফরয নামাযের পর কিছু সময় দু'আ-দরূদ, যিকির-আযকার ও তাসবীহ-তাহলীল ইত্যাদি পাঠ করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, এর ব্যতিক্রমকারীকে হযরত উমর (রা.) কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বসিয়ে দিয়েছিলেন এবং হযরত নবী কারীম

(সা.) হযরত উমর (রা.)-এর এ কাজকে সমর্থন করেছিলেন এবং বলেছিলেন, ফরয সুন্নাত ও নফল নামাযের মাঝে পার্থক্য না করায় বনী ইসরাঈলকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল। (আবু দাউদ, হাঃ নং ১০০৭)

তবে মাগরিবের ফরয নামাযের পর সুন্নাত পড়তে অধিক সময় বিলম্ব করা অনুচিত। মনে মনে মুনাজাত করা মুস্তাহাব। কারো ইবাদতে বিঘ্ন সৃষ্টি না হলে আওয়াজ করে দু'আকরা জায়েয। অনেক ইমাম সাহেব উচ্চৈঃস্বরে মুনাজাত করে মাসবূকদের অবশিষ্ট নামাযের মধ্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করেন, এটা নাজায়েয।

জুমু'আর দিনের বিশেষ আমল

যে ব্যক্তি জুমু'আর দিনে ছয়টি কাজ করবে, সে জুমু'আর নামাযের যাওয়ার পথে প্রতি কদমে (পা ফেলায়) এক বছরের নফল নামায ও এক বছরের নফল রোযার সওয়াব পাবে।

ছয়টি কাজ এই-

১. জুমুআর নামাযের উদ্দেশ্যে ভালভাবে গোসল করা।

২. ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে (আযানের অপেক্ষা না করে) মসজিদে যাওয়া।

৩. পায়ে হেঁটে মসজিদে যাওয়া।

৪. ইমাম সাহেবের নিকটে বসা। অর্থাত, যতদূর সম্ভব সামনের কাতারে বসা।

৫. মনোযোগ সহকারে খুতবা শুনা।

৬. খুতবার সময় কোন কথা না বলা ও কোন কাজ না করা।

(সহীহ ইবনে খুযাইমাহ, হাঃ নং ১৭৫৮/ নাসায়ী, হাঃ নং ১৩৮৪, তিরমিযী, হাঃ নং ৪৯৬/ আবু দাউদ, হাঃ নং ৩৪৫)

বি.দ্র. কোন সহীহ হাদীসে বর্ণিত আমল ছাড়া অন্য কোন নফল আমলের ব্যাপারে এত বেশি ফযীলতের কথা পাওয়া যায় না।

এছাড়াও জুমু'আর দিনে আরো কিছু আমল করা সুন্নাত। যথা : উত্তম ও পরিষ্কার কাপড় পরিধান করা, আতর লাগানো, সূরায়ে কাহফ তিলাওয়াত করা, বেশি বেশি দুরূদ শরীফ পড়া, সালাতুত তাসবীহ পড়া, দুই খুতবার মাঝখানে হাত উঠানো ব্যতীত মনে মনে দু'আকরা, পুরুষ ও মহিলা সকরের জন্য আসরের নামাযের পর নিজ স্থানে বসেই নিচের দরূদ শরীফটি ৮০ বার পাঠ করা।

اللهم صلى على محمدن النبى الامى وعلى اله وسلم تسليما

বি.দ্র. বর্ণিত দরূদ শরীফের ফযীলত এই যে, আমলকারীর আমলনামায় ৮০ বছরের ইবাদাত বন্দেগীর সওয়াব লেখা হয় এবং তার ৮০ বছরের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

(ইবনু বাশকুয়াল, আল কাওসুল বাদী ফিস সালাতি ওয়াস সালামি আলাল হাবীবিশ শাফী, পৃ. ২৮৪)

এবং সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ পূর্ব হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত গুরুত্বের সাথে যিকির ও দু'আয় লিপ্ত থাকা।

(আবু দাউদ, হাঃ নং ৩৪৭/ আবু দাউদ, হাঃ নং ১২৯১/ মুস্তাদরাক, হাঃ নং ৩৩৯২/ মুস্তাদরাক, হাঃ নং ৮৬৮১)

ঈদের সুন্নাতসমূহ

(১) অন্য দিনের তুলনায় সকালে ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া।

(বাইহাকী, হাঃ নং ৬১২৬)

(২) মিসওয়াক করা। (তাবঈনুল হাকাইক, ১ : ৫৩৮)

(৩) গোসল করা। (ইবনে মাজাহ, হাঃ নং ১৩১৫)

(৪) শরীয়তসম্মত সাজসজ্জা করা। (বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৯৪৮)

(৫) সামর্থ অনুপাতে উত্তম পোশাক পরিধান করা।

(বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৯৪৮/ মুস্তাদরাকে হাকেম, হাঃ নং ৭৫৬০)

(৬) সুগন্ধি ব্যবহার করা। (মুস্তাদরাকে হাকেম হাঃ নং ৭৫৬০)

(৭) ঈদুল ফিতরে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে মিষ্টি জাতীয় যেমন (খেজুর ইত্যাদি) খাওয়া। তবে ঈদুল আযহাতে কিছু না খেয়ে ঈদের নামাযের পরে নিজের কুরবানীর গোশত আহার করা উত্তম। (বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৯৫৩/ তিরমিযী শরীফ, হাঃ নং ৫৪২/ দারেমী হাঃ নং ১৬০৩)

(৮) সকাল সকাল ঈদগাহে যাওয়া। (আবু দাউদ, হাঃ নং ১১৫৭)

(৯) ঈদুল ফিতরে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে ছাদাকায়ে ফিতর আদায় করা।

(দারাকুতনী, হাঃ নং ১৬৯৪)

(১০) ঈদের নামায ইদগাহে আদায় করা, বিনা অপারগতায় মসজিদে আদায় না করা।

(বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৯৫৬/ আবু দাউদ হাঃ নং ১১৫৮)

(১১) যে রাস্তায় ঈদগাহে যাবে সম্ভব হলে ফিরার সময় অন্য রাস্তা দিয়ে ফেরা। (বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৯৮৬)

(১২) পায় হেঁটে যাওয়া। (আবু দাউদ, হাঃ নং ১১৪৩)

(১৩) ঈদুল ফিতরে ঈদগাহে যাওয়ার সময় আস্তে আস্তে এই তাকবীর পড়তে থাকা-

الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد

তবে ঈদুল আযহাতে যাওয়ার সময় পথে এ তাকবীর আওয়াজ করে পড়তে থাকবে। (মুস্তাদরাকে হাকেম, হাঃ নং ১১০৫/ বাইহাকী, হাঃ নং ৬১৩০)

খানা খাওয়ার সুন্নাতসমূহ

১. উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধোয়া। (আবু দাউদ, হাঃ নং ৩৭৬১)

২. দস্তরখানা বিছিয়ে খানা খাওয়া। (বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৫৩৮৬)

বি.দ্র. (ক) প্রথমে খানা তথা আল্লাহর নেয়ামতের দিকে মুখাপেক্ষী হয়ে বসা, তারপর দস্তরখানা বিছানো। (বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৫৩৮৫, ৫৩৯৯)

(খ) দস্তরখানা খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত। এর উপর ঝুটা (উচ্ছিষ্ট খাবার) হাড্ডি ইত্যাদি না ফেলা বা তাতে পা না রাখা উচিত।

(মুসলিম হাঃ নং ২০৩৩)

৩. (উঁচু স্বরে) বিসমিল্লাহ পড়া। (বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৫৩৭৬)

৪. ডান হাত দিয়ে খাওয়া।

(বুখারী, হাঃ নং ৫৩৭৬/ মুসলিম, হাঃ নং ২০২০)

৫. খানার মজলিসে বয়সের দিক দিয়ে যিনি বড় এবং বুযুর্গ, তাঁর দ্বারা খানা শুরু করানো। (মুসলিম, হাঃ নং ২০১৭)

৬. খাদ্য এক ধরনের হলে নিজের সম্মুখ হতে খাওয়া।

(বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৫৩৭৬)

৭. খাদ্যের কোন অংশ পড়ে গেলে উঠিয়ে (প্রয়োজনে পরিষ্কার করে) খাওয়া। (মুসলিম, হাঃ নং ২০৩৩)

৮. হেলান দিয়ে বসে না খাওয়া। (বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৫৩৯৮)

৯. খাদ্যের ত্রুটি বের না করা। (বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৫৪০৯)

১০. জুতা পরিহিত থাকলে জুতা খুলে খানা খাওয়া।

(মুস্তাদরাকে হাকেম, হাঃ নং ৭১২৯)

১১. খানার সময় তিনভাবে বসা যায়।

ক. উভয় হাঁটু উঠিয়ে এবং পদ যুগলে ভর করে। (মুসলিম, হাঃ নং ২০৪৪)

খ. এক হাঁটু উঠিয়ে এবং অপর হাঁটু বিছিয়ে।

(শরহুস্ সুন্নাহ, হাঃ নং ৩৫৭৭)

গ. উভয় হাঁটু বিছিয়ে অর্থাত নামাযে বসার ন্যায় বসে সামান্য সম্মুখ পানে ঝুঁকে আহার করা। (আবু দাউদ, হাঃ নং ৩৭৭৩)

বি.দ্র. উযরের কারণে আসন দিয়ে বসারও অনুমতি আছে। (সূরা নূর, আয়াত-৬১/ আল ইতহাফ, ৫ : ৪৮০)

১২. আহার গ্রহণ শেষে খানার পাত্রসমূহ আঙ্গুল দ্বারা ভালভাবে চেটে পরিস্কার করে খাওয়া। এতে খাবারের পাত্রসমূহ আহারকারীর জন্য মাগফিরাত কামনায় মহান আল্লাহর দরবারে দু'আকরে। হাতের আঙ্গুলসমূহ যথাক্রমে মধ্যমা, শাহাদাত, বৃদ্ধা চেটে খাওয়া।

(মুসলিম, হাঃ নং ২০৩৩/ তিরমিযী, হাঃ নং ১৮০৪/ তাবরানী আউসাত, হাঃ নং ১৬৪৯)

১৩. খানা শেষে এই দু'আ পড়া :

الحمد لله الذى اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين

(আবু দাউদ, ৩৮৫০)

১৪. খানা শেষে আগে দস্তরখানা উঠিয়ে তারপর নিজে উঠা।

(ইবনে মাজাহ, হাঃ নং ৩২৯৫)

১৫. দস্তরখানা ও অবশিষ্ট খানা উঠানোর সময় এই দু'আ পড়া :

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفى ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا

(বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৫৪৫৮)

১৬. খানা খেয়ে উভয় হাত ধোয়া। (তিরমিযী, হাঃ নং ১৮৪৬)

১৭. কুলি করে মুখ পরিষ্কার করা। (বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৫৪৫৫)

১৮. খানার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়তে ভুলে গেলে স্মরণ হওয়ার পর খানার মাঝে এই দু'আ পড়া : بسم الله اوله واخره (আবু দাউদ, হাঃ নং ৩৭৬৭)

১৯. কারো মেহমান হয়ে খানা খেলে প্রথমে আল্লাহর শুকর আদায়ে ১৩নং এ বর্ণিত দু'আ পড়ার পর মেযবানের শুকরিয়া আদায়ে এই দু'আ পড়া :

اللهم اطعم من اطعنى واسق من سقانى (মুসলিম, হাঃ নং ২০৫৫)

হাদীসে মেযবানকে শুনিয়ে এ দু'আটি পড়তেও উতসাহিত করা হয়েছে :

اكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكة وافطر عندكم الصائمون

(আবু দাউদ, হাঃ নং ৩৮৫৪)

২০. খানা খাওয়ার সময় একেবারে চুপ থাকা মাকরূহ। এজন্য খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে পরস্পরে ভাল কথা আলোচনা করা। কিন্তু যে ধরনের কথা বা সংবাদে দুশ্চিন্তা বা ঘৃণার উদ্রেক হতে পারে, তা খানার সময় বলা অনুচিত।

(বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৫৩৭৬)

পান করার সুন্নাতসমূহ

১. পানির পেয়ালা ডান হাত দিয়ে ধরা। (মুসলিম, হাঃ নং ২০২০)

২. বসে পান করা, বসতে অসুবিধা না হলে দাঁড়িয়ে পান না করা।

(মুসলিম, হাঃ নং ২০২৪)

৮. পানীয় দ্রব্য পান করে কাউকে দিতে হলে ডান দিকের

ব্যক্তিকে আগে দেয়া এবং এই ধারাবাহিকতা অনুযায়ীই শেষ করা।

(বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৫৬১৯)

৯. দুধ পান করার পূর্বে এই দু'আ পড়া :

اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه

(আবু দাউদ, হাঃ নং ৩৭৩০)

দুধ ব্যতীত অন্য কোন পানীয় দ্রব্য হলে وزدنا এর পরে خيرا বৃদ্ধি করা।

(আমালুল ইয়াওমি ওয়াল্লাইলাহ, ১২৭)

১০. যে ব্যক্তি পান করাবে তার সর্বশেষে পান করা।

(মুসলিম, হাঃ নং ৬৮১)

১১. যমযমের পানি কিবলামুখী হয়ে এ দু'আ পড়ে পান করা :

اللهم انى اسئلك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء

(মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাঃ নং ৯১১২/ সুনানে দারাকুতনী, হাঃ নং ২৭১২)

৩. বিসমিল্লাহ বলে পান করা এবং পান করে আলহামদুলিল্লাহ বলা।

(তাবরানী আওসাতা, হাঃ নং ৬৪৫২)

৪. কমপক্ষে তিন শ্বাসে পান করা এবং শ্বাস ছাড়ার সময় পানির পাত্র মুখ হতে সরিয়ে নেয়া। (বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৫৬৩১)

৫. পাত্রের ভাঙ্গা দিক দিয়ে পান না করা। (আবু দাউদ, হাঃ নং ৩৭২২)

৬. পাত্র যদি এমন হয়, যার ভিতর নজরে আসে না, সেটার মুখে মুখ লাগিয়ে পান না করা। কারণ, তাতে কোন বিষাক্ত প্রাণী ক্ষতি সাধন করতে পারে। (বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৫৬২৬)

৭. পানি পান করার পর এই দু'আ পড়া :

الحمد لله الذى سقانا ماء عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوبنا

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৮ : ১৩৭)

৮. উযু করার পর যে পাত্রে হাত দিয়ে পানি নেয়া হয়, সে পাত্রের অবশিষ্ট পানি কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে পান করা। এতে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি হতে আরোগ্য লাভ হয়। (শামী, ১ : ১২৯/ বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৫৬১৬)

ঘুমানোর সুন্নাতসমূহ

১. ইশার নামাযের পর যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ঘুমাতে চেষ্টা করা, যাতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠা সহজ হয়। (বুখারী, হাঃ নং ৫৪৭)

বি.দ্র. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যমীন, চৌকি, কাপড়ের বিছানা, চাটাই, চামড়ার বিছানা ইত্যাদির উপর শয়ন করেছেন বলে হাদীসে বর্ণিত আছে। (বুখারী শরীফ, হাঃ নং ২০৬৯/ শামায়িলে তিরমিযী, পৃ. ২২)

২. উযু করে শয়ন করা। (বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৬৩১১)

৩. শোয়ার পূর্বে বিছানা ভালভাবে ঝেড়ে নেয়া।

(বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৬৩২০)

৪. শয়নের পূর্বে পরিহিত কাপড় পরিবর্তন করে ঘুমের কাপড় পরিধান করা। (আল মাদখাল, ৩ : ১৬২)

৫. শয়নের পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' বলে নিম্নে বর্ণিত কাজগুলো করা : ১. দরজা বন্ধ করা। ২. মশক বা পানির পাত্র এবং খাদ্য দ্রব্যের পাত্র ও অন্যান্য পাত্রসমূহ ঢেকে রাখা। যদি ঢাকার জন্য কোন বস্তু না পাওয়া যায়, তাহলে 'বিসমিল্লাহ' পড়ে তার মুখে একটি লাটি বা ছড়ি রেখ দেয়া, ৩. বাতি নিভানো।

(বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৫৬২৩-২৪)

৬. ঘুমানোর পূর্বে উভয় চোখে তিনবার করে সুরমা লাগানো।

(মুস্তাদরাক, হাঃ নং ৮২৪৯)

৭. ঘুমানোর পূর্বে কিছু পরিমাণ কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা। যথা : আলহামদু শরীফ, সূরা কাফিরুন, আয়াতুল কুরসী, আমানার রসূল থেকে সূরা বাক্বারার শেষ পর্যন্ত, সূরা মুলক, আলিফ লাম মীম সিজদাহ ইত্যাদি তিলাওয়াত করা বেশি পড়া সম্ভব না হলে কমপক্ষে ছোট ২/ ৩ টি সূরা পড়ে নেয়া।

(তাবারানী কাবীর হাঃ নং-২১৯৫) (আল আদাবুল মুফরাদ, হাঃ নং ১২০৯/ বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৩২৭৫)

৮. ঘুমানোর পূর্বে কয়েকবার দরূদ শরীফ পাঠ করা এবং তাসবীহে ফাতেমী অর্থাত ৩৩ বার সুবাহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়া। (বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৩১১৩)

৯. সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস প্রত্যেকটা তিনবার করে পড়ে হাতে দম করে যতটুকু সম্ভব মাথা হতে পা পর্যন্ত সমস্ত শরীরে হাত মুছে দেয়া। তিনবার এরূপ করা। (বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৫০১৭)

১০. ঘুমানোর সময় ডান কাতে কিবলামুখী হয়ে শোয়া সুন্নাত। উপুড় হয়ে শয়ন করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ এভাবে শয়ন করাকে আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না।

(বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৬৩১৪/ সহীহ ইবনে হিব্বান হাঃ নং ৫৫৪৯)

১১. শয়ন করে এ দু'আ পড়া :

باسمك ربى وضعت جنبى وبك ارفعه، ان امسكت نفسى فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين

(বুখারী শরীপ, হাঃ নং ৬৩২০)

১২. ঘুমানোর পূর্বে তিনবার এই ইস্তিগফার পড়া :

استغفر الله الذى لا اله الا هو الحى القيوم واتوب اليه

(তিরমিযী, হাঃ নং ৩৩৯৭)

১৩. এই দু'আটিও পড়া : اللهم باسمك اموت واحيى

(বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৬৩১৪)

১৪. সর্বশেষে এ দু'আটি পড়া :

اللهم اسلمت وجهى اليك وفوضت امرى اليك والجأت ظهرى اليك رغبة ورهبة اليك لاملجأ ولا منجا منك الا اليك- اللهم امنت بكتابك الذى انزلت وبنبيك الذى ارسلت-

(বুখারী, হাঃ নং- ২৪৭)

১৫. শয়ন করার পর ভয়ে ঘুম না আসলে এই দু'আ পড়া :

اعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشرعباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون-

(তিরমিযী, হাঃ নং ৩৫২৮)

১৬. স্বপ্নে ভয়ংকর কিছু দেখে চক্ষু খুলে গেলে তিনবার اعوذ بالله من الشيطان الرجيم পড়ে বাঁ দিকে থু-থু ফেলে পার্শ্ব পরিবর্তন করে শোয়া। তাতে ক্ষতির আর কোন আশংকা থাকে না এবং এ দু'আটি পড়া :

اللهم انى اعوذبك من شر هذه الرؤيا-

(মুসলিম, হাঃ নং ২২৬২)

১৭. সুযোগ হলে দুপুরে খানার পর কিছুক্ষণ কাইলূল্লাহ করা অর্থাত শয়ন করা। চাই ঘুম আসুক বা না আসুক। (বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৯৩৯)

ঘুম থেকে উঠার সুন্নাতসমূহ

১. ঘুম থেকে উঠেই উভয় হাত দ্বারা মুখমণ্ডল এবং চক্ষুদ্বয়কে হালকাভাবে মর্দন করা, যাতে ঘুমের ভাব দূর হয়ে যায়। (বুখারী শরীফ, হাঃ নং ১৮৩)

২. ঘুম হতে উঠার পর এই দু'আ পড়া :

الحمد لله الذى احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور

(বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৬৩২৪)

৩. যখনই ঘুম হতে উঠা হয়, তখনই মিসওয়াক করা একটা সুন্নাত। উযু করার সময় উযুর সুন্নাত হিসেবে মিসওয়াক করা।

(বুখারী শরীফ, হাঃ নং ২৪৫/ আবু দাউদ, হাঃ নং ৪৭)

বিবাহের সুন্নাতসমূহ

১. মাসনূন বিবাহ সাদাসিধে ও অনাড়ম্বর হবে, যা অপচয়, অপব্যয়, বেপর্দা ও বিজাতীয় সংস্কৃতি, গান-বাদ্য, ভিডিও-অডিও মুক্ত হবে এবং তাতে যৌতুকের শর্ত বা সামর্থের অধিক মহরানার শর্ত থাকবে না।

(তাবরানী আউসাত, হাঃ নং ৩৬১২)

২. সত ও খোদাভীরু পাত্র-পাত্রীর সন্ধান করে বিবাহের পয়গাম পাঠানো। কোন বাহানা বা সুযোগে পাত্রী দেখা সম্ভব হলে, দেখে নেয়া মুস্তাহাব। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে ঘটা করে পাত্রী দেখানোর যে প্রথা আমাদের সমাজে প্রচলিত, তা সুন্নাতের পরিপন্থী ও পরিত্যাজ্য।

(ইমদাদুল ফাতাওয়া, ৪ : ২০০/ বুখারী হাঃ নং ৫০৯০)

৩. শাওয়াল মাসে এবং জুমু'আর দিনে মসজিদে বিবাহ সম্পাদন করা। উল্লেখ্য, সকল মাসের যে কোন দিন বিবাহ করা জায়েয আছে।

(মুসলিম, হাঃ নং ১৪২৩/ বাইহাকী, হাঃ নং ১৪৬৯৯)

৪. বিবাহের খবর ব্যাপকভাবে প্রচার করে বিবাহ করা এবং বিবাহের পরে আকদ অনুষ্ঠানে উপস্থিত লোকদের মাঝে খেজুর বন্টন করা।

(বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৫১৪৭)

৬. বাসর রাতে স্ত্রীর কপালের উপরের চুল হাতে নিয়ে এই দু'আ পড়া :

اللهم انى اسئلك خيرما وخير جبلتها عليه واعوذبك من شرها ومن شرما جبلتها عليه-

(আবু দাউদ, হাঃ নং ২১৬০)

৭. স্ত্রীর সঙ্গে প্রথমে অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি করবে, তারপর যখনই সহবাস-এর ইচ্ছা হয়, তখন প্রথমে নিম্নোক্ত দু'আ পড়ে নেবে :

بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا-

(মুসলিম, হাঃ নং ১৪৩৪)

বি.দ্র. উপরোক্ত দু'আ না পড়লে শয়তানের তাছীরে বাচ্চার উপর কু-প্রভাব পড়ে। অতঃপর সন্তান বড় হলে, তার মধ্যে ধীরে ধীরে তা প্রকাশ পেতে থাকে এবং বাচ্চা নাফরমান ও অবাধ্য হয়। সুতরাং পিতা-মাতাকে খুবই সতর্ক থাকা জরুরী।

৮. বাসর রাতের পর দু'হাতে আত্মীয়–স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, শুভাকাঙ্ক্ষী এবং গরীব-মিসকীনদের তাওফীক অনুযায়ী ওলীমা খাওয়ানোর আয়োজন করা।

(মুসলিম, হাঃ নং ১৪২৭)

বি.দ্র. (ক) কোন পক্ষ যেওরের শর্ত করা নিষেধ এবং ছেলের পক্ষ থেকে যৌতুক চাওয়া হারাম। (আহসানুর ফাতাওয়া, ৫ : ১৩)

(খ) কনের ইযন-এর জন্য সাক্ষীর কোন প্রয়োজন নাই। সুতরাং ছেলের পক্ষের লোক ইযন শুনতে যাওয়া অনর্থক এবং বেপর্দা। সুতরাং তা নিষেধ। মেয়ের কোন মাহরাম বিবাহের ওকীল হওয়ার অনুমতি নিবে।

(মুসলিম, হাঃ নং ১৪২১)

(গ) শর্ত আরোপ করে বরযাত্রীর নামে বরের সাথে অধিক সংখ্যক লোকজন নিয়ে যাওয়া এবং কনের বাড়ীতে মেহমান হয়ে কনের পিতার উপর বোঝা সৃষ্টি করা আজকের সমাজের একটি জঘন্য কু-প্রথা, যা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা আবশ্যক।

(মুসনাদে আহমদ, হাঃ নং ২০৭২২/ বুখারী হাঃ নং ২৬৯৭)

(ঘ) ওলীমায় অতিরিক্ত ব্যয় করা কিংবা খুব উঁচু মানের খানার ব্যবস্থা করা জরুরী নয়। বরং সামর্থানুযায়ী খরচ করাই সুন্নাত আদায়ের জন্য যথেষ্ট। যে ওলীমায় শুধু ধনী ও দুনিয়াদার লোকদের দাওয়াত করা হয়, দ্বীনদার ও গরীব-মিসকীনদের দাওয়াত করা হয় না, সে ওলীমাকে হাদীসে নিকৃষ্টতম ওলীমা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সুতরাং এ ধরনের নিকৃষ্ট ওলীমার আয়োজন থেকে বিরত থাকা উচিত। (আবু দাউদ, হাঃ নং ৩৭৫৪)

(ঙ) ওলীমার মজলিসে হাদিয়া লেন-দেন ঠিক নয়। কেউ হাদিয়া দিতে চাইলে নিজের সুযোগ মত পাঠিয়ে দিবে, প্রচার করবে না। গোপনে দিবে, এটাই হাদিয়ার সুন্নাত।

সফরের সুন্নাতসমূহ

১. কমপক্ষে দুই ব্যক্তি এক সাথে সফরে যাওয়া, পারতপক্ষে একা সফর না করা। (তিরমিযী, হাঃ নং ২১৬৫)

২. বাড়ী থেকে بسم الله توكلت على الله পড়ে বের হওয়া।

(আবু দাউদ, হাঃ নং ৫০৯৫)

৩. যানবাহনের দরজায় ‘বিসমিল্লাহ’ বলতে বলতে পা রাখা।

(আবু দাউদ, হাঃ নং ২৬০২)

৪. যানবাহনে ভাল ভাবে আসন গ্রহণের পর তিনবার আল্লাহু আকবার বলে এই দু‘আ পড়া :

سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلون- اللهم انى اسئلك فى سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا اللهم اطولنا البعد-اللهم انت الصاحب فى السفر والخليفة فى الاهل والمال اللهم انى اعوذبك من وعثاء السفر وكأبة المنظر وسوء المنقلب فى المال والاهل-

(আবু দাউদ, হাদীস নং ২৫৯৮, ২৫৯৯)

৫. সফরে কোথাও অবস্থানের প্রয়োজন হলে, কোন জায়গায় এমনভাবে অবস্থান করা, যাতে মানুষের চলাফেরা ইতাদির ব্যাঘাত না ঘটে।

(বুখারী, হাঃ নং ৬২২৯)

৬. নিজে বা যানবাহন উপরের দিকে উঠতে লাগলে আল্লাহু আকবার বলা।

(মুসলিম, হাঃ নং ১৩৪৪)

৭. নিজে বা যানবাহন নীচের দিকে নামতে বা অবতরণ করতে লাগলে সুবহানাল্লাহ বলা। (বুখারী শরীফ, হাঃ নং ২৯৯৩)

৮. দূর হতে গন্তব্যস্থান দৃষ্টিগোচর হতেই এই দু‘আ তিন বারপাঠ করা : اللهم بارك لنا فيها (তাবারানী আউসাত, হাঃ নং ৪৭৫৫)

৯. গন্তব্যবস্থানে প্রবেশ কালে এই দু‘আ পড়া :

اللهم ارزقنا جناها وحببنا الى اهلها وحبب صالحى اهلها الينا

(তাবরানী আউসাত, হাঃ নং ৪৭৫৫)

১০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : সফরের কার্য শেষ হলেই তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে আসবে। অযথা সফরকে দীর্ঘ করা ভাল নয়। (বুখারী শরীফ, হাঃ নং ১৮০৪)

১১. দীর্ঘ দিনের সফর শেষে বাড়ী প্রত্যাবর্তনকালে হঠাত করেই ঘরে প্রবেশ না করা। বরং প্রথমে নিজ গ্রাম বা মহল্লার মসজিদে এসে অবস্থান করা ও দু‘রাক‘আত নামায পড়া। অতঃপর বাড়ীতে আসার সংবাদ পৌঁছিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে লোকজনের সাথে সাক্ষাত করে নিজ বাড়ীতে প্রবেশ করা। তেমনিভাবে দীর্ঘদিন সফর হতে পিরে এসে গভীর রাতে বাড়ীতে প্রবেশ না করা। (মুসলিম, হাঃ নং ২৭৬৯/ বুখারী শরীফ, হাঃ নং ১৮০০)

বি.দ্র. সফরের প্রোগ্রামই এরূপ বানাবে যাতে সকাল হলে বাড়ী পৌঁছা যায়। তবে ঘরের লোকদের যদি তার গভীর রাতে পৌঁছার

সংবাদ জানা থাকে এবং তারা তার জন্য অপেক্ষায় থাকে, তবে রাতে এসে সরাসরি ঘরে প্রবেশ করায় কোন দোষ নেই। (বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৫২৪৭)

১২. সফরে কুকুর, ঘুংড়ু ও গলঘন্টী সঙ্গে না রাখা। কেননা, শয়তান এগুলোর পিছু নেয়, তাতে সফরের বরকত চলে যায়। উল্লেখ্য, সখ করে বাড়ীতে কুকুর পালা শরীয়তে নিষেধ।

(মুসলিম, হাঃ নং ১৫৭৪/ মুসলিম শরীফ, হাঃ নং ২১১৩)

১৩. সফর হতে প্রত্যাবর্তন করে এই দু'আ পড়া :

ائبون تائبون عابدون لربنا حامدون

(তিরমিযী, হাঃ নং ৩৪৪০)

নখ কাটার সুন্নাতসমূহ

১. সপ্তাহে একবার নখ কাটা। (শরহুস্ সুন্নাহ, হাঃ নং ৩০৯০)

২. শুক্রবার জুমু'আর নামাযে যাওয়ার পূর্বে নখ কাটা।

(শরহুস্ সুন্নাহ, হাঃ নং ৩০৯১)

৩. উভয় হাত (মুনাজাতের আকৃতিতে ধরে) ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল থেকে আরম্ভ করে ধারাবাহিকভাবে বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির নখ কেটে শেষ করা। অতঃপর সর্বশেষে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গলীর নখ কাটা।

(ফাতাওয়ায়ে শামী- ৬ : ৪০৬/ ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, ৫ : ৩৫৮)

৪. ডান পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুলি থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে বাম পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুলির নখ কেটে শেষ করা। (শামী, ৬ : ৪০৬)

বিবিধ সুন্নাত

১. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পথ চলার সময় রাস্তা হতে লোকদের ধাক্কানো বা সরানো হত না। (মুসনাদে আহমাদ, হাঃ

নং ১৪২৩৬)

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট কেউ কিছু চাইলে তিনি কখনও না বলতেন না। (অর্থাত প্রার্থীত জিনিস থাকলে তা দিয়ে দিতেন, আর না থাকলে অপরাগতা প্রকাশ করতেন।)

(মুসনাদে আহমাদ, হাঃ নং ১৪২৯৪)

৩. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো মুখ হতে স্বীয় চেহারা মুবারক ফিরিয়ে নিতেন না যতক্ষণ না সে তার চেহারা ফিরিয়ে নিত। কোন ব্যক্তি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কানে কানে কোন কথা বলতে চাইলে তিনি তার দিকে স্বীয় কান মুবারক বাড়িয়ে দিতেন এবং যতক্ষণ তার কথা শেষ না হতো, ততক্ষণ স্বীয় কর্ণ মুবারক সরিয়ে নিতেন না।

(ইবনে মাজাহ, হাঃ নং ৩৭১৬/ আবু দাউদ, হাঃ নং ৪৭৯৪)

৪. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাক্ষাতকালে নিজেই আগে সালাম করতেন, তারপর দু'হাতে মুসাফাহা করতেন। অনেক দিন পর কারো সাথে সাক্ষাত হলে তার সাথে মু'আনাকাও করতেন।

(আবু দাউদ, হাঃ নং ৫২১৪/ বুখারী শরীফ হাঃ নং ৬২৬৫-৬২৬৬)

বি.দ্র. সালাম দেয়ার সময় হাত তোলা বিধর্মীদের নীতি। সুতরাং হাত তুলবে না। তবে আওয়াজ না পৌঁছার আশংকা থাকলে হাত তুলতে পারে। কিন্তু স্যালুটের মত করে হাত তুলবে না। আর মুসাফাহার সময় প্রত্যেকের এক হাত অপর ব্যক্তির দু'হাতের মাঝখানে থাকবে। (বুখারী শরীফ, হাঃ নং-৬২৬৫)

অমুসলিমদের হ্যান্ডসেকের মত করে হাত ধরবে না। মু'আনাকার সময় উভয় ব্যক্তি নিজের ডান গর্দান একবার

মিলাবে। সাধারণত লোকেরা উভয় দিকে তিনবার সিনা মিলিয়ে থাকে এবং ঈদের দিন মুআনাকার ধুম পড়ে যায়। এর কোন ভিত্তি নেই।

৫. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে বিদায় দেয়ার সময় মুসাফাহা করতেন এবং এই দু‘আ পড়তেন :

استودع الله دينكم واما نتكم وخواتيم اعمالكم

(আবু দাউদ, হাঃ নং ২৬০১)

এবং যাকে বিদায় দিতেন তিনি এ দু‘আটি পড়তেন-

استو دعك الله الذى لا تضيع ودائعه-

ইবনে মাজাহ হাঃ নং ২৮২৫

৬. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন পছন্দনীয় জিনিস হাসিল করলে এই দু‘আ পড়তেন :

الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات-

(ইবনে মাজাহ, হাঃ নঙ ৩৮০৩)

৭. পক্ষান্তরে মনের ইচ্ছার ব্যতিক্রম কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে এই দু‘আ পড়তেন : -الحمد لله على كل حال

(ইবনে মাজাহ, হাঃ নং ৩৮০৩)

৮. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে এই দু‘আ পড়তেন : يا حى يا قيوم برحمتك استغيث

(তিরমিযী, হাঃ নং ৩৫২৪)

৯. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কারো দিকে তাকাতেন, তখন সম্পূর্ণ চেহারা ঘুরিয়ে তাকাতেন। অহংকারীদের ন্যায় আড় চোখে তাকাতেন না। (শামায়িলে তিরমিযী, পৃ. ১)

১০. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা দৃষ্টি নীচু করে থাকতেন। অধিক লাজুক হওয়ার কারণে তিনি কারো প্রতি দৃষ্টি ভরে তাকাতে পারতেন না।

(শামায়িলে তিরমিযী, পৃ. ২)

১১. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পথ চলার সময় কিছুটা সম্মুখ পানে ঝুঁকে চলতেন। দেখলে মনে হতো যেন তিনি উপর হতে নীচের দিকে অবতরণ করছেন। (শামায়িলে তিরমিযী, পৃ. ১)

১২. প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবার সাথে মিলেমিশে থাকতেন, স্বাতন্ত্র্য মর্যাদা বজায় রেখে চলতেন না। মাঝে মাঝে তিনি হাসি-কৌতুকও করতেন। তবে সে কৌতুকও হতো বাস্তবসম্মত। কাউকে কটাক্ষ করে বা অবাস্তব কথা বলে তিনি কোন কৌতুক করতেন না।

(শামায়িলে তিরমিযী, পৃ. ১৫)

বি.দ্র. হাসি কৌতুক-এর অনেক হিকমতের মধ্যে একটা হিকমত ছিল যে, এর কারণে লোকেরা নির্ভয়ে তাঁর নিকট যে কোন দ্বীনী প্রশ্ন করার সুযোগ পেত।

১৩. কোন দুঃস্থ বা বৃদ্ধা মহিলা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কথা বলতে চাইলে, রাস্তার একপার্শ্বে গিয়ে তিনি তাদের কথা শুনতেন।

(শামায়িলে তিরমিযী, পৃ. ২২)

১৪. রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় পরিবারের লোকদের ব্যাপারেও খুব লক্ষ্য রাখতেন। যাতে তাঁর দ্বারা তাদের কোনরূপ কষ্ট না হয়। এজন্য রাতে ঘর হতে বের হওয়ার প্রয়োজন হলে অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে উঠে জুতা পরিধান করতেন এবং নিঃশব্দে দরজা খুলে বের হতেন। অনুরূপভাবে ঘরে প্রবেশ করার সময়ও নিঃশব্দে প্রবেশ করতেন, যাতে ঘুমন্ত ব্যক্তিদের ঘুমের কোন প্রকার ব্যাঘাত না ঘটে। (মুসলিম, হাঃ নং ১০৩)

১৫. কোন সন্তানের বয়স সাত বছর হলে তাকে নামায এবং শরীয়তের অন্যান্য বিধি-বিধান পালনে অভ্যস্ত করানোর নির্দেশ

দিতেন।

(তিরমিযী, হাঃ নং ৪০৭)

১৬. সন্তানের বয়স দশ বছর হলে প্রয়োজনে তাকে নামাযের জন্য হাত দ্বারা (বেত বা লাঠি দ্বারা নয়) প্রহার করার তাকীদ করতেন।

(তিরমিযী, হাঃ নং ৪০৭)

১৭. সকল গোত্রের সম্মানিত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতেন। (শামায়িলে তিরমিযী, পৃ. ২৩)

১৮. দিনের সময়কে তিন ভাগ করে এক ভাগ আল্লাহর ইবাদত এবং দ্বীনের ফিকিরের জন্য, এক ভাগ পরিবার-পরিজনের খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য এবং আরেক ভাগ ব্যক্তিগত কাজ ও নিজের শরীরিক সুস্থতা বজায় রাখার জন্য নির্দিষ্ট করে নেয়ার তা'লীম দিতেন। (শামায়িলে তিরমিযী, পৃ. ২২)

১৯. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি অধিক পরিমাণ দরূদ পড়তে থাকা, প্রতিবেশীদের সাথে ভাল ব্যবহার করা, বড়দের সম্মান এবং ছোটদের স্নেহ করা নবীজীর গুরুত্বপূর্ণ তালীম।

(মুসলিম হাঃ নং ৪০৮/ শামায়িলে তিরমিযী, পৃ. ২৩)

২০. কোন আত্মীয়ের পক্ষ থেকে দুর্ব্যবহার পেলে তাকে মাফ করে দিয়ে তার সাথে ভাল সম্পর্ক বজায় রাখা নবীজীর তরীকা।

(বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৫৯৯১)

২১. সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর চাই সে ছেলে হোক বা মেয়ে হোক হালকা শব্দ করে তার ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইকামত বলা, কোন বুযুর্গের মুখে চিবিয়ে খেজুর, মিষ্টিদ্রব্য বাচ্চার মুখের তালুতে লাগিয়ে দেয়া, সপ্তম দিনে তার সুন্দর নাম রাখা এবং আক্বীকা করা।

(তিরমিযী, হাঃ নং ১৫১৪, ১৫২২, ১৫১৫/ মুসলিম, হাঃ নং

৫৬১৭)

২২. আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ঘনিষ্ঠ ও আন্তরিক সম্পর্ক রাখা এবং সর্বদা সাধ্যমত তাদের খোঁজ-খবর নেয়া। (বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৫৯৮৭)

২৩. বোগল, নাভীর নীচের অংশ নিয়মিত পরিস্কার করে রাখা, এগুলো পরিস্কার না করা অবস্থায় চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেলে গুনাহগার হবে।

(বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৬২৯৭/ তিরমিযী, হাঃ নং ২৭৫৮)

২৪. যাদের দাড়ি লম্বা হয়, তাদের দাড়ি তিন দিকে এক মুষ্টির কিছু বেশি বা কমপক্ষে এক মুষ্টি পরিমাণ রাখা ওয়াজিব। এক মুষ্টি থেকে ছোট করে রাখা বা একেবারে মুণ্ডিয়ে ফেলা হারাম। মোচ (গোঁফ) কাচি দ্বারা ছোট ছোট করে রাখা, যাতে উপরের ঠোঁটের কিনারা স্পষ্ট দেখা যায়। ব্লেড বা ক্ষুর দ্বারা মোচ একদম মুণ্ডিয়ে ফেলা অনুচিত। (বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৫৮৯২, ৫৮৯৩)

২৫. দুর্বলদের প্রতি সুনজর রাখা। তাদের প্রতি যুলুম হতে দেখলে সাধ্যানুযায়ী তা প্রতিহত করা। (বুখারী শরীফ, হাঃ নং ২৪৪৫)

২৬. নিজ স্ত্রীকে আনন্দ দানের জন্য তার সাথে কখনো কখনো হাসি-কৌতুক এবং খোশ গল্প করা। (শামায়িলে তিরমিযী, পৃ. ১৭)

২৭. মুসলমান ভাইয়ের সাক্ষাতে হাসিমুখে মিলিত হওয়া। সাক্ষাতের জন্য আগন্তুক ভাইয়ের উদ্দেশ্যে নিজস্থান থেকে সামান্য সরে গিয়ে বা অগ্রসর হয়ে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।

(তিরমিযী, হাঃ নং ১৮৩৩/ তাকমিলাতু ফাত্হুল্ মুলহিম, ৩ : ১২৭)

২৮. হাঁচি বা হাই আসলে হাত বা কাপড় দ্বারা মুখ ঢেকে নেয়া এবং যথাসাধ্য শব্দ কম করা। (আবু দাউদ, হাঃ নং ৫০২৯)

২৯. বিধর্মীদের মত দেখা যায় বা সতর-এর আকৃতি প্রকাশ পায়

বা পুরুষদের জন্য টাখনুর নীচে কাপড় পরা হারাম।

(বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৫৭৮৭/ মুসনাদে আহমাদ, হাঃ নং ৮৬৬৫)

৩০. নীচের কয়েকটি বিষয়ের প্রতি খুব বেশি খেয়াল রাখা অপরিহার্য। কেননা, উক্ত কাজগুলোই দ্বীনের সারমর্ম। এবং উক্ত বিষয়গুলোর ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরযে আইন।

ক. নিজের ঈমান আক্বীদা সহীহ ও মজবুত করা।

খ. ইবাদত-বন্দেগীসমূহ আমলী মশকের মাধ্যমে পরিপূর্ণ সুন্নাত অনুযায়ী শিখে নেয়া।

গ. রিযিককে হালাল রাখার পিকির করা।

ঘ. পিতা-মাতা, স্ত্রী সন্তান থেকে নিয়ে সকল আত্মীয়-স্বজন ও মুসলমানদের হক আদায়ে সচেষ্ট থাকা। মোটকথা, বান্দার হক্কের ব্যাপারে খুব বেশি ফিকির রাখা নতুবা সমস্ত ইবাদত-এর সওয়াব শেষ হয়ে যাবে।

ঙ. নিজের আত্মার রোগের চিকিতসার জন্য কোন হক্কানী বুযুর্গের সাথে সম্পর্ক রাখা।

চ. গুনাহে কবীরা, হারাম, মাকরূহে তাহরীমী ও মুশতাবিহ মনে হয় এমন জিনিস থেকে কঠোরভাবে পরহেয করা।

ছ. নিজের পরিবারের লোকজন,আত্মীয়-স্বজন,বন্ধু-বান্ধব ও মহল্লাবাসী লোকদেরকে সর্বদা দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকা এবং তাদের দ্বীনের তা‘লীম দিতে থাকা। সারকথা, আল্লাহর দ্বীনের জন্য প্রতিদিন কিছু সময় বের করা।

(সূরা বাক্বারা, আয়াত, ১৭৭/ তিরমিযী, হাঃ ২২৬৭)

মৃত্যু কালীন সুন্নাত সমুহ

১. মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তির চেহারা কিবলামুখী করে দেয়া এবং তার সামনে বসে তাকে শুনিয়ে কালিমা শরীফ পড়তে থাকা। তবে তাকে কালিমা পড়ার হুকুম দিবে না এবং তার পাশে বসে সূরা ইয়াসীন পড়া। উল্লেখ্য, কালিমা শরীফ একবার পড়ে নিয়ে তারপর যদি দুনিয়াবী কোন কথা না বলে তাহলে দ্বিতীয় বার কালিমার তালকীন না করা।

(মুস্তাদরাক, হাঃ নং ১৩০৫/ মুসরিম, হাঃ নং ৯১৬/ আবু দাউদ, হাঃ নং ৩১২১)

২. স্বীয় মৃত্যু নিকটবর্তী মনে হলে এই দু‘আ পড়তে থাকা :

اللهم اغفرلی وارحمنی والحقنی بالرفيق الاعلی-

(তিরমিযী, হাঃ নং ৩৪৯৬/ আবু দাউদ, হাঃ নং ৩১২১)

৩. যখন রূহ বের হচ্ছে বলে অনুভব হতে থাকে, তখন এই দু‘আ পড়া :

اللهم اعنی علی غمرات الموت او سکرات الموت-

(তিরমিযী, হাঃ নং ৯৭৮)

৪. কোন মুসলমানের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে এই দু‘আ পড়া :

انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرنی فی مصيبتی واخف لی خيرا منها

(মুসলিম, হাঃ নং ৯১৮)

৫. মৃত ব্যক্তির চক্ষুদ্বয় ও মুখ খোলা থাকলে বন্ধ করে দেয়া। প্রয়োজন বোধে মাথার উপর ও থুতনীর নীচ দিয়ে কাপড় বেঁধে দেয়া। চেহারা দেখা,আত্মীয়-স্বজনদের আসা,জানাযায় লোক কম হবে এসব কথা বলে দাফনে বিলম্ব করা নিষেধ। (মুসলিম, হাঃ নং ৯২০)

৬. মৃত ব্যক্তিকে খাটে রাখার সময় বা মৃত ব্যক্তির লাশবাহী খাট কাঁধে উঠানোর সময় ‘বিসমিল্লাহ’ বলা।

(মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ, হাঃ নং ১২০৬২)

৭. যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি মৃত ব্যক্তিকে গোসল, কাফন ও জানাযার নামায সম্পন্ন করে নিকটস্থ গোরস্থানে দাফনের ব্যবস্থা করা। দাফনের জন্য বিনা অপারগতায় দূরের গোরস্থানে বা এক শহর থেকে অন্য শহরে নেয়া মাকরূহ।

(আবু দাউদ, হাঃ নং ৩১৮, ৩১৬৫)

বি. দ্র. জানাযার পরে দাফনের পূর্বে হাত তুলে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা নিষেধ এবং জানাযার পর থেকে মুর্দার চেহারা দেখানো নিষেধ।

(আহসানুল ফাতাওয়া, ৪ : ২১৯/ ইমদাদুল মুফতীন, ৪৪৪ দারুল উলূম, ৫ : ৩০৫)

৮. মৃত ব্যক্তির লাশ কবরে রাখার সময় এই দু'আ পড়া :

بسم الله وعلى ملة رسول الله

(আবু দাউদ, হাঃ নং ১০৪৬/ মুসনাদে আহমাদ, হাঃ নং ৪৯৮৯)

৯. কবরে লাশ পুরোপুরি ডান কাতে শোয়ানো অর্থাত তার চেহারা ও সীনা কিবলামুখী করে দেয়া। এর জন্য কবরের তলদেশে পশ্চিম পার্শ্বে উত্তর দক্ষিণে লম্বাভাবে এক হাত পরিমাণ গর্ত করতে হবে অথবা পিঠের পেছনে ও মাথার নীচে মাটির চাকা দিয়ে ডান কাতে শোয়াতে হবে। মৃত ব্যক্তিকে কবরে চিত করে শুইয়ে শুধু তার চেহারা কিবলামুখী করে দিলেই সুন্নাতের অনুসরণ হবে না। (মুস্তাদরাক, হাঃ নং ১৯৭)

১০. আত্মীয়-স্বজনদের পক্ষ থেকে মৃত ব্যক্তির পরিবার পরিজনের জন্য প্রথম দিন খানার ব্যবস্থা করা উচিত। মৃত ব্যক্তির উপর যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ছিল, শুধু তারাই এ খানা খাবে। আগন্তুক মেহমানগণ উক্ত খানায় শরীক হবে না। বরং তারা সান্ত্বনা দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে যাবে। মৃত ব্যক্তির লোকদের উপর বোঝা সৃষ্টি করবে না। বর্তমানে বিষয়টিকে মোটেও খেয়াল করা হচ্ছে না। রেওয়াজ হিসেবে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে

মৃতের পরিবারের পক্ষ হতে কোনরূপ খানার আয়োজন না করা চাই। তেমনিভাবে ৪ দিনা, ৭/ ১০ দিনা, ত্রিশ-চল্লিশ কুলখানী ইত্যাদি বিধর্মীদের রসম। এগুলো থেকে কঠোরভাবে পরহেজ করবে। চাই মূর্খ লোকেরা যতই বদনাম করুক। আল্লাহর জন্য এ সব বদনাম বরদাশ্ত করে নিবে। 'জীবনের শেষদিন' কিতাব থেকে বিস্তারিত দেখে নিবে। (বুখারী শরীফ, হাঃ নং ৫৪১৭/ মুসনাদে আহমাদ, হাঃ নং ৯০৫)

১১. কবর খুব বেশি উঁচু না করা এবং পাকা না করা।

(মুসলিম, হাঃ নং ৯৬৯, ৯৭০)

১২. কবরের উপর পানি ছিটিয়ে দেয়া।

(মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাঃ নং ৬৪৮১)

১৩. মৃত ব্যক্তির দাফনকার্য সম্পন্ন করার পর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে তার মাগফিরাত কামনায় দু'আ করতেন এবং অন্যদেরকেও মাগফিরাতের দু'আ করতে বলতেন। বিশেষত মুনকার নাকীর ফিরিশতাদ্বয়ের প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে সে যেন দৃঢ়পদ ও অবিচল থাকতে পারে, সে জন্য দু'আ করতে বলতেন। (আবু দাউদ, হাঃ নং ৩২২১)

১৪. কবরের মাথার দিকে এক ব্যক্তি সূরা বাকারার শুরু থেকে مفلحون পর্যন্ত এবং পায়ের দিকে অপর ব্যক্তি امن الرسول থেকে শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করবে। কবরের চার কোণায় খুটি গাড়া এবং চার কোণায় চার কুল পড়ার কোন ভিত্তি পাওয়া যায় না। (শুআবুল ঈমান, হাঃ নং ৮৮৫৪)

সমাপ্ত

২

মাসনূন দু'আ ও দুরূদ

প্রথম অধ্যায়

মাসনূন দু'আ

১. উযুর শুরুতে পড়বে-

بسم الله الرحمن الرحيم

অর্থ : আল্লাহর নামে শুরু করছি যিনি অসীম দয়ালু অত্যন্ত দাতা।

(আবু দাঊদ, ১ : ১৪/ তিরমিযী, ১ : ১৩/ কিতাবুল আকার, ২ : ২)

২. উদুর মাঝে পড়বে-

اللهم اغفرلی ذنبی ووسع لی فی ذاری وبارك لی فی رزقی

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার গুনাহ মাফ করে দিন। আমার ঘর প্রশস্ত করে দিন। আমার রিযিক বৃদ্ধি করে দিন। (ইবনুস সুন্নী, ২৯-৩০)

৩. উযুর শেষে উপরের দিকে তাকিয়ে পড়বে-

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله-

অর্থ : আমি (অন্তরের অকাট্য বিশ্বাসের সাথে) চাক্ষুষ সাক্ষ্য (স্বরূপ মুখে ঘোষণা) দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ (ইবাদতের যোগ্য) নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা এবং রাসূল। (মুসলিম, ১ : ১২২)

৪. মসজিদে প্রবেশ করার সময় পড়বে-

بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفرلی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتك-

অর্থ : আল্লাহ তা'আলার নামে শুরু করছি। আল্লাহ তা'আলার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাম নাযিল হোক।

হে আল্লাহ! আমার গুনাহসমূহ মাফ করে দিন এবং আমার জন্য আপনার রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করে দিন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, ৭ : ১২৩/ ইবনে মাজাহ, ৫৬)

৫. মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় পড়বে

بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفرلى ذنوبى وافتح لى ابواب فضلك-

অর্থ : আল্লাহ তা'আলার নামে শুরু করছি। আল্লাহ তা'আলার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাম নাযিল হোক। হে আল্লাহ! আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন এবং আমার জন্য আপনার হালাল রুজির দ্বার উম্মুক্ত করে দিন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, ৭ : ১২৩/ ইবনে মাজাহ, ৫৬)

৬. আযানের শেষে প্রথমে দরূদ শরীফ পড়ে এ দু'আ পড়বে-

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلوة القائمة ات سيدنا محمدن الوسيلة والفضلة وابعثه مقاما محمودان الذى وعدته انك لا تخلف الميعاد-

অর্থ : হে পরিপূর্ণ দাওয়াত (তথা আযান) ও নামাযের মালিক আল্লাহ! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উসীলা ও উচ্চ মর্যাদা দান করুন এবং তাঁকে মাকামে মাহমুদে আসীন করুন, যার ওয়াদা আপনি তাঁর সাথে করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।

(বুখারী, ১ : ৮৬/ মুসলিম, ১ : ১৬৬/ বাইহাকী, ১ : ৪১০)

৭. পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পর পড়ার দু'আ সমূহ-

৩ বার استغفر الله الذى لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه (ইবনুস সুন্নী, ১২০)

(২) ১ বার اية الكرسى

(আসসুনানুল কুবরা নাসাঈ, ৬ : ৩০/ ইবনুস্ সুন্নী, ১১০)

(৩) تسبيح فاطمى অর্থাত ৩৩ বার, سبحان الله ৩৩ বার الحمد لله ৩৪ বার الله اكبر (মুসলিম, ১ : ২১৯)

(৪) ফজর ও মাগরিবের পর কথা বলার পূর্বে ৭ বার اللهم اجرنى من النار

(আবু দাউদ, ২ : ৬৯৩/ ইবনুস সুন্নী, ১২২)

(৫) ফজর ও মাগরিবের পর পড়বে-৩ বার اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم পড়ে, বিসমিল্লাহ পড়ার পর ১ বার سورة الحشر- এর শেষ ৩ আয়াত পড়বে। (তিরমিযী, ২ : ১২০)

বি. দ্র. লম্বা দু'আ সমূহ ফরয নামাযের পরে সুন্নাত না থাকলে ফরযের পরই পড়বে, আর সুন্নাত থাকলে সুন্নাত পড়ার পর পড়বে।

৮. খাওয়ার শুরুতে পড়বে-------------------------------------

অর্থ : আল্লাহ তা'আলার নামে শুরু করছি এবং আল্লাহ তা'আলার বরকতের সাথে এ খাবার খাচ্ছি। (মুস্তাদরাকে হাকিম, ৫ : ১৪৬)

৯. খানার শুরুতে দু'আ পড়তে ভুলে গেলে পড়বে-

بسم الله اوله واخره

অর্থ : আল্লাহ তা'আলার নামে খাচ্ছি, এর প্রথমাংশেও এবং শেষাংশেও।

(আবু দাউদ, ২ : ৫২৭/ তিরমিযী, ২ : ৭)

১০. আহারের শেষে পড়বে-

الحمد لله الذى اطعنما وسقانا وجعلنا من المسلمين

অর্থ : সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ পাকের জন্য যিনি আমাদেরকে পানাহার করিয়েছেন এবং আমাদেরকে মুসলমান বানিয়েছেন।

(আবু দাউদ ২ : ৫৩৮/ তিরমিযী, ২ : ১৮৪)

১১. পানি পান করার পর পড়বে-

الحمد لله الذى سقانا ماء عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوبنا

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে

স্বীয় রহমতে সুস্বাদু, সুমিষ্ট পানি পান করিয়েছেন এবং আমাদের গুনাহের কারণে তা তিক্ত ও লবণাক্ত করেননি। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ৮ : ১৪৫)

১২. দুধ পান করার সময় পড়বে-اللهم بارك فيه وزدنا منه

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি এই দুধের মধ্যে বরকত দান করুন এবং অধিক পরিমাণে দান করুন। (আবু দাউদ, ২য় : ৫২৪/ তিরমিযী, ২ : ১৮৩)

১৩. অবশিষ্ট খানা ও দস্তরখানা উঠানোর সময় পড়বে-

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفى ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا

অর্থ : সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ পাকের জন্য, অনেক অনেক প্রশংসা এবং পবিত্র ও বরকতপূর্ণ প্রশংসা। প্রভু হে! এ খানাকে না যথেষ্ট মনে করা যেতে পারে (যে আর প্রয়োজন হবে না), আর না একে সম্পূর্ণ বিদায় দেয়া যেতে পারে (যে আর তার সাক্ষাতের প্রয়োজন হবে না) না এ হতে বে-পরওয়া হওয়া যেতে পারে।

(বুখারী, ২ : ৮২০/ তিরমিযী, ২ : ১৮৪/ ইবনে মাজাহ, ২ : ২৩৬)

১৪. দাওয়াত খাওয়ার দু'আ- কোথাও দাওয়াত খেলে প্রথমে আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করবে, তারপর মেজবানের জন্য দু'টি দু'আ করবে-

(ক) চুপে চুপে নিম্নের দু'আ পড়বে-

اللهم اطعنا من اطعمنى واسق من سقانى

অর্থ : হে আল্লাহ! যে আমাকে আহার করিয়েছে আপনি তাকে আহার দান করুন এবং যে আমাকে পান করিয়েছে তাকে আপনি পান করান। (হিসনে হাসীন/ আল ফতুহাতুর রব্বানিয়া)

(খ) নিম্নের দু'আ মেজবানকে শুনিয়ে পড়বে-

اكل طعامكم الابرار وصلت عليكم املئكة وافطر عندكم الصائمون

অর্থ : আল্লাহ করুন- যেন (এমনিভাবে) নেককার লোকেরা তোমাদের খানা খায় এবং ফেরশতাগণ যেন তোমাদের উপর হমত বর্ষণের দু'আকরে এবং রোযাদারগণ যেন তোমাদের বাড়ীতে ইফতার করে।

(মুসান্নাদে আহমাদ, ৩ : ১৩৮/ আবু দাউদ, ২ : ৫৩৮)

১৫. অন্যের বাড়ীতে ইফতার করলে এ দু'আ পাঠ করবে-

افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملئكة

অর্থ : আল্লাহ করুন- যেন (এমনিভাবে) রোযাদারগণ তোমাদের বাড়ীতে রোযার ইফতার করে এবং নেক লোকেরা যেন তোমাদের খানা খায় এবং ফেরেশতাগণ যেন তোমাদের উপর রহমতের দু'আ করে।

(আসসুনানুল কুবরা নাসাঈ, ৬ : ৮১/ ইবনুস্ সুন্নী, ৪৩৩)

১৬. প্রস্রাবখানা ও পায়খানায় প্রবেশের পূর্বে পড়ে নিবে-

بسم الله اللهم انى اعوذبك من الخبث والخبائث

অর্থ : আল্লাহ তা'আলার নামে, হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষতিকারক নর ও নারী জ্বিন, শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

(তিরমিযী, ১ : ১৩২/ বুখারী, ১ : ২৬)

১৭. প্রস্রাবখানা ও পায়খানা থেকে বের হওয়ার পর পড়বে-

غفرانك الحمد لله الذى اذهب عنى الاذى وعفانى

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি। সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য, যিনি আমার থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করে দিয়েছেন এবং আমাকে সুস্থ রেখেছেন।

(আবু দাউদ, ১ : ৫/ তিরমিযী, ১ : ৭/ সহীহ ইবনে হিব্বান, ৪ :২৯১/ ইবনে মাজাহ, ১ : ২৬)

১৮. ঘুমানোর পূর্বে পড়বে-

اللهم باسمك اموت واحى

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনারই নামের সাথে মৃত্যুবরণ করব এবং আপনারই নামের সাথে জীবিত থাকব। (বুখারী, ২ : ৯৩২)

এরই সাথে নিম্নোক্ত দু'টি দু'আও পড়বে-

بسمك ربى وضعت جنبى وبك ارفعك ان امسكت نفسى فاغفرلها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين-

অর্থ : হে আমার রব! আমি আমার শরীরকে আপনার নামে বিছানায় রাখলাম (শয়ন করলাম) এবং আপনারই নামে বিছানা থেকে উঠাব। আপনি যদি ঘুমের মধ্যে আমার নফসকে উঠিয়ে নেন তাহলে তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আর যদি না উঠিয়ে নেন তাহলে তাকে আপনার নেক বান্দাদের মত হিফাজত করবেন। (বুখারী, ২ : ১১০০)

اللهم اسلمت وجهى اليك فوضت امرى اليك و الجأت ظهرى اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجأ ولا منجأ منك لا اليك اللهم امنت بكتابك الذى انزلت وبنبيك الذى ارسلت-

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আমার চেহারা (আত্মাকে) আপনার নিকট সোপর্দ করলাম এবং আমার সকল কর্ম আপনার উপর সোপর্দ করলাম এবং আমি আমার পৃষ্ঠ আপনার নিকট অর্পণ করলাম আপনার রহমতের প্রত্যাশায় এবং আপনার আযাবের ভয়ে। আর আপনার রহমতের আশ্রয় ও পানাহ ছাড়া অন্য কোন আশ্রয়স্থল নেই। হে আল্লাহ! আপনার অবতীর্ণ কিতাবের উপর ঈমান আনলাম এবং আপনার প্রেরিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর ঈমান আনলাম। (বুখারী, ১ : ৩৮)

১৯. যে ঘুমে ভয় পায় সে ঘুমের পূর্বে অথবা কারো ভয়ে ঘুম ভেঙ্গে গেলে এ দু'আপড়বে-

اعوذ بكلمات الله اتامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشيطان وان يحضرون

অর্থ : আমি আল্লাহ তা'আলার কালিমাতে তাম্মার উছিলা দিয়ে তাঁর ক্রোধ, শাস্তি এবং তাঁর বান্দাদের অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি

এবং শযতানের ওয়াসওয়াসা থেকে এবং শয়তানের উপস্থিতি হতে পানাহ চাচ্ছি।

(তিরমিযী, ২ : ১৯২/ আস্-সুনানুল কুবরা/ নাসাঈ, : ১৯১)

২০. ঘুম না এলে এ দু'আ পড়বে-

اللهم رب السموات السبح وما اظلت ورب الارضين وما اقلت ورب الشيطان وما اضلت كن لى جار امن شرخلقك كلهم جميعا ان يفرط على احد منهم او ان يبغى عز جارك وجل ثنائك لا اله غيرك لا اله الا انت-

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি সপ্তম আকাশের প্রতিপালক এবং ঐ সকল বস্তুর প্রতিপালক, যার উপর সপ্তম আকাশ বিস্তার করে আছে এবং যিনি সমগ্র জমিনের প্রতিপালক এবং ঐ সকল বস্তুর প্রতিপালক যা সমগ্র জমিন বহন করে আছে এবং যিনি শয়তান ও ঐ লোকদের প্রতিপালক যাদেরকে শয়তান গোমরা করেছে। হে প্রতিপালক আল্লাহ! আপনি সমগ্র মাখলুকের অনিষ্ট হতে আমার রক্ষাকারী এবং আশ্রয়দাতা হয়ে যান। যাতে এ সকল মাখলুকের মধ্য হতে কোন মাখলুক আমার উপর অত্যাচার-অবিচার করতে না পারে। নিশ্চয়ই একমাত্র আপনার আশ্রিত ব্যক্তিই প্রভাবশালী নিরাপদ এবং একমাত্র আপনার প্রশংসাই অতি মহান। আপনি ছাড়া অপর কোন মা'বুদ নেই। একমাত্র আপনি ইবাদতের যোগ্য। (তিরমিযী, ২ : ১৯২)

২১. ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর পড়বে-

الحمد لله الذى احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور

অর্থ : সকল প্রশংসা আল্লাহ পাকের যিনি আমাদেরকে মৃত্যু দানের পর পুনরায় জীবিত করেছেন এবং মৃত্যুর পর তাঁরই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (বুখারী, ২ : ১১০০/ মুসলিম, ২ : ৩৪৮)

২২. ঘরে বা অন্য কোথাও প্রবেশ করার দু'আ-

اللهم انى اسئلك خير المولج وخير المخرج بسم

২৩. ঘরে বা অন্য কোথাও প্রবেশ করার দু'আ-

اللهم انى اسئلك خير امولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ভিতরে প্রবেশ করার এবং বের হওয়ার মঙ্গল কামনা করছি। আমরা আল্লাহ তা'আলার নামে প্রবেশ করলাম এবং আল্লাহর নামে বের হলাম এবং আমরা আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর উপর ভরসা করলাম। (আবু দাউদ, ২ : ৬৯৫ হাদীস নং ৫৯৬)

২৪. ঘর থেকে বা অন্য কোন স্থান থেকে বের হওয়ার দু'আ-

بسم الله توكلت على الله لا حول ولاقوة الا بالله

অর্থ : আল্লাহ তা'আলার নামে (বের হলাম), আমি আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করলাম। আল্লাহর তাওফীক ছাড়া গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা বা কোন নেক কাজ করা সম্ভব নয়। (তিরমিযী, ২ : ১৮১/ আবু দাউদ, ২ : ৬৯৫)

২৫. মনের চাহিদা মুতাবিক অবস্থা হলে পড়বে-

الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات

অর্থ : সকল প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্য, যাঁর নেয়ামতের বদৌলতে সর্বপ্রকার পুণ্যময় কাজ সমাধা ও সম্পন্ন হয়। (ইবনে মাজাহ, ২৭০/ ইবনুস সুন্নী, ৩৩৪)

২৬. মনের ব্যতিক্রম কিছু হলে পড়বে-الحمد لله على كل حال

অর্থ : সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গংকর আদায় করি।

(ইবনে মাজাহ, ২৭০/ ইবনুস্ সুন্নী, ৩৩৪)

২৭. কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে পড়বে-

يا حى يا قيوم برحمتك استغيث

(তিরমিযী, ২ : ১৮২)

২৮. কেউ উপকার করলে তার জন্য এ বলে দু'আ করবে-

جزاك الله خيرا

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। (আস্-সুনানুল কুবরা, নাসাই, ৬ : ৫৩/ ইবনুস্ সুন্নী, : ২৪২)

২৯. কাউকে হাসিমুখে দেখলে পড়বে- اضحك الله سنك

অর্থ : আল্লাহ পাক আপনাকে চির হাসিমুখ রাখুন। (বুখারী, ১ : ৪৬৫)

৩০. মনে ওয়াসওয়াসা আসলে পড়ার দু'আঃ

মনের মধ্যে খারাপ চিন্তা বা আল্লাহ, রাসূল, পরকাল প্রভৃতির ব্যাপারে কোন ওয়াসওয়াসা এলে নিম্নের দু'আটি পড়বে এবং সাথে সাথে অন্য কোন ভাল কাজের ফিকিরে মনোনিবেশ করবে।

اعوذ بالله من الشيطان امنت بالله ورسله

অর্থ : আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট শয়তান থেকে পানাহ (আশ্রয়) চাচ্ছি এবং আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ঈমান এনেছি। (মুসলিম, ১ : ৭৯/ ইবনুসসুন্নী, ৫৭৯)

৩১. কাউকে কঠিন রোগাক্রান্ত বা খারাপ অবস্থায় দেখলে চুপে চুপে পড়ে-

الحمد لله الذى عافانى مما ابتلاك به وفضلنى على كثير ممن خلق تفضيلا

অর্থ : তুমি যে বিপদে বা রোগে পতিত হয়েছ, তা হতে আল্লাহ পাক যে আমাকে মুক্ত রেখেছেন এবং আমাকে যে অনেক মাখলুকাত হতে ভাল অবস্থায় এবং সম্মানে রেখেছেন এজন্য আমি আল্লাহ পাকের শোকরগুজারী এবং প্রশংসা আদায় করছি।

(তিরমিযী, ২ : ১৮২/ ইবনে মাজাহ, ২৭৭/ ইবনুস্ সুন্নী, ২৬৭-২৬৮)

৩২. সাপের ভয় হলে এ দু'আ পড়বে-

انا نسئلك بعهد نوح وبعهد سليمان بن داؤد ان لا تؤذينا

অর্থ : ও হে সাপ! আমরা নূহ্ আলাইহিস সালাম এবং সুলাইমান আলাইহিস সালামের অঙ্গীকারের কথা তোদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। তোরা আমাদের কোন ক্ষতি করিস না এবং আমাদের কষ্ট দিস না। (তিরমিযী, ১ : ২৭৪)

৩৩. সূর্য উঠার সময় পড়বে-

الحمد لله الذى اقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا

অর্থ : সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি আজকের দিনে আমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং গুনাহের কারণে আমাদেরকে ধ্বংস করেননি। (মুসলিম, ১ : ২৭৪)

৩৪. মাগরিবের আজানের সময় পড়বে-

اللهم هذا اقبال ليلك وادبار نهارك واصوات دعاتك فاغفرلى

অর্থ : হে আল্লাহ! এখন আপনার রাত্রির আগমন ও দিনের গমন এবং আপনার প্রতি আহ্বানকারী মুআযযিনের ধ্বনির (আযানের) সময়। সুতরাং আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন। (মুসতাদরাকে হাকিম, ১ : ৩১৪)

৩৫. কাপড় পরিধান করার সময় পড়বে-

الحمد لله الذى كسانى هذا ورزقنيه من غير حول منى ولا قوة

অর্থ : আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও শোকর আদায় করছি যে, তিনি আমার কোনই শক্তি-সামর্থ না থাকা সত্ত্বেও আমাকে এ কাপড়ের ব্যবস্থা করেছেন ও পরিধান করিয়েছেন।

(আবু দাউদ, ২ : ৫৫৮/ ইবনুস সুন্নী, ২৩৯/ মুসনাদে দারেমী, ৯ : ৫১৫)

৩৬. নতুন কাপড় পরিধান করার দু'আ-

الحمد لله الذى كسانى ما اوارى به عورتى واتجمل به فى حياتى

অর্থ : আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও শোকর আদায় করছি যে,

তিনি আমাকে লজ্জাস্থান ঢাকার জন্য এবং জীবনকে সৌন্দর্যময় করার জন্য কাপড় দান করেছেন। (মুসতাদরাকে হাকিম, ৪ : ১৯২/ মুসনাদে আহমাদ, ১ : ৪৪)

৩৭. আয়না দেখার দু'আ-

الحمد لله اللهم كما حسنت خلقى فحسن خلقى

অর্থ : সকল প্রশংসা আল্লাহর, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যেরূপ সুন্দর চেহারা দান করেছেন তদ্রূপ আমার স্বভাব-চরিত্রকেও সুন্দর করে দিন।

(ইবনুস সুন্নী, ১৩৮)

৩৮. মজলিসের কাফ্ফারার দু'আ-

سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

অর্থ : হে আল্লাহ! আমরা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং প্রশংসা ব্যক্ত করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই, আমি আপনার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি এবং আপনার দিকেই ধাবিত হচ্ছি।

(তিরমিযী, ২ : ১৮১/ আবু দাউদ, ২ : ৬৬৭)

৩৯. বাজারে যাওয়ার পর এ দু'আ পড়বে-

لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حى لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير

অর্থ : এক আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। সকল রাজত্ব তাঁরই এবং তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা। তিনিই জীবিত করেন এবং তিনিই মৃত্যু দেন এবং তিনি চিরঞ্জীব-অমর। তিনি কখনও মৃত্যুবরণ করেন না। তাঁর হাতেই সকল কল্যাণের চাবিকাঠি। তিনি সর্বশক্তিমান। (তিরমিযী, ২ : ১৮১/ ইবনুস সুন্নী, ১৫০)

৪০. কোন মুসলমানের সাথে সাক্ষাত হলে পড়বে-

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

অর্থ : আপনার উপর শান্তি ও আল্লাহ পাকের রহমত, বরকত বর্ষিত হোক।

(তিরমিযী, ২ : ৯৮)

সালামের উত্তর- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

অর্থ : এবং আপনার উপরও শান্তি ও আল্লাহ পাকের রহমত, বরকত বর্ষিত হোক। (সহীহ ইবনে হিব্বান ৩ : ১২৫)

৪১. মুসাফাহা করার দু‘আ- يغفر الله لنا ولكم

অর্থ : আল্লাহ তা‘আলা আমাদের এবং আপনাদেরকে ক্ষমা করুন।

(আবু দাউদ, ২ : ৭০৮)

৪২. কাউকে বিদায় দেয়ার সময় পড়বে-

استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك

অর্থ : তোমার দ্বীন-ঈমানকে এবং তোমার আমানতদারীকে এবং তোমার হোসনে খাতিমাকে (ঈমানের উপর মৃত্যু) আল্লাহ তা‘আলার হাতে সোপর্দ করছি। (আবু দাউদ, ১ : ৩৫০/ মুসতাদরাকে হাকীম, ২ : ৯৭)

৪৩. যানবাহনে আরোহনের দু‘আ-

প্রথমে বিসমিল্লাহ বলে যানবাহনে আরোহণ করবে। অতঃপর তিন বার الله اكبر বলে নিম্নোক্ত দু‘আপড়বে-

الحمد لله سبحان الذى سخرلنا هذا وما كنا له مقرنين و انا الى ربنا لمنقلبون- اللهم نسئلك فى سفرنا هذا الروا التقوى ومن العمل ما ترضى- اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوعنا بعده- اللهم انت الصاحب فى السفر والخليفة فى الاهل اللهم انى اعوذبك من وعثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلت فى المال والاهل-

অর্থ : সকল প্রকার প্রশংসা আল্লাহ তা‘আলার জন্য। পূতঃপবিত্র সেই সত্তা, যিনি এ যানবাহনকে আমাদের নিয়ন্ত্রণে করে দিয়েছেন,

অন্যথায় আমরা একে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হতাম না এবং নিশ্চয়ই আমরা (মৃত্যুর পরে) আমাদের প্রতিপালকের নিকটই প্রত্যাবর্তন করব। হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট এই সফরে নেকী এবং তাকওয়া চাচ্ছি এবং আপনার পছন্দনীয় আমলের তাওফীক কামনা করছি।

হে আল্লাহ! আমার জন্য এ সফর সহজসাধ্য করে দিন এবং এর দূরত্বকে কমিয়ে দিন। হে আল্লাহ! আপনিই সফরে আমাদের সাথী এবং বাড়ীতে আমাদের প্রতিনিধি-(রক্ষক)। হে আল্লাহ! আমি সফরে কষ্ট-ক্লেশ এবং (সফরের মধ্যে কোন প্রকার) মর্মান্তিক দৃশ্য দেখা হতে এবং পরিবার-পরিজন এবং ধন-সম্পদের নিকট দুঃখজনক প্রত্যাবর্তন হতে আপনার নিকট আশ্রয় কামনা করছি। (মুসলিম, ১ : ৪৩৪/ মুসলিম, ১ : ৪৩৪/ তিরমিযী, ২ : ১৮২)

৪৪. নদী পথে সফরের দু‘আ-

بسم الله مجريها ومرسها ان ربى لغفور رحيم

অর্থ : আল্লাহ তা‘আলার নামেই এর চলা ও অবস্থান করা। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল অতিশয় দয়ালু। (সূরা হুদ, আয়াত নং ৪১)

৪৫. সফর অবস্থায় কোন গ্রাম বা মহল্লায় প্রবেশকালের দু‘আ-

গ্রাম বা মহল্লায় প্রবেশকালে তিনবার اللهم بارك لنا فيه পড়বে। অতঃপর নিম্নোক্ত দু‘আপড়বে।

اللهم ارزقنا جناها وحببنا الى اهلها وحبب حالحى اهلها الينا

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমাদের জন্য এ বস্তির লাভ (কল্যাণ) দান করুন এবং এ বস্তিবাসীদের অন্তরে আমাদের প্রতি মহব্বত সৃষ্টি করে দিন এবং এ বস্তির নেককার অধিবাসীদের প্রতি আমাদের অন্তরে মহব্বত দান করুন।

(ত্ববরানী মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১০ : ১৯২/ হিসনে হাসীন,

১৬৬)

৪৬. সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের দু‘আ-

সফর থেকে ফিরার সময় নিজ এলাকার কাছে পৌঁছলে এ দু‘আপড়তে পড়তে এলাকায় প্রবেশ করবে- ائبون تائبون عابدون لربنا حامدون

অর্থ : আমরা এখন সফর হতে প্রত্যাবর্তন করছি (নিজেদের গুনাহ হতে), তওবা করতেছি, (আল্লাহ পাকের) ইবাদতের ইরাদা করতেছি এবং আমাদের প্রতিপালকের প্রশংসা করতেছি। (মুসনাদ আহমদ, ১ : ৪২৩)

৪৭. আকাশ মেঘাচ্ছন্ন দেখলে পড়বে-

اللهم انا نعوذبك من شرما ارسل به

অর্থ : হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট ঐ সকল অনিষ্ট হতে পানাহ চাচ্ছি, যাকে এ মেঘ বহন করে এনেছে। (মুসলিম, ১ : ৪৩৫)

৪৮. অতঃপর বৃষ্টি হওয়ার সময় পড়বে- اللهم صيبا نافعا

অর্থ : হে আল্লাহ! (এ বৃষ্টিকে) কল্যাণকর, বরকতপূর্ণ এবং উপকারী বানিয়ে দিন। (ইবনে মাজা, ২৭৭/ আবু দাউদ, ২ : ৩৩৯)

৪৯. বেশি বৃষ্টি হলে পড়বে- اللهم حوالينا ولا علينا

অর্থ : হে আল্লাহ! এ বৃষ্টি আমাদের আশপাশে (যেখানে প্রয়োজন) বর্ষণ করুন এবং আমাদের উপর বর্ষণ করবেন না।

(বুখারী, ১ : ১৪০/ মুসলিম ১ : ২৯৪)

৫০. মেঘের গর্জন শুনলে পড়বে-

اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعدابك وعافنا قبل ذلك

অর্থ : হে আল্লাহ! দয়া করে আপনি আমাদেরকে আপনার গযবের দ্বারা মৃত্যু দিবেন না এবং আপনার আযাব দ্বারা ধ্বংস করবেন না। বরং এর পূর্বেই আমাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তা দান করুন।

(মুসনাদে আহমাদ, ২ ১০১/ তিরমিযী, ২ : ১৮৩)

৫১. নতুন চাঁদ দেখলে পড়বে-

اللهم اهله علينا بالامن واليمان والسلامة والاسلام ربنى وربك الله

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি এ চন্দ্রকে বরকত ঈমান এবং শান্তি ও ইসলামের সাথে উদিত করুন, (এবং হে চাঁদ!) আমার ও তোমার প্রতিপালক এক আল্লাহ।

(তিরমিযী, ২ : ১৮৩/ মুসতাদরাকে হাকিম, ৪ : ২৮৫)

৫২. শবে ক্বদরে পড়ার দু‘আ-

اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنى

অর্থ : হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আপনি অতি ক্ষমাশীল, ক্ষমাকে পছন্দ করেন। সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। (তিরমিযী, ২ : ১৯১)

৫৩. কারো থেকে অত্যাচারের আশংকা হলে পড়বে-

اللهم انا نجعلك فى نحورهم ونعوذبك من شرورهم

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনাকে এদের মুকাবেলায় (নিজের) ঢাল বানিয়েছি এবং তাদের অনিষ্ট হতে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি।

(আবু দাউদ, ১ : ২১৫/ আস্ সুনানুল কুবরা নাসাঈ, ৬ : ১৫৪)

৫৪. জ্বর হলে এ দু‘আপড়বে-

بسم الله الكبير اعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار

অর্থ : মহান আল্লাহর নামের সাথে আমি মহান আল্লাহ তা‘আলার আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রত্যেক উত্তেজিত ধমনীয়র অনিষ্ট হতে এবং দোযখের উত্তাপের অনিষ্ট হতে। (তিরমিযী, ২ : ২৭/ মুসতাদরাকে হাকীম, ৪ : ৪১৪)

৫৫. অসুস্থ লোক দেখতে গেলে পড়বে- لابأس طهور ان شاء الله

অর্থ : ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই, (আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন)

ইন্‌শাআল্লাহ এ রোগ (বাহ্যিক ও অভ্যান্তরীণ অপবিত্রতা হতে) পবিত্রতা সাধনকারী।

(বুখারী, ২ : ৮৪৫)

এরপর সাতবার এ দু‘আটি পড়বে-

اسئل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك

অর্থ : আমি আরশে আযীমের মালিক মহান আল্লাহ তা‘আলার নিকট আপনার সুস্থতার জন্য দু‘আকরছি।

(আবু দাউদ, ২ : ৪৪২/ তিরমিযী, ২ : ২৮)

৫৬. নতুন ফল সামনে এলে পড়বে-

اللهم بارك لنا فى ثمرنا وبارك لنا فى مدينتنا وبارك لنا فى صاعنا وبارك لنا فى مدنا

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমাদের ফলের মধ্যে বরকত দান করুন এবং আমাদের শহরের মধ্যে বরকত দান করুন। আমাদের ‘সা’ (বড় পরিমাপ মাত্র) এর মধ্যে বরকত দান করুন এবং আমাদের ‘মুদ’ (ছোট পরিমাপ মাত্র) এর মধ্যে বরকত দান করুন। (মুসলিম, ১ : ৪৪২)

৫৭. ঋণ পরিশোধে ও পেরেশানী দূর হওয়ার জন্য পড়বে-

اللهم انى اعوذبك من الهم والحزن واعوذبك من العجز والكسل واعوذبك من الجبن والبخل واعوذبك من غلبة الدين وقهر الرجال

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট চিন্তা পেরেশানী থেকে পানাহ চাচ্ছি, আমি আপনার নিকট অক্ষমতা ও অলসতা থেকে পানাহ চাচ্ছি, আমি কাপুরুষতা ও কৃপণতা থেকে পানাহ চাচ্ছি, আমি আপনার নিকট ঋণের আধিক্য থেকে এবং মানুষের কটুক্তি ও জুলুম থেকে পানাহ চাচ্ছি।

(আবু দাউদ, ১ : ২১৬)

৫৮. ইফতারের সময় পড়বে- يا واسع المغفرة اغفرلى

অর্থ : হে মহান ক্ষমা দানকারী! আমাকে ক্ষমা করুন।

(শু‘আবুল ঈমান বাইহাকী, ৩ : ৪০৭)

৫৯. ইফতারের পর এ দু‘আ পড়বে-

اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার জন্য রোযা রেখেছি এবং আপনার রিযিক দ্বারাই ইফতার করছি।

(আল-ফুতুহাতুর রাব্বানিয়্যাহ, ৪ : ৩৩৯/ আবু দাউদ, ১ : ৩২২)

অতঃপর নিম্নের দু‘আটিও পড়বে-

ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجران شاء الله تعالى

অর্থ : পিপাসা দূরীভূত হয়েছে, ধমনীসমূহ সতেজ হয়েছে এবং ইনশাআল্লাহ (রোযার সওয়াব) নিশ্চিত হয়েছে। (আবু দাউদ, ১ : ৩২১)

৬০. কোন বিপদ দেখলে পড়বে- انا لله وانا اليه راجعون

অর্থ : নিশ্চয়ই আমরা সকলেই আল্লাহর জন্য। আর নিশ্চয়ই আমরা সকলেই আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করব। (সূরা বাক্বারাহ, ১৫৬)

৬১. দুলা ও দুলহানকে এভাবে দু‘আ দিবে-

بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما فى خير

অর্থ : আল্লাহ পাক তোমাকে বরকতপূর্ণ করুন এবং তোমার উপর বরকত অবতীর্ণ করুন এবং তোমাদের উভয়কে মঙ্গলময় সম্পর্ক দান করুন।

(আবু দাউদ, ১ : ২৯০/ তিরমিযী, ১ : ২০৭)

৬২. নতুন বিবির সাথে প্রথম সাক্ষাতের সময় তার কপালে হাত রেখে এ দু‘আ পড়বে-

اللهم انى اسئلك من خير ها وخيرما جبلتها عليه و اعوذ بك من شرها

وشرما جبلتها عليه

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এ বিবির কল্যাণ এবং যে কল্যাণের উপর তাকে সৃষ্টি করেছেন, তা প্রার্থনা করছি এবং বিবির অনিষ্টতা এবং যে অনিষ্টতার উপর তাকে সৃষ্টি করেছেন তা থেকে পানাহ চাচ্ছি।

(আবু দাউদ, ১ : ২৯৩/ আসসুনানুল কুবরা নাসাঈ ৬ : ৭৪)

৬৩. সহবাসের পূর্বে এ দু'আ পড়বে-

بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا

অর্থ : আল্লাহর নামের সাথে শুরু করছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে শয়তান হতে রক্ষা করুন এবং আপনি আমাদেরকে শয়তান হতে রক্ষা করুন এবং আপনি আমাদেরকে শয়তান হতে রক্ষা করুন এবং আপনি আমাদেরকে যে সন্তান দান করবেন তাকে শয়তান হতে রক্ষা করুন।

(বুখারী, ২ : ৭৭৬/ মুসলিম, ১ : ৪৬৩)

৬৪. বীর্যপাতের সময় (মনে মনে) এ দু'আ পড়বে-

اللهم لا تجعل للشيطان فى ما رزقتنا نصيبا

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে যে সন্তান দান করবেন তাতে শয়তানের কোন অংশ রাখবেন না।

(ইবনে আবী শাইবা, ৩ : ৪০২, সাহাবী থেকে বর্ণিত)

৬৫. ইস্তিখারার দু'আ, (দু'রাকা'আত নামায শেষে পড়বে)-

اللهم انى استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسئلك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب- اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خيرلى فى دينى ومعاشى وعاقبة امرى فاقدره لى ويسره لى وبارك لى فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر شرلى فى دينى ومعاشى وعاقبة امرى فاصرفه عنى واصرفنى عنه واقدرلى الخير كان ثم ارضنى به

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার ইলমে ওসীলায় আপনার নিকট মঙ্গল কামনা করছি এবং আপনার কুদরতের ওসীলায় আপনার

নিকট শক্তি কামনা করছি এবং আপনার নিকট আপনার মহান অনুগ্রহ কামনা করছি। কেননা, আপনি ক্ষমতাবান, আর আমি অক্ষম এবং আপনি সর্বজ্ঞানী আর আমি অজ্ঞ, এবং আপনি সমস্ত গোপন সম্পর্কে জ্ঞাত। হে আল্লাহ! যদি আপনার জ্ঞান অনুযায়ী এ কাজটি আমার জন্য আমার দ্বীন ও দুনিয়ার দিক দিয়ে এবং পরিণামে মঙ্গলজনক হয়, তবে তা আমার জন্য নির্ধারণ করে দিন এবং একে সহজ করে দিন। অতঃপর এর মধ্যে আমার জন্য বরকত দান করুন। আর যদি আপনার জ্ঞান অনুযায়ী এ কাজটি আমার দ্বীন ও দুনিয়ার দিক দিয়ে এবং পরিণামে আমার জন্য মঙ্গলজনক না হয়, তবে আপনি এ কাজটিকে আমার থেকে দূরে রাখুন এবং যেখানেই আমার জন্য মঙ্গল রয়েছে তা আমার জন্য নির্ধারিত করুন এবং তাতেই আমাকে সন্তুষ্ট করে দিন।

(বুখারী, ২ : ৯৪৪ আবু দাউদ, ১ : ২১৫)

উল্লেখ্য, هذا الامر বলার সময় মনে উদ্দেশ্যের প্রতি খেয়াল করবে।

৬৬. সালাতুল হাজত

আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাজত পেশ করার দু'আ(দু'রাকা'আত সালাতুল হাজত পড়ার পর নিম্নের দু'আটি পড়বে-

لا اله الا الله الحليم الكريم- سبحان الله رب العرش العظيم- الحمد لله رب العالمين اسئلك موجبات رحمتك وعزام مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بروالسلامة من كل اثم لا تدع لى ذنبا لا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هى لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين

অর্থ : এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ (উপাস্য) নেই, যিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল, অনুগ্রহকারী। আল্লাহ পবিত্র, যিনি মহান আরশের রব (মালিক)। সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনেরই জন্য। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি

আপনার রহমতের এমন উপায়-উকরণ, যা আপনার রহমতকে ওয়াজিব করে দিবে এবং এমন সব আমলের তাওফীক যা আপনার মাগফিরাতকে সুনিশ্চিত করে দিবে, আর গুনাহ হতে পবিত্রতা ও প্রত্যেক নেক কাজের সৌভাগ্য এবং নাফরমানী হতে নিরাপত্তা কামনা করছি। হে আল্লাহ! আপনি আমার কোন গুনাহ ক্ষমা ব্যতীত অবশিষ্ট রাখবেন না এবং কোন পেরেশানী দূর করা ব্যতীত রাখবেন না এবং আমার এমন কোন প্রয়োজন পূর্ণ করা ব্যতীত রাখবেন না, যা আপনার সন্তুষ্টি অনুযায়ী হবে। হে সকল দয়া প্রদর্শনকারীদের চেয়ে বড় দয়া প্রদর্শনকারী, সকল করুণার আধার!

(তিরমিযী, ১ : ১০৮/ মুসতাদরাকে হাকিম, ১ : ৩২০)

৬৭. জুমু'আর দিন আসরের নামাযের পর নিম্নের দরূদটি ৮০ বার পড়বে-

اللهم صل على محمدن النبى الامى وعلى اله وسلم تسليما

অর্থ : হে আল্লাহ! শান্তি বর্ষণ করুন আমাদের সরদার উম্মী নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গের উপর।

(ইবনে বাসকুওয়াল, আল কউলুল বাদী ২৮৪)

বি.দ্র. পায়ে ঝিঝি লাগলে বা কানে শো শো আওয়াজ হলে দরূদ শরীফ পড়বে।

৬৮. নামাযের পরও এভাবে দু'আ করা যায়-

ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفرلنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নফসের (আত্মার) উপর গুনাহ করে জুলুম-অত্যাচার করেছি, এখন আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন তাহলে আমরা সুনিশ্চিত ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে পড়ে যাবো। (সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন)। (সূরা আরাফ, আয়াত নং-২৩)

ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وفى الاخرة حسنة وقنا عذاب النار

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতেও আমাদেরকে কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন। (সূরা বাকারা, আয়াত নং-২০১)

৬৯. পিতা-মাতার জন্য এ দু'আ করবে-

رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি তাদেরকে (পিতা-মাতাকে) রহমত দান করুন, যেরূপ তাঁরা আমাকে ছোট অবস্থায় দয়ার সাথে লালন-পালন করেছেন।

(সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত নং-২৪)

৭০. নিজের বিবি-বাচ্চাদের জন্য এভাবে দু'আ করবে-

ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما

অর্থ : হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা দান করুন এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য আদর্শস্বরূপ করুন। (সূরা ফুরকান, ৭৪)

৭১. পিতা-মাতা ও সকল মুসলমানের জন্য এভাবে দু'আ করবে-

ربنا اغفرلى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب

অর্থ : হে আমাদের রব! আপনি আমাকে এবং আমার পিতা-মাতাকে এবং সকল মুসলমানকে বিচারের দিন (কিয়ামতের দিন) ক্ষমা করে দিন।

(সূরা ইবরাহীম, ৪১)

৭২. দু'আ শুরু করার নিয়ম- দু'আ ও মুনাজাত হামদ ও সালাতের মাধ্যমে শুরু করা সুন্নাত।

(নাসাঈ, ১ : ১৪৪/ মিশকাত, ৮৬/ শামী, ১ : ৫২০/ হিসনে

হাসীন)

যেমন এভাবেও শুরু করা যেতে পারে-

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين

অর্থ : সকল প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্য, যিনি সমগ্র জাহানের প্রতিপালক এবং দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সায়্যিদুল মুরসালীন প্রিয় নবীর (সা.) উপর।

৭৩. দু'আ শেষ করার নিয়ম- দু'আ-মুনাজাত হামদ, সালাত এবং আমীনের মাধ্যমে শেষ করা সুন্নাত।

(নাসাঈ, ১ : ১৪৪/ মিশকাত, ৮০-৮৬/ শামী, ১৫২০/ হিসনে হাসীন)।

যেমন এভাবে শেষ করা যেতে পারে-

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين -امين

অর্থ : নিষ্কলুষ সত্তা! তিনি সম্মানিত এবং পবিত্র ঐ সকল কথা থেকে যা কাফিররা বলে থাকে এবং নবীদের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক এবং সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার জন্য।

৭৪. যমযমের পানি পান করার দু'আ-

اللهم انى اسئلك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء

অর্থ : হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট উপকারী ইলম এবং হালাল প্রশস্ত রিযক এবং সর্বপ্রকার রোগের শিফা চাচ্ছি।

(মুসতাদরাকে হাকিম, ১ : ৪৭২)

৭৫. সাইয়্যিদুল ইসতিগফার (ফজর এবং মাগরিবের পর পড়বে)।

اللهم انت ربى لا اله الا انت خلقتنى و انا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذبك من شرما صنعت ابوءلك بنعمتك على وابوء بذنبى فاغفرلى فناه لا يغفر الذنوب لا انت

অর্থ : হে আল্লাহ! একমাত্র আপনিই আমার প্রতিপালক, আপনি

ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ (উপাস্য) নেই। আপনিই আমার স্রষ্টা এবং আমি আপনার বান্দা এবং আমি আপনার (সাথে কৃত) ওয়াদা ও অঙ্গীকারের উপর সাধ্যানুযায়ী অটল ও অবিচল আছি। আমি আমার সকল কৃতকর্মের অনিষ্ট হতে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং আমার উপর আপনার দানকৃত সকল নেয়ামতের স্বীকারোক্তি করছি এবং আমি আমার সকল গুনাহের স্বীকারোক্তি করছি। সুতরাং আপনি আমার গুনাহ ক্ষমা করুন। কেননা, আপনি ব্যতীত গুনাহ মাফ করার ক্ষমতা আর কারো নেই। (বুখারী শরীফ, ২ : ৯৩৩)

৭৬. মুমূর্ষু ব্যক্তির আশে-পাশের লোকেরা বারবার لا اله الا الله محمد رسول الله পড়বে। যাতে করে সেও পড়ে নেয়।

অর্থ : একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মাবূদ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার রাসূল।

(মুসলিম, ১ : ৩০০)

ইন্তেকালের পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত দু'আদু'টি বারবার পড়েছে।

اللهم اغفرلى وارحمنى والحقنى بالرفيق الاعلى

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমার উপর রহম ও দয়া বর্ষণ করুন এবং আমাকে রফীকে আ'লা (নবী ও সালেহগণ)-এর সাথে মিলিত করে দিন। (বুখারী, ২ : ৬৩৯/ মুসলিম, ২ : ২৮৬)

৭৭. রূহ বের হচ্ছে অনুভব হলে পড়বে-

اللهم اعنى غمرات الموت وسكرات الموت

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি মৃত্যুর কষ্ট ও মৃত্যুর যন্ত্রণায় আমাকে সাহায্য করুন। (তিরমিযী, ১ : ১৯২)

৭৮. কোন মুসলমানের মৃত্যু সংবাদ শুনলে পড়বে-

انا لله وانا اليه ارجعون اللهم اجرنى فى مصيبتى واخلف لى خيرا منها

অর্থ : নিশ্চয়ই আমরা সকলেই আল্লাহ তা'আলার জন্য এবং আমরা সকলেই আল্লাহ তা'আলার দিকেই প্রত্যাবর্তন করব। হে আল্লাহ! আমার এই বিপদে আপনি আমাকে প্রতিদান দান করুন এবং এর পরিবর্তে আমাকে এর থেকে উত্তর বদলা দান করুন। (মুসলিম, ১ : ৩০০)

৭৯. কারোর আপনজন মারা গেলে এ দু'আ দ্বারা সান্ত্বনা দিবে-

ان لله ما اخذ ولله ما اعطى وكل شئ عنده باجل مسمى فاصبر واحتسب

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ পাকেরই যা তিনি নিয়ে নিয়েছেন, আর যা প্রদান করেছেন তাও আল্লাহ পাকেরই এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রত্যেকের মৃত্যুকাল নির্ধারিত রয়েছে। সুতরাং তুমি ধৈর্যধারণ কর এবং সওয়াব-এর আশা কর। (বুখারী, ১ : ১৭১)

৮০. কবরস্থানে গিয়ে এভাবে সালাম করবে-

السلام عليكم يا اهل القبور يغفر الله لنا ولكم انتم سلفنا ونحن بالاثر

অর্থ : হে কবরবাসীগণ! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এবং তোমাদেরকে মাগফিরাত করে দিন। তোমরা আমাদের পূর্বে গমন করেছ, আমরাও তোমাদের পিছে পিছে আসছি।

(তিরমিযী, ১ : ২০২)

৮১. মুর্দাকে ডান কাতে রাখার সময় এ দু'আ পড়বে

بسم الله وعلى ملة رسول الله

অর্থ : আল্লাহ তা'আলার নামের সাথে এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিল্লাতের (সুন্নাতের) উপর (আমরা একে দাফন করছি)।

উল্লেখ্য, মুর্দাকে কবরে চিত করে শোয়ান সুন্নাতের পরিপন্থী। তাই সম্পূর্ণ ডান কাতে শোয়াতে হবে।

(মুসতাদরাকে হাকিম, ১ : ৩৬৫/ মুসনাদে আহমাদ, ২ : ২৭)

৮২. জানাযার নামাযে তৃতীয় তাকবীরের পর এ দু'আও পড়া যায়-

اللهم ان فلان فلان فى ذمتك وحبل جوارك فقه من عذاب القبر وعذاب النار وانت اهل الوفاء اللهم فاغفرله وارحمه انك انت الغفور الرحيم

অর্থ : হে আল্লাহ! অমুকের ছেলে অমুক (এখানে মৃত ব্যক্তি ও তার পিতার নাম উল্লেখ করবে) আপনার জিম্মায় (হিফাযতে) এবং আপনারই আশ্রয়ের ভরসায় রয়েছে। সুতরাং আপনি তাকে কবরের ফিতনা হতে এবং জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা করুন। আপনি ওয়াদা পূর্ণকারী। আয় আল্লাহ! আপনি তাকে মাফ করুন এবং তার উপর মেহেরবানী করুন, নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাকারী ও অত্যন্ত দয়ালু। (আবু দাউদ, ২ : ৪৫৬/ সহীহ ইবনে হিব্বান, ৭ : ৩৪৩)

দ্বিতীয় অধ্যায়

দরূদ ও সালাম

দরূদ শরীফ পড়ার নির্দেশ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

* 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর সালাত ও সালাম পাঠ কর।' (সূরা আহযাব, ৫৬)

* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসার্লাম ইরশাদ ' করেন– 'তোমরা আমার উপর দরূদ পড়। তোমরা যেখানেই থাক না কেন তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছানো হয়।' (আবু দাউদ, ১ : ২৭৯)

* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– 'যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ পড়া থেকে ভুলে থাকল, সে

বেহেশতের রাস্তা থেকে হটে গেল।' (ইবনে মাজাহ, পৃ. ৬৫/ শু'আবুল ঈমান বায়হাকী, ২ : ২১৬)

দরূদ শরীফ-এর ফযীলত

* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– 'ঐ ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে নিকটে থাকবে, যে আমার উপর বেশি বেশি দরূদ পাঠ করে।' (তিরমিযী, ১ : ১১০/ শু'আবুল ঈমান, ২ : ১২২)

* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– 'আল্লাহ তা'আলা বহু সংখ্যক ফেরেশতা এ কাজের জন্য নিয়োজিত রেখেছেন যে, তারা যমীনে বিচরণ করতে থাকবে এবং আমার উম্মতের যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ ও সালাম পাঠাবে তা আমার নিকট পৌঁছে দিবে।'

(নাসাঈ, ১ : ১৪৩/ শু'আবুল ঈমান বায়হাকী, ২ : ১১৮)

* হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে যে, ফেরেশতাগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে তার নাম উল্লেখ করে দরূদ পেশ করে থাকে। (শু'আবুল ঈমান বায়হাকী, ২ : ২১৮)

* নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- যে ব্যক্তি সকালে আমার উপর দশবার দরূদ পড়বে এবং সন্ধ্যায় দশবার দরূদ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব। (ত্ববারানী, মাজাউয যাওয়ায়িদ, ১ : ১২০)

* উবাইদুল্লাহ বিন উমর কাওয়ারী (রহ.) বর্ণনা করেন, আমার প্রতিবেশী একজন কাতিব ছিলেন। তার ইনতিকালের পর স্বপ্নে তার সাথে আমার সাক্ষাত হল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহ তা'আলা আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? তিনি উত্তর দিলেন-

আমাকে মাফ করে দিয়েছেন। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তরে বললেন-কিতাব লেখার সময় যখনই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম মুবারক আসত, তখনই হুযূরের নামের সাথে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লেখা আমার অভ্যাস ছিল। এর বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা আমাকে এমন নিয়ামত দান করেছেন, যা কোন চক্ষু কখনো দেখে নাই, কোন কান কখনো শুনে নাই, কোন অন্তর কখনো তার কল্পনাও করে নাই।

হাদীসের কিতাব থেকে
১০টি দরূদ শরীফ

(১) اللهم صلى على محمد كما صليت على ال ابراهيم اللهم بارك على محمد كما باركت على ال ابراهيم

(নাসায়ী ৩য়, হাদীস নং ১২৮৬)

(২) اللهم صلى على محمد وعلى ال محمد

(নাসাঈ শরীফ, ১ : ১৪৫)

(৩) اللهم صلى على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وباركعلى محمد وازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد

(আবু দাউদ, হাদীস নং ৯৭৯)

(৪) اللهم صل على محمدن النبى الامى وعلى ال محمد

(আবু দাউদ, ১৪১/ মুসনাদে আহমাদ, ৫ : ৭৯)

(৫) اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة

৫ নং এ বর্ণিত দরূদের ফযীলতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– ‘যে ব্যক্তি উক্ত দরূদ পড়ার অভ্যাস করবে তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার শাফা‘আত ওয়াজিব হবে। ’ (মুসনাদে আহমাদ, ৪ : ১০৮)

(৬) اللهم صل على محمدن النبى الامى وعلى اله وسلم تسليما

৬নং এ বর্ণিত দরূদ এর ফযীলতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– ‘যে ব্যক্তি জুমু‘আর দিন আসরের নামাযের পর নিজের স্থানে বসে উক্ত দরূদ আশিবার পড়বে, তার আশি বছরের গুনাহ মাফ হবে এবং তার আমলনামায় আশি বছরের ইবাদত-বন্দেগীর সওয়াব লেখা হবে। ’

(ইবনু বাশকুওয়াল/ আল কাউলুল বাদী-২৮৪)

اللهم صلى على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم-

(আবু দাউদ, হাদীস নং ৯৭২)

(৮) اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات

(সহী ইবনে হিব্বান, ৩ : ১৮৫)

(৯) اللهم صل على محمدن النبى وازواجه امهات المؤمنين وزريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد

(আবু দাউদ, ১ : ১৪১/ ইবনে বাসকুয়াল/ আল কাওলুল বাদী, পৃ. ২৮৪)

(১০) اللهم صل على محمد على ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد

(বুখারী, ২ : ৯৪০/ নাসাঈ ১ : ১৪৪)

এ সমস্ত দরূদ ও সালাম প্রতিদিন ১০ বার করে পড়তে চেষ্টা করবে। যাতে প্রতিদিন ১০০ বার দরূদ শরীফ পড়া হয়ে যায়। অথবা কমপক্ষে সকাল-সন্ধ্যায় দু’বার পড়বে যাতে করে নবী আলাইহিস সালাম এর সুপারিশ লাভ হয়।

দরূদ শরীপ পাঠ করার পর (ব্যাপক অর্থপূর্ণ) নিম্নের দু‘আটিও পাঠ করবে।

اللهم انى اسئلك من الخير كله عادله واجله ما علمت منه وما لم اعلم- واعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمت منه ومالم اعلم واسئلك الجنة وما قرب اليها من قول او عمل واعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل واسئلك مما سألك به محمد (صلى الله عليه وسلم) واعوذ بك مما تعوذ منه محمد (صلى الله عليه وسلم) وما قضيت لى من قضاء فاجعل عاقبته رشدا

এ ‘জামি’, দু‘আর ব্যাপারে হযরত আয়িশা (রাযি.) বর্ণনা করেন- একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে আমাকে কোন কাজে খোঁজ করছিলেন। আমি তখন নামায ও দু‘আর মধ্যে

মশগুল ছিলাম- যে কারণে খেদমতে হাজির হতে দেরী হল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, হে আয়িশা! আল্লাহর দরবারে জামি (পরিপূর্ণ) দু'আ পেশ কর। আমি আরয করলাম, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ' জামি' দু'আ কোনটি? তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণিত দু'আটি আমাকে তা'লীম দিলেন।

(আল-আদাবুল মুফরাদ, পৃ. ২২২, হাদীস নং ৬৩৯)

দরূদ সম্পর্কিত মাসায়িল

* কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের কারণে সারা জীবনে কমপক্ষে এক বার দরূদ পাঠ করা ফরয। (দুররে মুখতার, ১ : ৫১৪-৫১৮)

* যদি একই মজলিসে কয়েকবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম আলোচিত হয়, তাহলে প্রথমবার সকলের উপর দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব। পরবর্তী প্রত্যেকবার দরূদ পাঠ করা নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী সকলের জন্য মুস্তাহাব। অবশ্য ইমাম ত্বহাবী (রহ.) পরবর্তীতে প্রত্যেকবার দরূদ পাঠকে প্রত্যেকের জন্য ওয়াজিব বলেছেনী। (দুররে মুখতার, ১ : ৫১৬)

উল্লেখ্য, কেউ যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম মুবারক একই মজলিসে বারবার লিখেন, তাহলে তার জন্য হুকুমও অনুরূপ অর্থাত প্রথমবার দরূদ লেখা ওয়াজিব এবং পরবর্তীবার মুস্তাহাব।

(দুররে মুখতার, ১ : ৫১৬)

স্মর্তব্য, হযরত মুহাদ্দিসীনে কিরাম হাদীসের কিতাবে সবচেয়ে বেশি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম মুবারক লিখেছেন, কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকবার দরূদ লিখতে কার্পণ্য করেন নাই। আল্লাহ তা'আলা সকলকে তাওফীক দান করুন। (দুররে মুখতার, ১ : ৫১৬)

* বিনা উযুতে, এমনকি হাটতে হাটতেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরূদ শরীফ পড়া যায়। জুমু'আ বা ঈদের খুতবার মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম মুবারক আসলে অন্তরে দরূদ পড়বে কিন্তু মুখে উচ্চারণ করবে না।

* দুররে মুখতার কিতাবে আছে, যেটা দরূদ পড়ার কোন স্থান নয়, বরং দুনিয়াবী কোন উদ্দেশ্য সামনে আছে, এমন স্থানে দরূদ

পড়ার রসম বানানো বা দরুদ পড়ার জন্য লোকদের দাওয়াত দেয়া সম্পূর্ণ নিষেধ। যেমন, নতুন দোকান খোলার সময় বা নতুন বাড়ী করার পর ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে দু'রাক'আত সালাতুস শোকর পড়ে নেয়া যথেষ্ট। উল্লেখ্য দরুদ পড়ার স্থানের বর্ণনা সামনে আসছে।

(দুররে মুখতার, ১ : ৫১৮/ আল আশবাহ ওয়ান্নাযাযির, ৫৩)

* দুররে মুখতার কিতাবে আরো উল্লেখ আছে, দরুদ শরীফ পড়ার নিয়ম হল, দিলে মুহাব্বতের সাথে ধীরস্থিরভাবে হালকা আওয়াজে চুপে চুপে পড়বে। দরুদ পড়ার সময় ঢুলতে থাকা বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হেলাতে থাকা এবং উঁচু আওয়াজ করা নিষেধ। (দুররে মুখতার, ১ : ৫১৯) এর দ্বারা বুঝা যায় বিভিন্ন স্থানে দোকান-পাট বা বাড়ী-ঘর উদ্বোধন করার সময় বা নামাযের পরে সকলে মিলে উচ্চৈঃস্বরে দরুদ পড়ার প্রথা চালু আছে, তা বর্জনীয়। কারণ, এগুলো দরুদ পাঠের স্থান নয় এবং এভাবে দরুদ পাঠের অনুমতিও নেই।

দুঃখজনক কথা হল, প্রথাগত যে দরুদ পড়া হয়, তার অধিকাংশই মনগড়া দরুদ, কোন হাদীসে তা প্রমাণিত নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.)-এর আমল দ্বারা সেসব দরুদের শব্দগুলোর কোন প্রমাণ নেই। আরবী ব্যাকরণ অনুসারে সেসব দরুদের বাক্যগুলিও সহীহ নয় এবং তার অর্থের মধ্যেও মারাত্মক ধরনের ভুল রয়েছে। যেমন, ইয়া নবী সালামু আলাইকা, ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাধারণ লোকদের সম্বোধন করার ন্যায় এভাবে সম্বোধন করা চরম বেআদবী। (তাফসীরে কুরতুবী, ১২ : ৩২২)

সুতরাং এ ধরনের বানোয়াট ভুল দরুদ পরিত্যাগ করা কর্তব্য। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে দরুদ পড়তে বাধ্য করা হয়। অথচ নামাযের মধ্যে সকলেই বসা অবস্থায় দরুদ পড়ে থাকে। সুতরাং বসে দরুদ পড়াই উত্তম। আরো মারাত্মক কথা হলো, অনেকে বিশ্বাস করে

থাকে যে, তাদের মাহফিলে স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সশরীরে হাজির হয়ে থাকেন। এ জন্য তারা একটা চেয়ার খালি রাখে। তাদের এ বিশ্বাসের পক্ষে কুরআন-হাদীসে কোন দলীল-প্রমাণ নাই। বরং হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, উম্মতের দরুদসমূহ পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে পড়া হোক, তা ফেরেশতাদের মারফতে ঐ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে পেশ করা হয়। (মিশকাত শরীফ, ৮৭)

ফাতওয়ার বিভিন্ন কিতাবে তাদের এ ভ্রান্ত আকীদাকে কুফুরী আকীদা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

(সূরা আনআম, ৫৯/ সূরা নামাল, ৬৫/ মিশকাত, ৪৮/ ফাতাওয়া কাজীখান, ১ : ৩৩/ ফাতাওয়া বাযযাযিয়া ৩ : ৩২৬. আহসানুল ফাতাওয়া, ১ : ৩৪৮)

হ্যাঁ, মদীনা শরীফে গিয়ে রওজা মুবারক সামনে রেখে আসসালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইয়া হাবীবাল্লাহ, ইয়া নবীয়াল্লাহ বলে সম্বোধন করাতে কোন অসুবিধা নাই। সুতরাং সকল মুসলমানের নিজের ঈমানের হেফাজত এবং আখিরাতের নাজাতের লক্ষ্যে সকল প্রকার জেদাজেদি ছেড়ে দিয়ে, সমস্ত কুফুরী আকীদা ত্যাগ করে সহীহ আকীদা পোষণ করা এবং ঈমানকে সহীহ ও মজবুত করার ফিকির করা এবং এর জন্য আল্লাহর রাস্তায় সময় ব্যয় করা নেহায়েত জরুরী ও অপরিহার্য কর্তব্য।

দু'টি মাসআলা

১। যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম মুবারক লিখবে, তখন পূর্ণ দরুদ শরীফ লিখবে। সংক্ষেপ করার জন্য (দ.) বা (স.) এ ধরনের সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করে লিখবে না, এটা আদবের খেলাপ। তেমনিভাবে মুখে বলার সময় খুব ধীরে সুস্থে

বলবে। তাড়াহুড়া করে অস্পষ্টভাবে দরূদ পড়া মহব্বতের সল্পতার আলামত। এ দিকে খুব লক্ষ্য রাখবে।

২। ফুকাহায়ে কিরাম লিখেছেন, যে কোন দরূদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম মুবারকের শুরুতে سيدنا (সাইয়িদিনা) শব্দ বৃদ্ধি করা মুস্তাহাব। (দুররে মুখতার, ১ : ৫১৩)

দরূদ পড়ার স্থানসমূহ

* যখনই হযরত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম মুবারক মুখে উচ্চারিত হয় বা কানে আসে তখনই দরূদ শরীফ পড়া কর্তব্য।

(দুররে মুখতার, ১ : ৫১৬)

* যখনই কোন মজলিস থেকে উঠবে তখন প্রথমে দরূদ শরীফ পড়বে তার পর উঠবে। (আল-কাউলুল বাদী পৃ. ৩৪৮)

* দু'আ করার পূর্বে ও পরে দরূদ শরীফ পড়বে।

(আল-কাউলুল বাদী পৃ. ৩১৮-৩২৩)

* মসজিদে প্রবেশকালে এবং বের হওয়ার সময় দরূদ শরীফ পড়বে।

(আল-কাউলুল বাদী পৃ. ২৬৬)

* আজানের পর দু'আ পড়ার পূর্বে দরূদ শরীফ পড়বে।

(আল-কাউলুল বাদী পৃ. ২৭)

* উযুর শেষে দরূদ শরীফ পড়বে। (আল- কাউলুল বাদী পৃ. ২৪৯)

* নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওজা মুবারক যিয়ারতের সময় দরূদ শরীফ পড়বে। উক্ত দরূদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে শুনেন। (আল- কাউলুল বাদী পৃ. ৩০৩-৩০৭)

* কোন কিতাব-রাসায়েল, চিঠি-পত্র লেখার শুরুতে দরূদ শরীফ লিখবে।

(আল-কাউলুল বাদী পৃ. ৩১৪)

* রাতে তাহাজ্জুদের জন্য যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হবে তখন দরূদ শরীফ পড়বে। (আল-কাউলুল বাদী পৃ. ২৬৪)

* বিপদ-আপদ, বালা-মুসীবত, ভূমিকম্প ইত্যাদির অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দরূদ শরীফ পড়বে। (আল-কাউলুল বাদী পৃ. ৩১৫, ১৭৪-১৭৫)

দু'টি কথা

হামদ ও সালাত-সালামের পর মহান আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ করে মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার উভয় জগতে কল্যাণের জন্য নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসার্লামকে নমুনা হিসাবে পাঠিয়েছেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করলে মুসলমানদের সকল কাজ আল্লাহ তা'আলার বন্দেগীতে পরিণত হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতসমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত ছিল প্রত্যেক নতুন হালাত ও অবস্থায় আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করা এবং তাঁর প্রত্যেক নি'আমতের শোকর আদায় করা। যেগুলোকে মাসনূন দু'আ বলা হয়। হাদীসের কিতাবে ঐসকল মাসনূন দু'আ সমূহ বর্ণিত আছে। তবে সাধারণ লোকদের জন্য হাদীসের কিতাব থেকে মাসনূন দু'আ বের করে আমল করা বড়ই কষ্টসাধ্য ব্যাপার, এতে কোন সন্দেহ নেই।

তাই দীর্ঘদিন যাবত আমার অন্তরে একান্ত ইচ্ছা ছিল, দৈনন্দিন জীবনের সর্বাধিক প্রয়োজনীয় মাসনূন দু'আ এবং কিছু সহীহ দরূদ শরীফ প্রমাণসহ রেসালা আকারে মুসলমান ভাইদের খেদমতে পেশ

করা।

আল্লাহ পাকের অশেষ শোকর, তিনি আমার দীর্ঘদিনের আশাকে পূর্ণ করেছেন- আলহামদুলিল্লাহ।

এ মুহূর্তে যার কথা স্মরণ না করে পারছি না তিনি হলেন মুহতারাম মাওলানা আব্দুল মালিক সাহেব, তিনি দু'আ/ দুরূদসমূহের হাওয়ালাসহ বের করার কাজে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইলম ও আমলে বরকত দান করুন।

মহান আল্লাহ তা'আলা যেন এ অধমকে এবং এর প্রকাশক ও এর জন্য যারা মূল্যবান শ্রম দিয়েছেন তাদের সকলকে দ্বীনের উপর কায়েম রাখেন এবং রেসালাটি তাঁর খাছ অনুগ্রহে মুসলিম মিল্লাতের জন্য উপকারী করে দেন। আমীন।

সমাপ্ত

৩

নামায শিক্ষা ও ইমামদের দায়িত্ব-কর্তব্য

বিসমিহী তা'আলা

প্রথম অধ্যায়

নামায শিক্ষা

অবতরণিকা

নূরানী প্রশিক্ষণ কোর্সভুক্তি ইস্তিঞ্জা, উযু, গোসল, তায়াম্মুম ও নামাযের জরুরী মাসায়িল শুরুতে সংযোজন করা হল :

বসার আদব তিন প্রকার

১। দুই হাঁটু ফেলিয়ে নামাযের সময়।
২। এক হাঁটু উঠিয়ে লেখার সময়।
৩। দুই হাঁটু উঠিয়ে কাওয়ার সময়।
(এই তিন প্রকার বসা সুন্নাত)

ইস্তিঞ্জার আদব

৫ দিকে ফিরে ইস্তিঞ্জা করা নিষেধ

১। কিবলার দিকে মুখ করে।
২। কিবলার দিকে পিঠ করে।
৩। চন্দ্র ও সূর্যের দিকে মুখ করে।
৪। প্রবল বাতাসের দিকে মুখ করে।

১০ জায়গায় ইস্তিঞ্জা করা নিষেধ

১। মানুষ চলাচলের রাস্তায়।
২। ছায়াদার বা ফলদার গাছের নীচে।

৩। উযু-গোসলের স্থানে।
৪। গর্তের ভিতরে, গোরস্তানে।
৫। দাঁড়িয়ে বা হেঁটে হেঁটে
৬। বিনা উযরে পানিতে।
৭। ঘরে বা বিছানায়।
৮। মসজিদের আঙ্গনায় বা ঈদগাহে।
৯। নীচু জায়গায় বসে উঁচু জায়গায়।
১০। জনসম্মুখে।

৬ জিনিস নিয়ে ইস্তিঞ্জায় যাওয়া নিষেধ

১। আল্লাহ তা'আলার নাম।
২। নবীগণের নাম।
৩। ফেরেশতাগণের নাম।
৪। কুরআনের আয়াত।
৫। হাদীসের টুকরা।
৬। দু'আ কালাম।
(লিখিত বা অংকিত)

ইস্তিঞ্জার সময় ৮ কাজ করা নিষেধ

১। কথা বলা,
২। যিকির করা,
৩। কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা,
৪। সালাম দেওয়া,
৫। সালামের উত্তর দেওয়া,
৬। খাওয়া ও পান করা,
৭। মিসওয়াক করা,

৮। লেখা পড়া।

১০ জিনিস দ্বারা কুলুখ লওয়া নিষেধ

১। হাড্ডি,
২। কয়লা,
৩। কাগজ,
৪। কাঁচ,
৫। গাছের কাঁচা পাতা,
৬। খাদ্যদ্রব্য,
৭। শুকনো গোবর,
৮। জমজমের পানি,
৯। ডান হাত দ্বারা,
১০। ব্যবহৃত ঢিলা দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা।

ইস্তিঞ্জায় ৮ কাজ করা সুন্নাত

১। বাম পা দিয়ে প্রবেশ করা।
২। জুতা-সেন্ডেল পায়ে রাখা
৩। মাথা ঢেকে রাখা।
৪। দিলে দিলে ইস্তিগফার পড়া।
৫। ঢিলা কুলুখ ব্যবহার করা।
৬। পানি ব্যবহার করা।
৭। ডান পা দিয়ে বের হওয়া।
৮। প্রবেশের আগে ও পরে দু'আপড়া।

উযুতে ৪ ফরয

১। সম্পূর্ণ মুখ ধোয়া।

২। উভয় হাত কনুইসহ ধোয়া।
৩। মাথার এক চতুর্থাংশ মাসাহ্ করা।
৪। উভয় পা টাখনুসহ ধোয়া।

উযু করার (সুন্নাত) তরীকা

১। উযুর নিয়ত করা।
২। বিসমিল্লাহ পড়া।
৩। উভয় হাত কব্জিসহ তিনবার ধোয়া।
৪। মিস্ওয়াক করা।
৫। তিনবার কুলি করা।
৬। তিনবার নাকে পানি দেয়া ও নাক ঝাড়া।
৭। সম্পূর্ণ মুখ তিনবার ধোয়া।
৮। ডান হাত কনুইসহ তিনবার ধোয়া।
৯। বাম হাত কনুইসহ তিনবার ধোয়া।
১০। উভয় হাতের আঙ্গুলগুলো খিলাল করা।
১১। সম্পূর্ণ মাথা একবার মাসাহ্ করা।
১২। উভয় কান একবার মাসাহ করা।
১৩। ঘাড় মাসাহ্ করা।
১৪। ডান পা টাখনুসহ তিনবার ধোয়া।
১৫। বাম পা টাখনুসহ তিনবার ধোয়া।
১৬। উভয় পায়ের আঙ্গুলগুলো তারতীবমত খিলাল করা।
১৭। উযুর শেষে উপরের দিকে তাকিয়ে কালিমায়ে শাহাদাত পড়া।

গোসলে **৩ ফরয**

১। ভালভাবে কুলি করা।

২। নাকের নরম জায়গা পর্যন্ত পানি পৌঁছান।

৩। সম্পূর্ণ শরীর ধৌত করা।

গোসলের তরীকা

১। ফরয গোসলের পূর্বে ইস্তিঞ্জা করা।

২। শুরুতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়া।

৩। উভয় হাত কব্জিসহ ধোয়া।

৪। শরীর বা কাপড়ে নাপাক লেগে থাকলে প্রথমে তা তিনবার ধুয়ে পবিত্র করা। নাপাকী না থাকলেও গুপ্তাঙ্গ ধৌত করা। এরপর উভয় হাত ভালভাবে ধুয়ে নেয়া।

৫। গোসলের পূর্বে উযু করা।

৬। মাথায় পানি ঢালা, তারপর ডান কাঁধে ও পরে বাম কাঁধে পানি ঢালা। অতঃপর সমস্ত শরীর তিনবার এমনভাবে পানি দ্বারা ধৌত করা যেন একটি পশমের গোড়াও শুষ্ক না থাকে। তবে নদী-পুকুর ইত্যাদিতে গোসল করলে কিছুক্ষণ ডুব দিয়ে থাকলেই তিনবার পানি ঢালার সুন্নাত আদায় হবে।

৭। সমস্ত শরীর ঘষে-মেজে ধৌত করা।

৮। মহিলাদের জন্য কানে-নাকে অলংকারাদি থাকলে, তার ছিদ্র ও আংটি, চুড়ি বা বয়লা ইত্যাদি নাড়া চাড়া দিয়ে পানি পৌঁছিয়ে দেয়া।

৯। শরীরের যে সমস্ত অঙ্গে সাধারণত পানি পৌঁছতে চায় না, যেমন : কান, আঙ্গুলের ফাঁক, কনুই, বগলের নীচ, চোখের কিনারা, চুলের গোড়া ইত্যাদি অঙ্গে খেয়াল করে পানি পৌঁছানো। (নখে নখপালিশ থাকলে, তা সম্পূর্ণ উঠানো ব্যতীত উযু গোসল হবে না।)

১০। গোসলের ভিজা কাপড় তিনবার ধুয়ে তিনবার নিংড়ানো।

তায়াম্মুমে ৩ ফরয

১। নিয়ত করা।

২। সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল একবার মাসাহ্ করা।

৩। উভয় হাত কুনইসহ একবার মাসাহ্ করা।

উযু ও তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণ ৭টি

১। পায়খানা বা পেশাবের রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হওয়া।

২। মুখ ভরে বমি হওয়া।

৩। শরীরের ক্ষতস্থান হতে রক্ত, পুঁজ বা পানি বের হয়ে গড়িয়ে পড়া।

৪। থুথুর সঙ্গে রক্তের ভাগ সমান বা বেশি হওয়া।

৫। চিত হয়ে, কাত হয়ে বা হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে যাওয়া।

৬। পাগল, মাতাল ও অচেতন হওয়া।

৭। নামাযে উচ্চৈঃস্বরে হাসা।

নামাযের ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাতসমূহের বর্ণনা

নামাযের বাইরে এবং ভিতরে ১৩ ফরয

নামাযের বাইরে ৭ ফরয

১। শরীর পাক।

২। কাপড় পাক।

৩। নামাযের জায়গা পাক।

৪। সতর ঢাকা।

৫। কিবলামুখী হওয়া।

৬। ওয়াক্ত মত নামায পড়া।

৭। নামাযের নিয়ত করা।

নামাযের ভিতরে ৬ ফরয

১। তাকবীরে তাহরীমা বলা।

২। দাঁড়িয়ে নামায পড়া।

৩। ক্বিরা‘আত পড়া।

৪। রুকু করা।

৫। দুই সিজদা করা।

৬। আখিরী বৈঠক করা।

নামাযের ওয়াজিব ১৪টি

১। সূরা ফাতিহা পুরা পড়া।

২। সূরা ফাতিহার সঙ্গে সূরা মিলানো।

৩। রুকু-সিজদায় দেরী করা।

৪। রুকু হতে সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

৫। দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা।

৬। প্রথমে বৈঠক করা।

৭। উভয় বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়া।

৮। ইমামের জন্য ক্বিরা‘আত আস্তে এবং জোরে পড়া।

৯। বিতরের নামাযে দু‘আয়ে কুনূত পড়া।

১০। দুই ঈদের নামাযে ছয়টি করে তাকবীর বলা।

১১। ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকা‘আতকে কিরাআতের জন্য নির্ধারিত করা।

১২। প্রত্যেক রাকা‘আতের ফরযগুলোর তারতীব ঠিক রাখা।

১৩। প্রত্যেক রাকা‘আতের ওয়াজিবগুলোর তারতীব ঠিক রাখা।

১৪। ‘সালাম’ বলে নামায শেষ করা।

পুরুষদের নামাযের ১০০ মাসায়িল

মাসায়িলে কিয়াম ২৭টি

দাঁড়ানোতে ৭ কাজ

১. পায়ের আঙ্গুলসমূহ কিবলার দিকে সোজাভাবে রাখা।

২. উভয় পায়ের মাঝখানে চার আঙ্গুল (উর্ধ্বে এক বিঘত) পরিমাণ ফাঁক রাখা।

৩. উভয় পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয় ও গোঁড়ালিদ্বয়ের মাঝে সমান দূরত্ব রাখা।

৪. তাকবীরে তাহরীমা শুরু করা পর্যন্ত হাত ছেড়ে রাখা। (হাত বেঁধে না রাখা)।

৫. সম্পূর্ণ সোজা হওয়া (এক পায়ে ভর দিয়ে বাঁকা হয়ে না দাঁড়ানো)।

৬. ঘাড় সোজা রাখা। চেহারা জমিনের দিকে না করা।

৭. সিজদার জায়গার দিকে নজর রাখা।

[বি.দ্র. ফরয নামাযের কিয়াম (দাঁড়িয়ে নামায পড়া) ফরয]

হাত উঠানোতে ৮ কাজ

১. তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত চাদরের ভিতরে থাকলে, বাইরে বের করা।

২. হাত উঠানোর সময় মাথা না ঝুঁকানো।

৩. হাত কান পর্যন্ত উঠানো (উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা

কানের লতি স্পর্শ করা)।

৪. হাতের আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিক ফাঁক রাখা।

৫. হাতের তালু সম্পূর্ণ কিবলামুখী করে রাখা, আঙ্গুলের মাথা বাঁকা না করা। বরং আকাশমুখী করে রাখা।

৬. তাকবীরে তাহরীমা বলার প্রাক্কালে উক্ত নামাযের খেয়াল (নিয়ত) মনে হাজির করা। [ফরয]

৭। তারপর তাকবীরে তাহরীমা শুরু করা। তাকবীরে তাহরীমা এক আলিফ থেকে বেশি না টানা।

৮. তাকবীরে তাহরীমা বলার পর সরাসরি হাত বাঁধা। (হাত বাঁধার আগে হাত ঝুলিয়ে না দেয়া)।

হাত বাঁধার ৪ কাজ

১. ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপর রাখা।

২. ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা বাম হাতের কব্জি ধরা।

৩. বাকি আঙ্গুলগুলো বাম হাতের উপর স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা।

৪. নাভির নীচে হাত বাঁধা।

উল্লেখ্য-তাকবীর বলা শেষ ও হাত বাঁধা একই সময় হবে।

হাত বাঁধার পর ৮ কাজ

১. ছানা পড়া

২. আ‘উজুবিল্লাহ পড়া।

৩. বিসমিল্লাহ পড়া।

(উল্লেখ্য যে, পরবর্তী রাক‘আতে ছানা ও আ‘উজুবিল্লাহ পড়তে হয় না)

৪. সূরা ফাতিহা পড়া [ওয়াজিব]।

৫. সূরা ফাতিহা পড়ার পর নীরবে আমীন বলা।

৬. সূরা মিলানো (ফযরের প্রথম দু’রাকা‘আতে এবং ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফলের সব ক’টি রাকা‘আতে) [ওয়াজিব]।

৭. সূরা মিলানোর পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়া।

৮. মাসনূন ক্বিরা‘আত পড়া।

[বি.দ্র. ফরযের প্রথম দু’রাকা‘আতে এবং ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফলের সবক’টি রাকা‘আতে কমপক্ষে বড় এক আয়াত অথবা ছোট তিন আয়াত পরিমাণ ক্বিরা‘আত (কুরআন শরীফ) পড়া [ফরয]।

মাসায়িলে রুকু‘ ১২টি
রুকু‘তে ৯টি কাজ

১. রুকু‘তে যাওয়ার সময় তাকবীর বলা।

২. উভয় হাত দ্বারা হাঁটু ধরা।

৩. হাতের আঙ্গুলসমূহ ফাঁক রাখা।

৪. উভয় হাত সম্পূর্ণ সোজা রাখা, কনুই বাঁকা না করা।

৫. মাথা, পিঠ ও কোমর এক সমান রাখা।

৬. পায়ের গোছা, হাঁটু ও উরু সোজা রাখা (হাঁটু বাঁকা না করা)।

৭. পায়ের দিকে নজর রাখা।

৮. রুকু‘তে কমপক্ষে তিনবার রুকু‘র তাসবীহ্ (সুবহানা রাব্বিয়াল আজীম) পড়া।

৯. রুকু‘ করা ফরয এবং রুকুতে কমপক্ষে এক তাসবীহ পরিমাণ দেরী করা ওয়াজিব।

রুকু‘ থেকে উঠায় ৩ কাজ

১. রুকু‘ থেকে উঠার সময় ‘সামি‘আল্লাহু লিমান হামিদাহ্’ বলা।

২. সোজা হয়ে (হাত ছেড়ে) দাঁড়ানো এবং দাঁড়ানোর পর এক তাসবীহ পরিমাণ বিলম্ব করা। [ওয়াজিব]

৩. দাঁড়িয়ে ‘রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ্’ বলা।

[বি.দ্র. একা নামাযী উভয়টা পড়বে, আর ইমাম শুধু ‘সামিআল্লাহু লিমান হামিদা’ বলবে এবং মুক্তাদী শুধু ‘রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ’ বলবে]।

মাসায়িলে সিজদা ৩৫টি

সিজদা অবস্থায় ২০ কাজ

১. সিজদায় যাওয়া অবস্থায় তাকবীর বলা।

উল্লেখ্য, কোন তাকবীরকে এক আলিফ থেকে লম্বা না করা।

২. হাঁটু মাটিতে লাগার আগ পর্যন্ত সিনা ও মাথা সোজা রাখা, বিলকুল না ঝুঁকানো।

৩. (প্রথমে) উভয় হাঁটু মাটিতে রাখা।

৪. (তারপর) হাঁটু থেকে এতটুকু দূরে হাত রাখা। যেন সিজদারত অবস্থায় উভয় রান সোজা থাকে। উল্লেখ্য, হাঁটু থেকে এক হাত পরিমাণ দূরে হাত রাখলে উরু সোজা থাকে।

৫. (তারপর) উভয় বৃদ্ধাঙ্গুল এর মাথা বরাবর নাক রাখা।

৬. (তারপর) কপাল রাখা।

৭. হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখা।

৮. আঙ্গুলের মাথাগুলো কিবলামুখী করে সোজাভাবে রাখা।

৯. দু‘হাতের মধ্যখানে চেহারা রাখা যায় এ পরিমাণ ফাঁক রাখা। হাত চেহারার সাথে মিলিয়ে রাখবে না।

১০. নাকের অগ্রভাগের দিকে নজর রাখা।

১১. পেট উরু থেকে পৃথক রাখা।

১২. কনুই মাটি ও রান থেকে পৃথক রাখা।

১৩. উভয় উরু সোজাভাবে খাড়া রাখা।

১৪. উভয় পায়ের পাতা খাড়া রাখা।

১৫. পায়ের আঙ্গুলের মাথাগুলো যথাসম্ভব কিবলার দিকে মুড়িয়ে রাখা।

১৬. পায়ের আঙ্গুল জমিন থেকে না উঠানো। [ওয়াজিব]।

১৭. দু’পায়ের মধ্যখানে দাঁড়ানো অবস্থার ন্যায় চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁক রাখা।

১৮. কমপক্ষে তিনবার সিজদার তাসবীহ্ (সুবহানা রাব্বিয়াল আ‘লা) পড়া।

১৯. সিজদা করা ফরয এবং সিজদায় কমপক্ষে এক তাসবীহ পরিমাণ দেরী করা ওয়াজিব।

যেন সিজদারত অবস্থায় উভয় রান সোজা থাকে।

সিজদা থেকে উঠার সময় ১৫ কাজ

১. সিজদা থেকে উঠা অবস্থায় তাকবীর বলা।

২. (প্রথমে) কপাল উঠানো।

৩. (তারপর) নাক উঠানো।

৪. (তারপর) উভয় হাত উঠানো।

৫. দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে স্থিরভাবে বসা। [ওয়াজিব]।

৬. বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা।

৭. ডান পা সোজাভাবে খাড়া রাখা।

৮. উভয় পায়ের আঙ্গুলসমূহ (সম্ভবমত) কিবলার দিকে মুড়িয়ে রাখা।

৯. উভয় হাত উরুর উপর (হাতের আঙ্গুলের মাথা) হাঁটু বরাবর রাখা ও হাতের আঙ্গুলসমূহ স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা।

১০. নজর দুই হাঁটুর মাঝের দিকে রাখা।

১১. বসা অবস্থায় দু'আ(আল্লাহুম্মাগফিরলী) পড়া।

১২. তাকবীর বলা অবস্থায় পূর্বের নিয়মে দ্বিতীয় সিজদা করা।

১৩. দ্বিতীয় সিজদার পর তাকবীর বলা অবস্থায় পরবর্তী রাক'আতের জন্য পায়ের অগ্রভাগে ভর করে দাঁড়ানো।

(দু'হাত দ্বারা জমিনের উপর ঠেক না লাগানো)

১৪. হাঁটুর উপর হাত রেখে দাঁড়ানো।

১৫. সিজদা হতে সিনা ও মাথা সোজা রেখে সরাসরি দাঁড়ানো।

উল্লেখ্য, সিজদা থেকে দাঁড়ানোর সময় রুকু করার মত অবস্থা সৃষ্টি করবে না।

মাসায়িলে কু'উদ (বৈঠক) ২০টি বসায় ১২ কাজ

১. বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা।

২. ডান পা সোজাভাবে খাড়া রাখা।

৩. উভয় পায়ের আঙ্গুলসমূহ (সম্ভবমত) কিবলার দিকে মুড়িয়ে রাখা।

৪. উভয় হাত রানের উপর (আঙ্গুলসমূহের মাথা) হাঁটু বরাবর রাখা।

৫. হাতের আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা।

৬. বসা অবস্থায় মাথা ও পিঠসোজা রেখে নজর দুই হাটুর মাঝের দিকে রাখা।

৭. 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়া। [ওয়াজিব]

৮. 'আশহাদু' বলার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথা এক সঙ্গে মিলিয়ে এবং অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলদ্বয় মুড়িয়ে রেখে হালকা

(গোল বৃত্ত আকারে) বাঁধা।

৯. 'লা ইলাহা' বলার সময় শাহাদাত আঙ্গুল সামান্য উঁচু করে ইশারা করা। অতঃপর 'ইল্লাল্লাহু' বলার সময় নামানো। তবে শাহাদত আঙ্গুলের মাথা হাঁটুর সাথে মিলাবে না।

১০. বৈঠক শেষ হওয়া পর্যন্ত হাত ঐরূপ হালকা বাঁধা অবস্থায় রাখা এবং শেষ বৈঠকে উভয় সালামের পরে খোলা।

১১. আখেরী বৈঠক (আত্তাহিয়্যাতুর পর) দরুদ শরীফ পড়া।

১২. অতঃপর দু'আয়ে মাসুরা পড়া।

[বি.দ্র. ১ম বৈঠক ওয়াজিব ও শেষ বৈঠক ফরয।]

সালাম ফিরানোর ৮ কাজ

১. একা নামায পড়লে উভয় সালামের সময় ফেরেশতাদেরকে সালাম করার নিয়ত করা এবং জামা'আতের সময় উভয় সালামে ইমাম, অন্যান্য মুসল্লী, ফেরেশতা ও নামাযী জ্বিনদের সালাম করার নিয়ত করা।

২. উভয় সালাম কিবলার দিক থেকে শুরু করা এবং উভয় সালামে 'আসসালামু' বলা পর্যন্ত চেহারা কিবলার দিকে রাখা।

৩. প্রথমে ডান দিকে, অতঃপর বাম দিকে সালাম ফিরানো।

৪. সালামের সময় ডানে-বামে শুধু চেহারা ফিরানো (সিনা না ফিরানো)।

৫. আলাইকুম বলার সময় নজর কাঁধের দিকে ফিরানো।

৬. দ্বিতীয় সালাম, প্রথম সালামের তুলনায় আস্তে বলা।

৭. মুক্তাদীগণের ইমামের 'আসসালামু' বলার পর সালাম ফিরানো।

৮. মাসবুকের জন্য ইমামের দ্বিতীয় সালাম শেষ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করা।

[বি.দ্র. মাসবুকের জন্য ইমামের দ্বিতীয় সালাম সম্পূর্ণ শেষ হওয়ার পর উঠা মুস্তাহাব।]

পুরো নামাযের ৬ মাসায়িল

১. নামাযের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অন্তরে নামাযের খেয়াল রাখা, আর সহজ পদ্ধতি হল সব কিছু খেয়াল করে পড়া। মুখস্তের জোরে না পড়া। (মন অন্য কোন দিকে চলে গেলে, স্মরণ হওয়া মাত্রই ফিরিয়ে আনা)

২. মাঝের তাকবীরগুলো পূর্ববর্তী রুকন থেকে আরম্ভ করে অপর রুকনে পৌঁছে শেষ করা। (কিন্তু তাকবীর এক আলিফ থেকে লম্বা করা যাবে না।) এর জন্য কোন মুহাক্কিক আলিম থেকে নামাযের বাস্তব প্রশিক্ষণ নেওয়া জরুরী।

৩. এক রুকন থেকে অন্য রুকনে যেতে বিলম্ব না করা।

৪. পঠিত সূরা/ দু‘আ সমূহের প্রতি অন্তরে খেয়াল করা।

৫. হাই আসলে যথাসম্ভব মুখ বন্ধ রাখতে চেষ্টা করা।

৬. হাঁচি আসলে তা যথাসম্ভব দমিয়ে রাখা।

এ পর্যন্ত ‘পুরুষদের নামাযের ১০০ মাসায়িল’ পূর্ণ হল।

মহিলাদের নামাযের ৯৯ মাসায়িল

মাসায়িলে কিয়াম ২৭টি

দাঁড়ানোতে ৭ কাজ

১. পায়ের আঙ্গুলসমূহ কিবলার দিকে সোজাভাবে রাখা।

২. উভয় পায়ের মাঝখানে অনূর্ধ চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁক রাখা।

৩. উভয় পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলদ্বয় ও গোঁড়ালীদ্বয়ের মাঝে সমান দূরত্ব রাখা।

৪. তাকবীরে তাহরীমার পূর্বে হাত ছেড়ে দাঁড়ানো। (হাত বেঁধে না রাখা)।

৫. সম্পূর্ণ সোজা হওয়া (এক পায়ে ভর দিয়ে বাঁকা হয়ে না দাঁড়ানো)।

৬. ঘাড় সোজা রাখা। চেহারা জমিনের দিকে না করা।

৭. সিজদার জায়গার দিকে নজর রাখা।

[বি.দ্র. ফরয নামাযের কিয়াম (দাঁড়িয়ে নামায পড়া পুরুষ-মহিলা সকলের জন্যই ফরয।]

হাত উঠানোতে ৮ কাজ

১. হাত কাপড়ের ভিতর রেখে উঠানো। (বাইরে বের না করা) হাত উঠানোর সময় জমিনের দিকে মাথা না ঝুকানো।

২. হাত উঠানোর সময় (যথাসম্ভব) হাত শরীরের সাথে লাগিয়ে রাখা।

৩. তাকবীরে তাহরিমার সময় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠানো।

৪. হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখা।

৫. হাতের তালু সম্পূর্ণ কিবলামুখী করে রাখা।

৬. তাকবীরে তাহরীমা বলার প্রাক্কালে উক্ত নামাযের খেয়াল (নিয়ত) মনে হাজির করা। [ফরয]

৭। হাত উঠানোর পর তাকবীরে তাহরীমা শুরু করা।

তাকবীর- এর মাদ এক আলিফ থেকে বেশী না টানা।

৮. তাকবীরে তাহরীমা বলার পর সরাসরি বুকের উপর হাত রাখা। (হাত বাঁধার আগে হাত ঝুলিয়ে না দেয়া)।

হাত বাঁধার ৪ কাজ

১. ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপর রাখা।

২. সিনার উপর হাত রাখা।

৩. হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখা।

৪. উভয় বাজু বগলের সাথে মিলিয়ে রাখা।

হাত বাঁধার পর ৮ কাজ

১. ছানা পড়া

২. আ‘উজুবিল্লাহ পড়া।

৩. বিসমিল্লাহ পড়া।

৪. সূরা ফাতিহা পড়া [ওয়াজিব]।

৫. সূরা ফাতিহা পড়ার পর নীরবে আমীন বলা।

৬. সূরা মিলানো (ফজরের প্রথম দু’রাকা‘আতে এবং ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফলের সব ক’টি রাকা‘আতে) [ওয়াজিব]।

৭. সূরা এর শুরু থেকে মিলালে প্রথমে বিসমিল্লাহ পড়া।

৮. মাসনূন ক্বিরা‘আত পড়া।

[বি.দ্র. পরবর্তী রাকা‘আতগুলোতে তাকবীরে তাহরীমার মত হাত উঠানো, ছানা, আউ‘যুবিল্লাহ নেই।]

মাসায়িলে রুকু‘ ১২টি

রুকু‘ অবস্থায় ১০ কাজ

১. রুকু‘তে যাওয়া অবস্থায় তাকবীর বলা।

২. উভয় পায়ের গোড়ালীদ্বয় মিলিয়ে রাখা।

৩. রুকুতে পূর্ণ বাঁকা না হয়ে মধ্যম ধরনের ঝুঁকা।

৪. চাদরের ভিতর দিয়ে হাতের আঙ্গুল হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া।

৫. হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখা।

৬. হাঁটুদ্বয় একটু বাঁকিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে রাখা।

৭. সম্পূর্ণ হাত শরীরের সাথে মিলিয়ে রাখা।

৮. পায়ের দিকে নজর রাখা।

৯. রুকু‘তে কমপক্ষে তিনবার রুকু‘র তাসবীহ্ (সুবহানা রাব্বিয়াল ‘আজীম) পড়া।

১০. রুকু‘ করা ফরয এবং রুকুতে কমপক্ষে এক তাসবীহ পরিমাণ দেরী করা ওয়াজিব।

রুকু থেকে উঠায় ৩ কাজ

১. রুকু‘ থেকে উঠার সময় ‘সামি‘আল্লাহু লিমান হামিদাহ্’ বলা।

২. সোজা হয়ে (হাত ছেড়ে) স্থিরভাবে দাঁড়ানো। [ওয়াজিব]

৩. দাঁড়িয়ে ‘রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ্’ বলা।

মাসায়িলে সিজদা ৩৪টি

সিজদা অবস্থায় ১৯ কাজ

১. সিজদায় যাওয়া অবস্থায় তাকবীর বলা।

২. হাঁটু মাটিতে লাগার আগ পর্যন্ত সিনা ও মাথা সোজা রাখা অবস্থায় সিজদায় যাওয়া।

৩. (প্রথমে) উভয় হাঁটু মাটিতে রাখা।

৪. (তারপর) নিতম্ব রাখা।

৫. উভয় পা ডান দিক দিয়ে বের করে বিছিয়ে রাখা।

৬. পায়ের আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী করে রাখা।

৭. তারপর আঙ্গুল মিলিয়ে হাঁটুর কাছে মাথা রাখা।

৮. আঙ্গুলের মাথাগুলো কিবলামুখী করে সোজাভাবে রাখা।

৯. দু‘হাতের মধ্যখানে চেহারা রাখা যায় এ পরিমাণ ফাঁক রাখা।

১০. (তারপর) বৃদ্ধাঙ্গুলের মাথা বরাবর হাঁটুর সামনে রাখা।

১১. নাকের অগ্রভাগের দিকে অর্থাত জমিনের দিকে নজর রাখা।

১২. (তারপর) কপাল রাখা।

১১. পেট উরু থেকে পৃথক রাখা।

১২. কনুই মাটি ও রান থেকে পৃথক রাখা।

১৩. পেট উরুর সঙ্গে মিলিয়ে রাখা।

১৪. কনুই মাটিতে লাগিয়ে রাখা।

১৫. বাহু শরীরের সঙ্গে মিলিয়ে রাখা।

১৬. অত্যন্ত জড়সড় হয়ে সিজদা করা।

১৭. আঙ্গুলসমূহ পরস্পরে মিলিয়ে রাখা।

১৮. কমপক্ষে তিনবার সিজদার তাসবীহ্ (সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা) পড়া।

১৯. সিজদা করা ফরয এবং সিজদায় কমপক্ষে এক তাসবীহ পরিমাণ দেরী করা ওয়াজিব।

সিজদা থেকে উঠার সময় ১৫ কাজ

১. সিজদা থেকে উঠা অবস্থায় তাকবীর বলা।

২. (প্রথমে) কপাল উঠানো।

৩. (তারপর) নাক উঠানো।

৪. (তারপর) উভয় হাত উঠানো।

৫. দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে স্থিরভাবে বসা। [ওয়াজিব]।

৬. উভয় পা ডান দিক দিয়ে বের করে বিছিয়ে রাখা।

৭. উভয় পায়ের আঙ্গুলসমূহ (সম্ভবমত) কিবলার দিকে মুড়িয়ে রাখা।

৮.নিতম্বের উপর বসা।

৯. উভয় হাত উরুর উপর হাতের আঙ্গুলের মাথা হাঁটু বরাবর রাখা।

১০. নজর দুই হাঁটুর মাঝে রাখা।

১১. বসা অবস্থায় দু'আ(আল্লাহুম্মাগফিরলী) বলা।

১২. তাকবীর বলা অবস্থায় দ্বিতীয় সিজদায় যাওয়া।

১৩. পূর্বের নিয়মে দ্বিতীয় সিজদার পর তাকবীর বলা অবস্থায় পরবর্তী রাক'আতের জন্য পায়ের অগ্রভাগে ভর করে দাঁড়ানো।

১৪. হাঁটুর উপর হাত রেখে দাঁড়ানো।

১৫. সিজদা হতে সরাসরি দাঁড়ানো। (মাঝখানে না বসা) এবং উঠার মাঝে রুকুর অবস্থা সৃষ্টি না করা।

মাসায়িলে কু'উদ (বৈঠক) ১৬টি
বসায় ১২ কাজ

১. উভয় পা ডান দিকে বের করে বিছিয়ে বসা।

২. উভয় পায়ের আঙ্গুলসমূহ (সম্ভবমত) কিবলার দিকে মুড়িয়ে রাখা।

৩. উভয় হাতের আঙ্গুলসমূহ মিলিয়ে রাখা এবং উরুর উপর আঙ্গুলসমূহের মাথা হাঁটু বরাবর রাখা।

৪. মাথা ও পিঠ সোজা রাখা।

৫. নজর দুই হাঁটুর মাঝে রাখা।

৬. 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়া। [ওয়াজিব]

৭. 'আশহাদু' বলার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথা একসঙ্গে মিলিয়ে এবং অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলদ্বয় মুড়িয়ে রেখে হালকা বাঁধা।

৮. 'লা ইলাহা' বলার সময় শাহাদাত আঙ্গুল সামান্য উঁচু করে ইশারা করা। অতঃপর 'ইল্লাল্লাহু' বলার সময় নামানো।

৯. বৈঠক শেষ হওয়া পর্যন্ত হাত ঐরূপ হালকা বাঁধা অবস্থায় রাখা।

১০. আখেরী বৈঠক (আত্তাহিয়্যাতুর পর) দরূদ শরীফ পড়া।

১২. (অতঃপর) দু'আয়ে মাসূরা পড়া।

[বি.দ্র. ১ম বৈঠক ওয়াজিব ও শেষ বৈঠক ফরজ।]

সালাম ফিরানোর ৮ কাজ

১. একা নামায পড়লে উভয় সালামের সময় ফেরেশতাদেরকে সালাম করার নিয়ত করা এবং জামা'আতের সময় উভয় সালামে ইমাম, অন্যান্য মুসল্লী, ফেরেশতা ও নামাযী জ্বিনদের সালাম করার নিয়ত করা।

২. উভয় সালাম কিবলার দিক থেকে শুরু করা।

৩. উভয় সালামে 'আসসালামু' বলা পর্যন্ত চেহারা কেবলার দিকে রাখা।

৪. প্রথমে ডান দিকে, অতঃপর বাম দিকে সালাম ফিরানো।

৫. সালামের সময় ডানে-বামে শুধু চেহারা ফিরানো (সিনা না ফিরানো)।

৬. আলাইকুম বলার সময় নজর কাঁধের দিকে ফিরানো।

৬. দ্বিতীয় সালাম, প্রথম সালামের তুলনায় আস্তে বলা।

পুরো নামাযের ৬ মাসায়িল

১. নামাযের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অন্তরে নামাযের খেয়াল রাখা, আর সহজ পদ্ধতি হল সব কিছু খেয়াল করে পড়া। মুখস্তের জোরে না পড়া। (মন অন্য কোন দিকে চলে গেলে, স্মরণ হওয়া মাত্রই ফিরিয়ে আনা)

২. মাঝের তাকবীরগুলো পূর্ববর্তী রুকন থেকে আরম্ভ করে অপর রুকনে পৌঁছে শেষ করা। (কিন্তু তাকবীর এক আলিফ থেকে

টানা যাবে না।)

৩. এক রুকন থেকে অন্য রুকনে যেতে বিনা ওযরে বিলম্ব না করা।

৪. পঠিত সূরা বা দু'আ সমূহের প্রতি অন্তরে খেয়াল করা।

৫. ক্বিরা'আত,তাকবীর,দু'আ ইত্যাদি চুপি চুপি পড়া।

৬. সর্বাবস্থায় হাতের আঙ্গুলসমূহ মিলিয়ে রাখা।

৭. হাই আসলে, যথাসম্ভব মুখ বন্ধ রাখতে চেষ্টা করা।

৮. হাঁচি আসলে সাধ্যমত দমিয়ে রাখা।

এ পর্যন্ত 'মহিলাদের নামাযের ৯৯ মাসায়িল' পূর্ণ হল।

পরিশিষ্ট

পুরুষ-মহিলা উভয়ের জন্য অতিরিক্ত মাসায়িল।

নামাযের পর মাসনূন দু'আ সমূহ, তাসবীহ-তাহ্লীল ইত্যাদি পড়া ও মুনাজাত করা মুস্তাহাব।

মুনাজাতে করণীয়

১. উভয় হাত সিনা বরাবর রাখা।

২. হাতের তালু চেহারার সম্মুখে আসমানের দিকে করে রাখা।

৩. হাতের আঙ্গুলগুলো মোটামুটি সোজা রেখে স্বাভাবিক ফাঁক করে রাখা।

৪. দু'হাতের মধ্যখানে সামান্য পরিমাণ ফাঁক রাখা।

৫. শুরুতে আল্লাহ পাকের হামদ্ ও রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পড়া।

৬. একাগ্রচিত্তে কাকুতি-মিনতির সাথে দু'আ করা।

৭. একান্ত বিশ্বাস ও দৃঢ়তার সাথে চাওয়া যে, হায় আল্লাহ! আমাকে অমুক জিনিস দান করুন। (এভাবে না চাওয়া যে, ইচ্ছে

হলে দেন এবং মৃত্যু, গযব ইত্যাদি না কামনা করা।)

৮. চুপে চুপে দু'আ করা। [মুস্তাহাব]

৯. দ্বীন দুনিয়ার কাঙ্ক্ষিত বিষয়গুলো বারবার প্রার্থনা করা।

১০. দু'আশেষে সুবহানা রাব্বিকা .... আয়াতগুলো পড়ে তার পর 'আমীন' বলে মুনাজাত শেষ করা।

নামায ভঙ্গের কারণ ১৯টি

১. নামাযে অশুদ্ধ পড়া।

২. নামাযের ভিতরে কথা বলা।

৩. কোন লোককে সালাম দেয়া।

৪. সালামে উত্তর দেয়া।

৫. উহ্-আহ্ শব্দ করা।

৬. বিনা ওযরে কাশি দেয়া।

৭. আমলে কাছীর করা।

৮. বিপদে বা বেদনায় শব্দ করে কাঁদা।

৯. তিন তাসবীহ পরিমাণ সময় সতর খুলে থাকা।

১০. মুক্তাদি ব্যতীত অপর ব্যক্তির লোকমা গ্রহণ করা।

১১. সুসংবাদের বা দুঃসংবাদের উত্তর দেয়া। 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন' বলা।

১২. নাপাক জায়গায় সিজদা করা।

১৩. কিবলার দিক হতে সিনা ঘুরে যাওয়া।

১৪. নামাযে কুরআন শরীফ দেখে পড়া।

১৫. নামাযে শব্দ করে হাসা।

১৬. নামাযে দুনিয়াবী কোন কিছু প্রার্থনা করা।

১৭. হাঁচির উত্তর দেয়া। (জাওয়াবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলা)

১৮. নামাযে খাওয়া বা পান করা।

১৯. ইমাম হতে এগিয়ে মুক্তাদির খাড়া হওয়া।

জরুরী জ্ঞাতব্য

মাসায়িলে উল্লিখিত কাজগুলোর মধ্য হতে যেগুলোর শেষে ফরয বা ওয়াজিব লেখা আছে, সেগুলো ফরয বা ওয়াজিব। অবশিষ্ট কাজগুলো সুন্নাত কিংবা মুস্তাহাব।

পুস্তিকায় লিখিত মাসআলাগুলোর বাস্তবরূপ কোন মুহাক্কিক 'আলিমের নিকট হতে মশক করে নেয়া জরুরী, নতুবা সহীহভাবে নামায পড়া সম্ভব নয়। নামাযের সূরা ও দু'আসমূহ কোন পারদর্শী ক্বারী সাহেবের নিকট হতে মশিক করে নেয়া অপরিহার্য।

পুস্তিকাটির সংশোধন সম্পর্কিত তাহক্বীকী বিশ্লেষণ পাঠালে বা জানালে কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইমামদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

জিজ্ঞাসা

আমি একটা জামে মসজিদের ইমাম।

ইমাম হিসেবে আমি মুসল্লীদের ইমামতি করে থাকি। তাছাড়া মুসল্লীদের চাহিদা মুতাবিক তাদের বিভিন্ন ব্যাপারে দু'আখতমে কুরআন ইত্যাদি করে থাকি। আমি জানতে চাচ্ছি যে, এতে কি ইমাম হিসেবে আমার দায়িত্ব পালন হচ্ছে, না এর বাইরে আমার আরো কিছু করণীয় আছে? এটা এ জন্য জানতে চাচ্ছি, যাতে দুনিয়াতে আমার বেতন নেয়া হালাল হয় এবং আখেরাতের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে খেয়ানতকারী সাব্যস্ত না হই। মেহেরবানী করে বিষয়টি খুলে বলবেন। আমার ন্যায় বহু ইমাম এ ব্যাপারে শঙ্কিত। যেন কিয়ামতের ময়দানে লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে আল্লাহর দরবারে

লজ্জিত না হতে হয়।

জবাব

অবতরণিকা

আল্লাহ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মানিত করেছেন এবং উলামায়ে কিরাম ও আইম্মায়ে মাসাজিদকে তার উত্তসূরী ঘোষণা করেছেন। উলামায়ে কিরাম ব্যক্তিগতভাবে বা দুনিয়ার দিক দিয়ে যে স্তরের লোক হোন না কেন, তারাই এ আয়াতের বাস্তব 'আমি দুনিয়ার মধ্যে কমজোর তবকার উপর ইহসান করতে চাই এবং তাদেরকে ইমাম ও সর্দার বানাতে চাই।' (সূরা কাসাস-৫) বস্তুত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর মিহরাব ও মিম্বর আজ ইমামদের নিকট, তাদের তত্বাবধানে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর উত্তরসূরী হওয়ার কারণে ইমামগণের জিম্মাদারী অনেক। ইরশাদ হচ্ছে 'তোমরা আমানত পাওনাদারের নিকট পৌঁছে দাও।' (সূরা নিসা-৫৮) এর তাফসীরে বলা হয়েছে, সাধারণ মুসলমানদের দ্বীন ও ঈমান উলামাগণের নিকট আমানত যা তাদেরকে পৌঁছে দিতে বলা হয়েছে। অন্যত্র বলা হয়েছে 'তাদেরকে এক যবরদস্ত নূর দান করা হয়েছে যা নিয়ে তারা সর্বত্র বলতে থাকবেন।' (সূরা আন'আম-১২২) তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে পূর্ণিমার চাঁদের সাথে তুলনা করেছেন। মসজিদের ইমামগণের উপর অর্পিত এ দায়িত্বের সংক্ষিপ্ত আলোচনা মাসিক রাহমানী পয়গামে প্রকাশিত হয়েছে। ব্যাপক ফায়দার উদ্দেশ্যে তা পুস্তিকা আকারে ছাপা হল। আল্লাহ তা'আলা কবুল করুন।

আপনি যেহেতু নায়েবে নবী, সুতরাং নবী-রাসূলগণের যে তিনটি কাজ ছিল-যথা তাবলীগ, তা'লীম ও তাযকিয়া (সূরা বাক্বারাহ-১২৯) এ সিফাতগুলোও এর সাথে সাথে দ্বীনী মাদরাসা পরিচালকের জিম্মাদারী সম্পর্কেও কিছু আলোচনা পেশ করা হইল। এ কাজগুলো

প্রথমে নিজের মধ্যে হাসিল করতে হবে এবং এর প্রত্যেকটি গুণকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারদর্শী হাক্কানী উলামায়ে কেরাম থেকে শিখতে হবে এবং নিজের যিন্দেগীকে উক্ত তিন জিম্মাদারী ও দায়িত্ব আদায় করার জন্য ওয়াকফ করতে হবে। সুতরাং প্রত্যেক ইমাম সাহেবের উপর তিনটি জিম্মাদারী পালন করা অপরিহার্য কর্তব্য।

নিম্নে উপরোক্ত জিম্মাদারী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হল।

প্রথম জিম্মাদারী : মসজিদে মুসল্লীদের সঠিকভাবে ইমামতি করা ও নামায পড়ানো। এর জন্য আপনার নিজের প্রস্তুতি হিসেবে তিনটি কাজ করতে হবে।

(ক) সূরা-ক্বিরা'আত পুরোপুরি সহীহ করতে হবে। কারণ, ক্বিরা'আতের অনেক ভুলের দ্বারা নামায ফাসিদ হয়ে যায়।

(খ) সহীহ মাসআলা-মাসায়িল আমলী মশক (বাস্তব প্রশিক্ষণ) এর মাধ্যমে শিখে নিতে হবে। কারণ, ড্রাইভার না শিখে ড্রাইভিং করলে যেমন ড্রাইভিং নিজেও মরে যাত্রীদেরকেও মারে, তেমনিভাবে কারো নিকট থেকে মাসায়িল ও প্র্যাকটিক্যাল নামায না শিখে ইমামতি করলে বিভিন্ন ভুলের দরুন নিজেও মহা অপরাধী হয় এবং মুসল্লীদের নামায ও নষ্ট হয়ে যায়। যেমন, মনে মনে ক্বিরা'আত পড়া, জিহ্বা ঠোঁট বা মুখ না হেলিয়ে দিলে দিলে ক্বিরা'আত পড়া। (হিদায়া, ১ : ১১৭)

তাছাড়া নামাযের আমলী মশক না থকার দরুন অনেক ইমাম তাকবীরে তাহরীমার 'আল্লাহ' শব্দের মধ্যে এক আলিফ থেকে অনেক বেশি লম্বা করে থাকেন, যা মূলত নিষেধ (ফাতওয়া শামী, ১ : ৩৮৭/ শরহে বেকায়া, ১ : ১৩৪) কিন্তু এ ভুলের দরুন মুসল্লীদের নামাযে মারাত্মক অসুবিধা হতে পারে। কারণ, অনেক মুসল্লী ইমামের সাথে সাথে তকবীরে তাহরীমা বলে থাকেন এবং তারা আল্লাহ শব্দটি দীর্ঘ স্বরে উচ্চারণ করেন না। এ কারণে তাদের

তাকবীর ইমামের তাকবীরের আগেই শেষ হয়ে যায়। যার ফলে তাদের ইমামের একতেদাই সহীহ হয় না এবং তাদের নামায বেকার হয়ে যায়। (আহসানুল ফাতওয়া, ৩ : ৩০৫) লক্ষ্য করুন, ইমামের একটু ভুলের দরুন কত বড় ক্ষতি হতে পারে! তেমনিভাবে অনেকে তাকবীরে তাহরীমার জন্য হাত উঠানোর সময় মাথা ঝুকিয়ে থাকেন এবং এটাকে আল্লাহর সামনে বিনয় প্রকাশ করা মনে করে থাকেন। অথচ এ অবস্থায় চেহারা কিবলার দিকে রাখতে হয়। কিবলার দিকে না রেখে জমিন মুখী রাখায় এটা নাজায়েয ও হারাম হয়। (ফাতওয়া আলমগীরী, ১ : ৭৩/ আদ দুররুল মুখতার, ১ : ৪৭৫) আবার কেউ কেউ রুকু' থেকে সিজাদায় যাওয়ার সময় রুকুর মত করে সিজদায় গিয়ে থাকেন, যা মাকরূহে তাহরীমী। কারণ, মাসআলা হল, হাঁটু জমিনে না লাগা পর্যন্ত বুক একদম সোজা রাখতে হবে এবং হাঁটু জমিনে লাগার পর সিনা ঝুকিয়ে সিজদায় যেতে হবে। (ফাতওয়া শামী, ১ : ৪৯৭) নূরুল ইজাহ, ৫১)

এখন বলুন, কোন ইমাম সাহেব যদি অসতর্কতা বা নামাযের মশক না থাকার দরুন এভাবে হারাম বা মাকরূহ তাহরীমী কাজে লিপ্ত থাকে, তাহলে মুসল্লীদের নামাযের কী অবস্থা হবে?

কোন কোন ইমাম অসতর্কতার দরুন নামাযের সালাম ফিরানোর সময় 'আস-সালামু' শব্দের মধ্যে এক আলিফ থেকে বেশি লম্বা করে থাকেন, অথচ এতে মুসুল্লীদের নামাযের মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যায়। কারণ, মুকতাদীদের জন্য প্রথম সালামের 'আস-আলামু' পর্যন্ত ইমামের ইকতিদা করা ওয়াজিব। অর্থাত এতটুকু সময়ের মধ্যে মুক্তাদীগণ সালাম বলার ক্ষেত্রে ইমামের আগে যেতে পারবে না। ইচ্ছা পূর্বক ইমামের আগে গেলে মাকরূহ তাহরীমী হবে। (তাতরখানীয়া, ১ : ৮৭/ আলমগীরী, ১ : ৬৮-৬৯) এর পরে অবশিষ্ট সালামের মধ্যে ইমামের ইকতিদা করা সুন্নত। সুতরাং এখন যদি কোন ইমাম সাহেব আস-সালামু শব্দে এক আলিফের থেকে বেশি

লম্বা করে তাহলে তো মুসল্লীগণ ইমাম সাহেবের আগেই 'আস-সালামু' বলে ফেলবে। এতে তাদের নামায মাকরূহ তাহরীমী হয়ে যাবে। দেখুন, ইমাম সাহেবের সামান্য ভুলের দরুন অনেক সাধারণ মুকতাদীর নামায মকরূহে তাহরীমী হতে পারে। তাছাড়া অনেক স্থানে দেখা যায় যে, নামায শেষে ইমাম সাহেব সকল মুসল্লীকে নিয়ে উচ্চৈঃস্বরে দু'রাকা'আতে থাকেন। ফলে মাসবূক মুকতাদীদের অবশিষ্ট নামায সম্পূর্ণ করতে মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি হয়। অথচ সালামের পর ইমামের ইকতিদা শেষ হয়ে যায়। এরপর আর ইকতিদা বাকী থাকে না। সুতরাং সকলে মিলে দু'আ করা জরুরী কোন আমল নয়। ইমাম নিজে দু'আ করবেন, যাদের সময় সুযোগ আছে, তারা ইচ্ছা করলে ইমামের সাথে দু'আয় শরীক হতে পারেন এবং ইমামের সাথে, আগে বা পরে মুনাজাত শেষও করতে পারেন। মুস্তাহাব আমল হিসেবে এটা করতে পারেন। জরুরী মনে করা নাজায়েয। দ্বিতীয়ত চুপে চুপে দু'আ করা মুস্তহাব এবং সে দু'আ কবুল হওয়ার বেশি আশা করা যায়। আর উচ্চৈঃস্বরে দু'আ করা বিভিন্ন শর্তের সাথে জায়েয আছে মুস্তাহাব নয়, শর্তগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো, কোন মুসল্লীর নামায, তিলাওয়াত বা যিকিরে ব্যাঘাত ঘটানো যাবে না। (আহসানুল ফাতওয়া, ৩ : ৬০-৬৮) অথচ এ মুনাজাত দ্বারা অন্যান্য মুসল্লীর নামাযে মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি করা হয়। তাদের সূরা ক্বিরা'আত পড়তে যে কি সমস্যা হয়, সেদিকে কেউ লক্ষ্য করে না; অথচ মসজিদের ইমাম সাহেব ও কমিটির জিম্মাদারী হচ্ছে- এ সব বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা।

এখানে বুঝার জন্য কতিপয় নমুনা পেশ করা হলো মাত্র, যাতে সকলেই আমলী মশকের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেন।

(গ) আহলুল্লাহ অর্থাত আল্লাহওয়ালাদের সুহবত ইখতিয়ার করে নিজের ভিতর তাকওয়া, পাহেজগার, আল্লাহর ভয়, ইখলাস ইত্যাদি আত্মার ভালগুণ হাসিল করতে হবে। কারণ, এগুলোর অভাব

থাকলে নিজের ইলমের উপর আমল করা কঠিন। আর নিজের মাঝে আমল ও ইখলাস না থাকলে, সেই ইমামের নামায কবুল হয় না। বলাবাহুল্য বে-আমল আলিমের জন্য ইমামতি করা মাকরূহে তাহরীমী। এমনকি তাকে ইমামতিতে নিয়োগ দান বা ইমাম পদে বহাল রাখাও মসজিদ কর্তৃপক্ষের জন্য নিষেধ।

দ্বিতীয় জিম্মাদারী : মসজিদের মুসল্লীদের এবং সমজিদের মকতব-এর বাচ্চাদের কুরআনে কারীম তথা সূরাহ ক্বিরা'আত সহ দ্বীনের মৌলিক বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমে শিক্ষা দান করা।

দ্বীনের করণীয় পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান দান করা। অর্থাত তাদের ঈমান-আকায়িদ, ইবাদত-বন্দেগী, মু'আমালাত বা হালাল রিযিক, মু'আশরাত বা বান্দার হক ও ইসলামী সামাজিকতা, আত্মশুদ্ধি বা অন্তরের রোগের চিকিতসার ব্যবস্থা করা এবং এর মাধ্যমে সমস্ত গুনাহের অভ্যাস পরিত্যাগ করানো এবং প্রত্যেকটি বিষয়ে বাস্তব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হাতে কলমে শিক্ষা দান করা। বর্তমানে এর বড়ই অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। একে তো অনেকে ফাযায়িলের বয়ান করলেও মাসায়িলের বয়ান করেন না, আবার কেউ মাসায়িলের আলোচনা করলেও বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রদান করেন না। যে কারণে আমাদের সমাজে বিভিন্নভাবে দ্বীন খেদমত চালু থাকা সত্ত্বেও উম্মাতের আযান-ইকামত, উযু-নামায, বিবাহ-শাদী, কাফন-দাফন ইত্যাদির কোনটিই পুরোপুরি সুন্নাত অনুযায়ী আদায় হচ্ছে না; বরং প্রত্যেকটির মাঝে কিছু সুন্নাত জারী আছে, আর কতগুলো সুন্নাত ছুটে যাচ্ছে। অথচ কোন আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার জন্য সুন্নাতের অনুসরণ জরুরী এবং সুন্নাতের দ্বারাই ফরজ পরিপূর্ণ হয়। মিরাজের রাতে নামায ফরজ হওয়ার পরের দিন আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল (আঃ) কে পাঠিয়ে নামাযের সম্পূর্ণ নকশা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর সামনে পেশ করেছেন, নামাযের বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন এবং নবী (সাঃ)

ও সাহাবায়ে কিরামকে (রা.) তাবেয়ীনদেরকে যে আমলী মশকের মাধ্যমে নামায শিখিয়েছেন, এর বহু ঘটনা হাদীসের কিতাবসমূহে বিদ্যমান রয়েছে। তাছাড়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে ঘুরে ঘুরে নামাযের কাতার দুরুস্ত করতেন, ভুল সংশোধন করতেন, এমনকি একবার রুকু-সিজদার মধ্যে কিছু ত্রুটি করার দরুন একজন সাহাবীকে তিনি বলেছেন যে, তুমি দ্বিতীয়বার নামায পড়, তোমার নামায হয়নি। তিন বারের পর যখন সেই সাহাবী ভুল সংশোধন করতে পারলেন না, তখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে পুরা নামায শিখালেন। (বুখারী শরীফ / মুসলিম শরীফ) সাহাবী আবু হুজাইফা (রা.) এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, তিনি নামাযে রুকু-সিজদার মধ্যে ভুল করছেন। তখন নামাযান্তে তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তুমি এভাবে নামায কতদিন যাবত পড়ে আসছ? সে ব্যক্তি বলল, বার বছর যাবত। উক্ত সাহাবী (রা.) তখন বললেন, এভাবে নামায পড়তে পড়তে যদি তুমি মৃত্যুবরণও কর, তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকার উপর তোমার মৃত্যু হবে না। (বুখারী, ১ : ১০৯/ হাঃ নং ৭৯১)

এ সামান্য আলোচনা দ্বারা অতি সহজেই বুঝা গেল, আমদের আমলের যে করুণ অবস্থা তা দূর করতে হবে। এর একমাত্র পথ হলো গুরুত্ব সহকারে সুন্নাতের আলোচনা বেশি বেশি করা এবং প্রত্যেকটি দ্বীনী বিষয় আমলী মশকের মাধ্যমে শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়া। যেন এমন না হয় যে, একজন ইমাম ১০/ ১৫ বছর এক স্থানে ইমামতি করছেন, অথচ এ দীর্ঘ সময়েও তার পেছনের মুসল্লীদের সূরা, ক্বিরা'আত ও নামাযের রুকু-সিজদা কিছুই সহীহ হয়নি। অথচ তিনি ইমামতি করেই যাচ্ছেন।

তৃতীয় জিম্মাদারী : মহল্লার সকল শ্রেণীর লোকদের নিকট দ্বীনী ও দুনিয়াবী ফায়েদা পৌঁছানোর লক্ষ্যে দাওয়াত ও খেদমতের

উদ্দেশ্যে সময় সুযোগ মত তাদের খোঁজ-খবর নেয়া এবং তাদের বাড়ীতে বাড়ীতে পৌঁছাতে চেষ্টা করা। একজন ইমাম সাহেব ইচ্ছা করলে এবং বছরের সাড়ে তিনশত বাড়ীতে পৌঁছতে পারেন। এর জন্য ইমাম সাহেবের নিকট সম্পূর্ণ মহল্লার লোকদের একটা তালিকা থাকা উচিত। উক্ত তালিকা অনুযায়ী যারা মসজিদে আসেন তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে নিজের সহকর্মী বানিয়ে তাদের সাথে পরামর্শক্রমে যার সাথে যার পরিচয় ও উঠাবসা আছে, তাদের রাহবার বানিয়ে তার সহযোগিতায় সেসব লোকের বাড়ীতে পৌঁছা, যারা এখনো সমজিদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেননি। অতঃপর তাদের কাছে দ্বীনের গুরুত্ব তুলে ধরা তাদের পরিবারের মহিলাদেরকেও দ্বীনী দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা এবং তাদেরকেও সহীহ ঈমান ও আমলের জন্য উদ্বদ্ধ করা। সাথে সাথে মহল্লার গরীব লোকদের খোঁজ-খবর নেয়া, বিপদে- আপদে, তাদের পাশে দাঁড়ানো। বিপদগ্রস্ত লোকদের ব্যাপারে সামর্থবান মুসল্লীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। দুঃস্থ-মানবতার সেবা করা নবী (সা.)-এর গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। এ সুন্নাতকে যিন্দা করার দ্বারাই সাম্রাজ্যবাদের অগ্রদূত, অমুসলিমের মদদপুষ্ট এন.জি.ওদের কার্যক্রমের বাস্তব সম্মত মুকাবিলা করা সম্ভব। আল্লাহ না করুন! এসব এন.জি.ও যদি এভাবে অগ্রসর হতে থাকে, তাহলে তারা অদূর ভবিষ্যতে এমন একটা জেনারেশন সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে, যারা নামকা ওয়াস্তে মুসলিম সন্তান হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের ক্ষতি সাধনে প্রথম কাতারের শত্রুর ভূমিকা পালন করবে। দীনে ইসলাম, উলামায়ে কিরাম ও ইসলামী পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদিকে হেয় প্রতিপন্ন করবে এবং এগুলো উচ্ছেদ করতে খড়গহস্ত হবে। শুধু তাই নয়, শেষ পর্যন্ত নিজেদের স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে এদেশের মুসলমানদের ঈমান, আমল ও স্বাধীনতার ফল মাতৃভূমি বাংলাদেশেকে সাম্রাজ্যবাদের হাতে তুলে দিবে। স্বাধীনতা লাভের ৫০/ ৬০ বছরের মাথায় আবার আমরা গোলামীর জিঞ্জির

কাঁধে নিয়ে বে-ইজ্জতির যিন্দেগীতে গ্রেফতার হয়ে পড়বো।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের স্বাধীনতা দান করেছেন। দ্বীনের খেদমতের ঢালাও সুযোগ দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু নায়েবে রাসূল এবং দ্বীনদার মুসলমানগণ যদি এ সুযোগের সদ্ব্যবহার না করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে এ সুযোগ ছিনিয়ে নিয়ে আযাবের মধ্যে নিক্ষেপ করবেন। আমাদের অবহেলার দরুন অলসতার দরুন মসজিদের মকতব বন্ধ হয়ে দুশমনদের ফাঁদ কিন্ডার গার্ডেন আবাদ হচ্ছে। সুযোগ থাকতে ব্যবস্থা নেয়া উচিত। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের আযাব থেকে হেফাজত করুন।

মাদরাসা পরিচালকদের জিম্মাদারী

বর্তমানে প্রায় দ্বীনী মাদরাসাগুলোই জনগণের সাহায্য সহযোগিতা দ্বারাই পরিচালিত হয়ে থাকে। তারা যেমন মাদরাসা টিকিয়ে রাখার জিম্মাদারী পালন করছে, তদ্রুপ মাদরাসা পরিচালক বৃন্দেরও জিম্মাদারী জনসাধারণের ঈমান আমলের প্রতি লক্ষ্য রাখা। তাছাড়া মাদরাসার পরিচালকগণ জনগণ থেকে টাকা-পয়সা আনার সময়ই তাদের সাথে অঘোষিতভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে যায় যে, আপনাদের থেকে টাকা পয়সা নিচ্ছি, আমরা আপনাদেরকে সুযোগ্য মুত্তাকী আলেম উপহার দিব। সুতরাং উক্ত জিম্মাদারী ও অঙ্গীকারের প্রতি লক্ষ্য রাখাও মাদরাসা পরিচালকদের কর্তব্য।

মাদরাসার ছাত্র ভাইয়েরা যাতে নবীর (সা.) সুযোগ্য উত্তরসুরী হয়ে সমাজে দ্বীনী মেহনত করতে পারে তাই তাদেরকেও উক্ত তিন বিষয়ে দাওয়াত তালীম ও তাযকিয়া সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া। মাঝে মধ্যে ছাত্রদেরকে দাওয়াত ও তাবলীগে পাঠিয়ে তাদের মাঝে দাওয়াতী মনোভাব গড়ে তোলা। আযান, ইকামত, উযু, নামায ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে সুন্নাত তরীকায় আমলী মশকের মাধ্যমে তালীমের ব্যবস্থা করা এবং তাদেরকে তাযকিয়ার ব্যাপারেও

উতসাহিত করা, এসব মাদরাসা পরিচালক ও শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। ছাত্ররা নিজেদের জীবন উস্তাদদের হাতে তুলে দেয়ার পরও যদি তারা তাদেরকে সঠিকভাবে গড়তে অবহেলা করে তাহলে আল্লাহর নিকট জবাবদিহী করতে হবে। যেমনিভাবে শুধু নামায পড়িয়ে দেয়াই ইমাম সাহেবের জিম্মাদারী নয়, নামায পড়ানোর সাথে সাথে মুসল্লীদের সার্বিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখাও তার দায়িত্ব। তদ্রুপ ছাত্রদের শুদ্ধ কিতাব পড়িয়ে দেয়াই মাদরাসা পরিচালকের দায়িত্ব নয়; বরং কিতাব পড়ানোর সাথে তাদের ঈমান আমলসহ সার্বিক দিক দিয়ে খোঁজ খবর রাখা ও তাদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গড়ে তোলাও তাদের দায়িত্ব। মাদরাসায় দায়িত্বশীলগণ এ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে যে সব ছাত্রদের জন্য জনসাধারণ থেকে সাহায্য ভিক্ষা এনে তাদের খানা-পিনা থাকার এন্তেজাম করছে ঐ ছাত্রগণই একদিন তাদের জন্য আস্তিনের সাপ হবে বিপদের কারণ হবে আর আখিরাতের জবাবদিহিতা তো আছেই। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হেফাজত করেন। আমীন!

নামায ও রোযার চিরস্থায়ী সময়সূচী :

এ সময়সূচী সরাসরি কেবল ঢাকা ও ততপার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য প্রযোজ্য। অন্যান্য জেলার জন্য সময় নিরূপণে টীকার বর্ণনানুযায়ী বেশ-কম করতে হবে।

সংক্ষেপ করার জন্য মধ্যবর্তী তারিখগুলো দেখানো হয়নি। মধ্যবর্তী তারিখগুলোর জন্য এক আধ মিনিট কম, বেশ করে নিতে হবে।

এ সময় তালিকায় সময়জ্ঞাপক মোট আটটি ঘর রয়েছে। যেমন প্রথম ঘরে সাহরী শেষ করার কথা বলা হয়েছে। রোযাদারগণ এ সময় পানাহার বন্ধ করবে। সাবধানতার জন্য সুবহে সাদেক-এর পাঁচ মিনিট পূর্বেই এ সময়টি নির্ধারণ করা হয়েছে। ২নং ঘরে যে

সময় দেয়া হয়েছে, এ সময় থেকে ফজরের আযান শুরু করবে। ৩নং ঘরে সূর্যোদয়ের সময় দেখানো হয়েছে। এ সময় হতে ১৫ মিনিট পর্যন্ত যে কোন প্রকার নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী। ৫নং ঘরে সূর্য ঢলে পড়ার সময় জ্ঞাপন করা হয়েছে। এ সময় হতেই জোহরের সময় আরম্ভ। ৬নং ঘরে আসরের প্রথম সময় দেখানো হয়েছে। ৭নং ঘরে সূর্যাস্তের সময় দেখানো হয়েছে। এটাই ইফতারের সময়। তখন হতেই মাগরিবের সময় আরম্ভ। ৮নং ঘরে ইশার নামাযের প্রথম সময় দেখানো হয়েছে।

ঢাকার দেয়া সময় হতে চট্টগ্রাম-সাহরীতে ৩ মিনিট, ইফতারীতে ৬ মিনিট, বরিশাল ও পটুয়াখালীতে ইফতারীতে ২ মিনিট, নোয়াখালীতে সাহরীতে ২ মিনিট, ইফতারীতে ১ মিনিট, সিলেটে সাহরীতে ৫ মিনিট ও ইফতারীতে ৭ মিনিট বিয়োগ করে নিবেন।

আর ঢাকার দেয়া সময়ের সাথে খুলনায় সাহরীতে ৫ মিনিট, ইফতারীতে ২ মিনিট, বরিশাল ও পটুয়াখালীতে সাহরীতে ১ মিনিট, বগুড়া ও পাবনায় সাহরী ও ইফতারীতে ৩ মিনিট, রংপুরে সাহরীতে ২ মিনিট, ইফতারীতে ১ মিনিট, দিনাজপুরে সাহরীতে ৬ মিনিট, ইফতারীতে ৪ মিনিট, ফরিদপুর, যশোহর ও কুষ্টিয়ায় সাহরী ও ইফতারীতে ৭ মিনিট যোগ করে নিবেন।

Rvbyqvix

Zvs	mvnix †kl Ki‡e	dR‡ii Avhvb ïi“	m~‡h© v`q	wØcÖni	†Rvn‡ii Avhvb ïi“	Avm‡ii Avhvb ïi“	gvMwi‡ei Avhvb I BdZvi ïi“	Bkvi Avhvb ïi“
০১	৫-১৪	৫-২৪	৬-৪১	১২-০৩	১২-০৬	৩-৪৬	৫-২৭	৬-৪৫
০৫	৫-১৬	৫-২৬	৬-৪২	১২-০৫	১২-০৮	৩-৪৯	৫-২৯	৬-৪৮
১০	৫-১৭	৫-২৭	৬-৪৩	১২-০৭	১২-১০	৩-৫২	৫-৩৩	৬-৫১
১৫	৫-১৮	৫-২৮	৬-৪৩	১২-০৯	১২-১২	৩-৫৬	৫-৩৬	৬-৫৩
২০	৫-১৮	৫-২৮	৬-৪৩	১২-১০	১২-১৩	৪-০০	৫-৪০	৬-৫৬
২৫	৫-১৭	৫-২৭	৬-৪১	১২-১১	১২-১৪	৪-০৩	৫-৪৩	৭-০০

৩০	৫-১৬	৫-২৬	৬-৪০	১২-১৩	১২-১৬	৪-০৭	৫-৪৭	৭-০৩

†deª“qvix

০১	৫-১৬	৫-২৬	৬-৩৯	১২-১৩	১২-১৬	৪-০৮	৫-৪৮	৭-০৪
০৫	৫-১৪	৫-২৪	৬-৩৭	১২-১৩	১২-১৬	৪-১১	৫-৫১	৭-০৬
১০	৫-১২	৫-২২	৬-৩৪	১২-১৩	১২-১৬	৪-১৪	৫-৫৪	৭-০৯
১৫	৫-০৯	৫-১৯	৬-৩১	১২-১৩	১২-১৬	৪-১৬	৫-৫৭	৭-১১
২০	৫-০৬	৫-১৬	৬-২৮	১২-১৩	১২-১৬	৪-১৯	৬-০০	৭-১৪
২৫	৫-০২	৫-১২	৬-২৪	১২-১২	১২-১৫	৪-২১	৬-০৩	৭-১৭
২৯	৪-৫৯	৫-০৯	৬-২১	১২-১২	১২-১৫	৪-২২	৬-০৪	৭-১৮

gvP©

০১	৪-৫৯	৫-০৯	৬-২০	১২-১১	১২-১৪	৪-২২	৬-০৫	৭-১৮
০৫	৪-৫৬	৫-০৬	৬-১৭	১২-১১	১২-১৪	৪-২৪	৬-০৬	৭-১৯
১০	৪-৫১	৫-০১	৬-১২	১২-১০	১২-১৩	৪-২৫	৬-০৯	৭-২২
১৫	৪-৪৬	৪-৫৬	৬-০৭	১২-০৮	১২-১১	৪-২৬	৬-১১	৭-২৪
২০	৪-৪১	৪-৫১	৬-০৩	১২-০৭	১২-১০	৪-২৭	৬-১৩	৭-২৬
২৫	৪-৩৬	৪-৪৬	৫-৫৭	১২-০৫	১২-০৮	৪-২৮	৬-১৫	৭-২৮
৩০	৪-২৯	৪-৩৯	৫-৫২	১২-০৩	১২-০৬	৪-২৯	৬-১৭	৭-৩২

GwcÖj

০১	৪-২৭	৫-৩৭	৫-৫০	১২-০৩	১২-০৬	৪-২৯	৬-১৮	৭-৩৩
০৫	৪-২২	৫-৩২	৫-৪৬	১২-০২	১২-০৫	৪-২৯	৬-২০	৭-৩৫
১০	৪-১৮	৫-২৮	৫-৪১	১২-০০	১২-০৩	৪-৩০	৬-২২	৭-৩৭
১৫	৪-১২	৪-২২	৫-৩৭	১১-৫৯	১২-০২	৪-৩০	৬-২৪	৭-৪০
২০	৪-০৭	৪-১৭	৫-৩৩	১১-৫৮	১২-০১	৪-৩০	৬-২৬	৭-৪৩
২৫	৪-০৩	৪-১৩	৫-২৮	১১-৫৭	১২-০০	৪-৩১	৬-২৮	৭-৪৬
৩০	৩-৫৮	৪-০৮	৫-২৪	১১-৫৬	১১-৫৯	৪-৩১	৬-৩০	৭-৪৯

†g

Zvs	mvnix †kl Ki‡e	dR‡ii Avhvb ïi“	m~‡h© v`q	wØcÖni	†Rvn‡ii Avhvb ïi“	Avm‡ii Avhvb ïi“	gvMwi‡ei Avhvb I BdZvi	Bkvi Avhvb ïi“

ïi“

০১	৩-৫৭	৪-০৭	৫-২৪	১১-৫৬	১১-৫৯	৪-৩১	৬-৩১	৭-৫০
০৫	৩-৫২	৪-০২	৫-২১	১১-৫৬	১১-৫৯	৪-৩১	৬-৩৩	৭-৫৩
১০	৩-৪৮	৩-৫৮	৫-১৮	১১-৫৫	১১-৫৮	৪-৩২	৬-৩৫	৭-৫৭
১৫	৩-৪৫	৩-৫৫	৫-১৬	১১-৫৫	১১-৫৮	৪-৩২	৬-৩৭	৮-০০
২০	৩-৪২	৩-৫২	৫-১৩	১১-৫৫	১১-৫৮	৪-৩৩	৬-৪০	৮-০৩
২৫	৩-৪০	৩-৫০	৫-১২	১১-৫৬	১১-৫৯	৪-৩৪	৬-৪২	৮-০৬
৩০	৩-৩৮	৩-৪৮	৫-১০	১১-৫৬	১১-৫৯	৪-৩৫	৬-৪৫	৮-০৯

Ryb

০১	৩-৩৭	৩-৪৭	৫-১০	১১-৫৭	১২-০০	৪-৩৫	৬-৪৬	৮-১১
০৫	৩-৩৭	৩-৪৭	৫-১০	১১-৫৭	১২-০০	৪-৩৬	৬-৪৭	৮-১২
১০	৩-৩৬	৩-৪৬	৫-১০	১১-৫৮	১২-০১	৪-৩৭	৬-৪৯	৮-১৫
১৫	৩-৩৬	৩-৪৬	৫-১০	১১-৫৯	১২-০২	৪-৩৮	৬-৫১	৮-১৭
২০	৩-৩৬	৩-৪৬	৫-১১	১২-০০	১২-০৩	৪-৪০	৬-৫২	৮-১৮
২৫	৩-৩৭	৩-৪৭	৫-১২	১২-০১	১২-০৪	৪-৪১	৬-৫৩	৮-২০
৩০	৩-৪০	৩-৫০	৫-১৪	১২-০৩	১২-০৬	৪-৪২	৬-৫৩	৮-২০

RyjvB

০১	৩-৪০	৩-৫০	৫-১৪	১২-০৩	১২-০৬	৪-৪২	৬-৫৪	৮-২০
০৫	৩-৪২	৩-৫২	৫-১৫	১২-০৪	১২-০৭	৪-৪২	৬-৫৪	৮-২০
১০	৩-৪৪	৩-৫৪	৫-১৮	১২-০৪	১২-০৭	৪-৪৩	৬-৫৩	৮-১৮
১৫	৩-৪৭	৩-৫৭	৫-১৯	১২-০৫	১২-০৮	৪-৪৩	৬-৫৩	৮-১৭
২০	৩-৫০	৪-০০	৫-২২	১২-০৫	১২-০৮	৪-৪৩	৬-৫১	৮-১৪
২৫	৩-৫৪	৪-০৪	৫-২৪	১২-০৫	১২-০৮	৪-৪৩	৬-৪০	৮-১১
৩০	৩-৫৭	৪-০৭	৫-২৬	১২-০৫	১২-০৮	৪-৪২	৬-৪৬	৮-০৭

AvMó

০১	৩-৫৮	৪-০৮	৫-২৭	১২-০৫	১২-০৮	৪-৪২	৬-৪৫	৮-০৫
০৫	৪-০১	৪-১১	৫-২৯	১২-০৬	১২-০৮	৪-৪১	৬-৪২	৮-০২
১০	৪-০৪	৪-১৪	৫-৩১	১২-০৪	১২-০৭	৪-৪০	৬-৩৯	৭-৫৮
১৫	৪-০৭	৪-১৭	৫-৩৩	১২-০৩	১২-০৬	৪-৩৮	৬-৩৫	৭-৫৩
২০	৪-১০	৪-২০	৫-৩৫	১২-০২	১২-০৫	৪-৩৬	৬-৩১	৭-৪৮
২৫	৪-১৩	৪-২৩	৫-৩৭	১২-০১	১২-০৪	৪-৩৩	৬-২৭	৭-৪৪
৩০	৪-১৫	৪-২৫	৫-৩৯	১১-৫৯	১২-০২	৪-৩০	৬-২২	৭-৩৭

†m‡Þ¤^i

Zvs	mvnix †kl Ki‡e	dR‡ii Avhvb ïi“	m~‡h© v`q	wØcÖni	†Rvn‡ii Avhvb ïi“	Avm‡ii Avhvb ïi“	gvMwi‡ei Avhvb I BdZvi ïi“	Bkvi Avhvb ïi“
০১	৪-১৬	৪-২৬	৫-৩৯	১১-৫৯	১২-০২	৪-২৯	৬-২০	৭-৩৫
০৫	৪-১৮	৪-২৮	৫-৪১	১১-৫৭	১২-০০	৪-২৬	৬-১৬	৭-৩১
১০	৪-২০	৪-৩০	৫-৪২	১১-৫৬	১১-৫৯	৪-২৩	৬-১১	৭-২৫
১৫	৪-২২	৪-৩২	৫-৪৪	১১-৫৪	১১-৫৭	৪-১৯	৬-০৬	৭-২০
২০	৪-২৫	৪-৩৫	৫-৪৬	১১-৫২	১১-৫৫	৪-১৫	৬-০০	৭-১৪
২৫	৪-২৬	৪-৩৬	৫-৪৭	১১-৫০	১১-৫৩	৪-১১	৫-৫৬	৭-০৯
৩০	৪-২৮	৪-৩৮	৫-৪৯	১১-৪৯	১১-৫২	৪-০৭	৫-৫০	৭-০৩

A‡±vei

Zvs	mvnix †kl Ki‡e	dR‡ii Avhvb ïi“	m~‡h© v`q	wØcÖni	†Rvn‡ii Avhvb ïi“	Avm‡ii Avhvb ïi“	gvMwi‡ei Avhvb I BdZvi ïi“	Bkvi Avhvb ïi“
০১	৪-২৯	৪-৩৯	৫-৪৯	১১-৪৮	১১-৫১	৪-০৬	৫-৪৯	৭-০২
০৫	৪-৩০	৪-৪০	৫-৫১	১১-৪৭	১১-৫০	৪-০৩	৫-৪৫	৬-৫৮
১০	৪-৩২	৪-৪২	৫-৫৩	১১-৪৬	১১-৪৯	৩-৪৯	৫-৪১	৬-৫৪
১৫	৪-৩৪	৪-৪৪	৫-৫৬	১১-৪৫	১১-৪৮	৩-৫৫	৫-৩৬	৬-৫০
২০	৪-৩৬	৪-৪৬	৫-৫৮	১১-৪৪	১১-৪৭	৩-৫১	৫-৩২	৬-৪৬
২৫	৪-৩৮	৪-৪৮	৬-০০	১১-৪৩	১১-৪৬	৩-৪৮	৫-২৮	৬-৪২
৩০	৪-৪০	৪-৫০	৬-০৩	১১-৪২	১১-৪৫	৩-৪৪	৫-২৪	৬-৩৯

b‡f¤^i

Zvs	mvnix †kl Ki‡e	dR‡ii Avhvb ïi“	m~‡h© v`q	wØcÖni	†Rvn‡ii Avhvb ïi“	Avm‡ii Avhvb ïi“	gvMwi‡ei Avhvb I BdZvi ïi“	Bkvi Avhvb ïi“
০১	৪-৪১	৪-৫১	৬-০৪	১১-৪২	১১-৪৫	৩-৪৩	৫-২৩	৬-৩৮
০৫	৪-৪৩	৪-৫৩	৬-০৬	১১-৪২	১১-৪৫	৩-৪১	৫-২১	৬-৩৬
১০	৪-৪৬	৪-৫৬	৬-১০	১১-৪৩	১১-৪৬	৩-৩৯	৫-১৮	৬-৩৪
১৫	৪-৪৯	৪-৫৯	৬-১৩	১১-৪৪	১১-৪৭	৩-৩৭	৫-১৬	৬-৩২
২০	৪-৫২	৫-০২	৬-১৬	১১-৪৪	১১-৪৭	৩-৩৬	৫-১৫	৬-৩১
২৫	৪-৫৫	৫-০৫	৬-২০	১১-৪৬	১১-৪৯	৩-৩৫	৫-১৫	৬-৩১
৩০	৪-৫৭	৫-০৭	৬-২৩	১১-৪৮	১১-৫১	৩-৩৫	৫-১৪	৬-৩২

wW‡m¤^i

Zvs	mvnix †kl Ki‡e	dR‡ii Avhvb ïi“	m~‡h© v`q	wØcÖni	†Rvn‡ii Avhvb ïi“	Avm‡ii Avhvb ïi“	gvMwi‡ei Avhvb I BdZvi ïi“	Bkvi Avhvb ïi“
০১	৪-৫৮	৫-০৮	৬-২৪	১১-৪৮	১১-৫১	৩-৩৫	৫-১৪	৬-৩২
০৫	৫-০১	৫-১১	৬-২৭	১১-৫০	১১-৫৩	৩-৩৫	৫-১৪	৬-৩৩

১০	৫-০৪	৫-১৪	৬-৩০	১১-৫২	১১-৫৫	৩-৩৬	৫-১৫	৬-৩৪
১৫	৫-০৭	৫-১৭	৬-৩৩	১১-৫৪	১১-৫৭	৩-৩৮	৫-১৭	৬-৩৬
২০	৫-০৯	৫-১৯	৬-৩৬	১১-৫৬	১১-৫৯	৩-৪০	৫-১৯	৬-৩৮
২৫	৫-১২	৫-২২	৬-৩৮	১১-৫৯	১২-০২	৩-৪২	৫-২২	৬-৪১
৩০	৫-১৩	৫-২৩	৬-৪০	১২-০১	১২-০৪	৩-৪৫	৫-২৫	৬-৪৪

সমাপ্ত

শর'ই পর্দা

ভূমিকা

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন মানুষকে আশরাফুল মাখলূকাত হিসাবে সৃষ্টি করেছেন এবং তারই প্রেক্ষিতে তার উপর শরীয়তের গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। আর এ দায়িত্ব পালনের জন্য মানুষের মধ্যে দু'টো শক্তির সমন্বয় ঘটিয়েছেন। তার একটি মনুষত্ব, অপরটি পশুত্ব।

জীবন চলার পথে তাই মানুষ যেন তার পাশবিক শক্তিকে সুশৃঙ্খলভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যথাযথ মর্যাদা সহকারে বেঁচে থাকতে পারে সেজন্য মহান রাব্বুল আ'লা মীন তাদের উপর বিভিন্ন বিধান বিশেষ করে পর্দা ফরয করে দিয়েছেন, যার মাধ্যমে মানুষ যৌন অনাচার ও পাশবিকতা থেকে মুক্তি লাভ করে প্রকৃত আশরাফুল মাকলূকাতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে পারে।

বর্তমানে অধিকাংশ মানুষের পর্দার মাসআলার ব্যাপারে ইলম না থাকায় আশরাফুল মাখলূকাত হিসাবে তার মর্যাদা বজায় থাকছে না। সমাজের এ অভাব দূর করার লক্ষ্যে কিতাবটি প্রকাশ করার জন্য খিদমাত ও

দাওয়াত ফাউন্ডেশন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আল্লাহ তা'আলা এর উসিলায় মুসলিম মিল্লাতকে উপকৃত করুন। আমীন!

বিনীত

লেখক

باسمه تعالى

نحمده ونصلى على رسوله الكريم اما بعد

পর্দার সূচনা

বুখারী শরীফে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত এক রিওয়ায়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত উমর (রা.) একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার কাছে বিভিন্ন ধরনের লোক আসা-যাওয়া করে, আপনি নিজ পত্নীগণকে পর্দা করার আদেশ দিলে খুবই ভাল হত। এ পরিপ্রেক্ষিতে পর্দার আয়াত-

واذا سالتمو هن متاعا فسئلو هن من وراء حجاب الاية অবতীর্ণ হয়। (বুখারী শরীফ-২/ ৭০৬)

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গৃহাভ্যন্তরে নিঃসংকোচে, অবাধে প্রবেশ ও অবস্থানকে নিষেধ করে উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে পর্দা প্রথার সূচনা হয়েছে।

হিজাব বা পর্দা কি? পর্দা হচ্ছে আবরণ। যে আবরণ দিয়ে দেহ আচ্ছাদিত করা হয়। আর দেহকে শর'ঈভাবে আবৃত করার দ্বারাই অন্তরকে পবিত্র রাখা সম্ভব। দেহ বাদ দিয়ে মনকে খোদাভীতির দ্বারা আচ্ছাদিত করে মন পবিত্র রাখা সম্ভব নয়। তাই কুরআন পাকে ইরশাদ হয়েছে- 'পর্দা তোমাদের ও তাদের (মহিলাদের) অন্তকরণ পবিত্র রাখার সর্বোত্তম ব্যবস্থা।' (সূরা আহযাব-৫৩)

পর্দার ব্যাপারে কুরআনের বিধান

(১) আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

واذا سالتمو هن متاعا فسئلو هم من وراء حجاب الاية

এ আয়াতের শানে নুযূলের বর্ণনায় বিশেষভাবে নবীপত্নীগণের

উল্লেখ থাকলেও এ বিধান সমগ্র উম্মতের জন্যে নাযিল হয়েছে। (মা'আরিফুল কুরআন-৭/ ১৩১)

উক্ত আয়াতের বিধানের সারমর্ম এই যে, বেগানা মহিলাদের নিকট থেকে পর পুরুষদের কোন ব্যবহারিক বস্তু, পাত্র ইত্যাদি নেয়া জরুরী হলে পুরুষগণ সামনে এসে নেবে না; বরং পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। আরও বলা হয়েছে যে, পর্দার এই বিধান পুরুষ ও নারী উভয়ের অন্তরকে শয়তানের কু-মন্ত্রণা থেকে পবিত্র রাখার উদ্দেশে দেয়া হয়েছে। (সূরা আহযাব-৫৩)

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, উক্ত আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুণ্যাত্মা পত্নীগণকে পর্দার বিধান দেয়া হয়েছে, যাদের অন্তরকে পাক-সাফ রাখার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। যেমন ইরশাদ হয়েছে-

انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهر كم تطهيرا

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা তো কেবল তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে চান। (সূরা আহযাব, ৩৩)

অপরদিকে যে সব পুরুষকে সম্বোধন করে এই বিধান দেয়া হয়েছে, তারা হলেন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কিরাম, যাদের মর্যাদা নবীগণের (আ.) পরে সকলের ঊর্ধ্বে। সকল মুসলমান, গাওস, কুতুব ও আবদালের মর্তবা একজন সর্বনিম্ন সাহাবীর সমান হতে পারে না, এ কথার উপর উম্মতের ইজমা হয়ে গেছে; কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁদের আন্তরিক পবিত্রতা রক্ষা এবং শয়তানের কু-মন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্যে পুরুষ ও নারী সাহাবা (রা.)গণের মধ্যে পর্দার ব্যবস্থা করা জরুরী ঘোষণা করা হয়েছে।

আজ এমন কোন পুরুষ আছে, যে তার মনকে সাহাবায়ে কিরামের মন অপেক্ষা এবং এমন কোন মহিলা আছে যে, তার মনকে পুণ্যাত্মা নবী পত্নীগণের মন অপেক্ষা অধিক পবিত্র হওয়ার দাবী

করতে পারে? আর এটা কিভাবে হতে পারে যে, নারীদের সাথে তাদের মেলামেশা কোন অনিষ্টের কারণ হবে না?

(মা'আরিফুল কুরআন-৭/ ২০০)

(২) আরো ইরশাদ হয়েছে-

وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى

অর্থ : (হে মুমিন মহিলাগণ!) তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং পূর্বের জাহিলী যুগের ন্যায় নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বের হবে না।

(সূরা আহযাব-৩৩)

উক্ত আয়াতে পর্দা সম্পর্কিত আসল হুকুম এই যে, নারীগণ গৃহেই অবস্থান করবে। অর্থাত, জরুরী প্রয়োজনে শর'ঈ অনুমতি ব্যতীত তারা বাইরে বের হবে না। সাথে সাথে একথাও বলা হয়েছে যে, যেভাবে ইসলামপূর্ব অজ্ঞ ও অন্ধ যুগে নারীরা প্রকাশ্যভাবে বেপর্দায় চলাফেরা করত, তোমরা কখনো সে রকম চলাফেরা করো না।

বর্ণিত আয়াতে পর্দা সম্পৃক্ত দু'টি বিষয় জানা গেল-

প্রথমতঃ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার নিকট নারীদের বাড়ী থেকে বের না হওয়াই কাম্য। গৃহকর্ম তথা গৃহের আভ্যন্তরীণ কর্ম সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এতেই তারা পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করবে। যেমন স্বামীর সেবা যত্ন, সন্তানদেরকে দ্বীনী ও কুরআনী তা'লীম, স্বামীর সংসার ও সম্পদের সংরক্ষণ, মহিলা মহলে দ্বীনের দাওয়াত ও তা'লীম এবং নিজের ইবাদত বন্দেগীই তার জীবনের মূল লক্ষ্য।

দ্বিতীয়ত : শর'ঈ প্রয়োজনের তাকীদে যদি নারীকে বাড়ী থেকে বের হতেই হয়, তাহলে তার বের হওয়া জায়েয আছে বটে, তবে শর্ত হল যেন সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে বের হয়। বরং চেহারাসহ গোটা শরীর আবৃত করে ফেলে, এমন বোরকা অথবা এমন বড় আকারের চাদর ব্যবহার করে বের হবে।

(মা'আরিফুল কুরআন, ৭/ ১৩৩)

(৩) কুরআন শরীফে আরো ইরশাদ হয়েছে-

ينساء النبى لستن كاحد من النساء الخ

অর্থ : হে নবী পত্নীগণ! (উদ্দেশ্য উম্মতের সকল মহিলা) (মা'আরিফুল কুরআন, ৭/ ১৩১) তোমরা অন্য নারীদের মত নও। যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাহলে পরপুরুষের সাথে এমন কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না, যার ফলে যে ব্যক্তির অন্তরে ব্যাধি রয়েছে সে কু-বাসনা করবে। আর তোমরা সঙ্গত কথাবার্তা বলবে। (সূরা আহযাব, ৩২)

উক্ত আয়াতটিও নারীদের পর্দা সম্পর্কিত, তাদের কন্ঠ ও বাক্যালাপ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আয়াতে فلاتخضعن بالقول এর ব্যাখ্যা হচ্ছে যদি, পরপুরুষের সাথে পর্দার অন্তরাল থেকে কথা বলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তাহলে বাক্যালাপের সময় নারী কন্ঠের স্বভাবসুলভ কোমলতা ও নাজুকতা কৃত্রিমভাবে পরিহার করবে। অর্থাত, এমন কোমলতা যা শ্রোতার মনে অবাঞ্ছিত কামনা সঞ্চার করে, তার কোন সুযোগ দিবে না। যেমন এর পরে ইরশাদ হয়েছে- فيطمع الذى فى قلبه مرض অর্থাত, এরূপ কোমল কন্ঠে বাক্যালাপ করেনা, যা ব্যাধিগ্রস্ত অন্তর বিশিষ্ট লোকের মনে কু-লালসা ও আকর্ষণ সৃষ্টি করে।

মোদ্দাকথা, নারীদেরকে পরপুরুষ থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে পর্দার এমন উন্নত স্তর অর্জন করা উচিত, যাতে কোন অপরিচিত দূর্বল ঈমান বিশিষ্ট লোকের অন্তরে কোন কামনা ও লালসা সৃষ্টি করা তো দুরের কথা, তার নিকটেও ঘেঁষবে না। বরং তার বিরুদ্ধ অবস্থা ও পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

(মা'আরিফুল কুরআন-৭/ ১৩২)

স্বর্ণযুগের সোনার মানুষ পুণ্যাত্মা নবীপত্নীগণকে যদি স্বর্ণযুগের স্বর্ণমানব সাহাবায়ে কিরামের সাথে পর্দার আড়াল সত্ত্বেও কথা

বলার ক্ষেত্রে এমন কড়া নির্দেশ দেয়া হয়ে থাকে যে, তাদের কন্ঠ ও বাক্যালাপও নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। তাহলে আধুনিক যুগের নারী-পুরুষদের কি পর্দার প্রয়োজন নেই? অথবা পর্দার প্রয়োজন থাকলেও তাদের কন্ঠ ও বাক্যালাপ নিয়ন্ত্রণ রাখার প্রয়োজন নেই? অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে, যা বলার অপেক্ষা রাখে না; বরং বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণের পর সে প্রয়োজন আরো তীব্রভাবে অনুভূত হয়।

(৪) অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

يايها النبى قل لازواجك وبنتك ونساء ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن الخ

অর্থ : হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মু'মিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের বড় চাদরের বিশেষ অংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে (আযাদ মহিলা হিসাবে) চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে কেউ কষ্ট দিবে না। (সূরা আহযাব-৫৯)

উল্লেখিত আয়াতেও নারীদেরকে পর্দার আদেশ দেয়া হয়েছে। আয়াতে বলা হয়েছে- فلا يؤذين অর্থাত, সমস্ত শরীর পর্দায় আবৃত রাখার ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। এতে প্রতীয়মান হয় যে, পর্দাই নারী জাতির নিরাপত্তার রক্ষা কবচ।

(৫) অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنت غير مسفحت ولا متخذات اخدان

অর্থ : অতএব, তোমরা তাদেরকে তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে বিবাহ কর এবং নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে মোহরানা প্রদান কর। এমতাবস্থায় যে, তারা সতী-সাধ্বী হবে, ব্যভিচারিণী এবং গোপনবন্ধুত্ব গ্রহণকারিণী হবে না।

(সূরা নিসা-২৫)

(৬) আরো ইরশাদ হয়েছে-

والمحصنت من المؤمنين و المحصنت من الذين اوتوا الكتب من قبلكم
اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسفحين ولا متخذى اخدان

অর্থ : তোমাদের জন্য হালাল সতী-সাধ্বী মুসলমান নারী এবং তাদের সতী-সাধ্বী নারী, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তোমাদের পূর্বে, যখন তোমরা তাদেরকে মোহরানা প্রদান করে বিবি বানিয়ে নাও। যিনা ব্যভিচারে লিপ্ত না হও এবং গোপনে তাদের সাথে সম্পর্ক না রাখ অর্থাত গুপ্ত প্রেমে লিপ্ত না হও।

(সূরা মায়েদা-৫)

উক্ত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তা'আলা পুরুষ ও মহিলাদের উভয়কেই ব্যভিচারিতা এবং বিবাহপূর্ব অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হতে নিষেধ করেছেন, যা পর্দা প্রথা রক্ষার কুরআনী নির্দেশ।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষ মহিলাদের অবাধ মেলামেশা সহশিক্ষার কুফলে আজ বিবাহপূর্ব অবৈধ প্রেম-প্রীতি ও যিনা-ব্যভিচারে সয়লাব হচ্ছে এবং কুরআনের নিষেধাজ্ঞার সরাসরি বিরোধিতা করে আল্লাহর গযব নাযিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পর্দার হুকুম হাদীসের আলোকে :

(১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান-

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والدخول على انساء فقال رجل من الانصار يا رسول الله افرأيت الحمو قال الحمو الموت

অর্থ : খবরদার! তোমরা বেগানা স্ত্রীলোকের ঘরে প্রবেশ করো না। তখন জনৈক সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! স্ত্রী লোকদের জন্য স্বামীর ভাই বেরাদারদের (যেমন- দেবর, ভাশুর, বেয়াই) সম্পর্কে কি নির্দেশ? নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তারা তো স্ত্রীর জন্য মৃত্যুতুল্য। অর্থাত, মহাবিপদ তুল্য। (তিরমিযী শরীফ-১/ ২২০)

উল্লেখিত হাদীসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীর শ্বশুরালয়ের আত্মীয়দেরকে মৃত্যুর সাথে তুলনা করেছেন। মৃত্যুকে মানুষ যেমন ভয় পায়, বেপর্দার গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য এ সমস্ত আত্মীয়কে তেমন ভয় করতে বলা হয়েছে। তাই মহিলাদের জন্য দেবর, ভাশুর, বেয়াই প্রমুখ শ্বশুরালয়ের সকল গায়রে মাহরাম আত্মীয়ের সাথে কঠোরভাবে পর্দা করা একান্ত অপরিহার্য।

পর্দা তো সকল পরপুরুষের সাথেই করা অপরিহার্য। কিন্তু শ্বশুরালয়ের আত্মীয়দেরকে মৃত্যুর সাথে তুলনা করা হয়েছে এই কারণে যে, এ সকল আত্মীয়কে আপন মনে করে গৃহের ভিতর প্রশ্রয় দেয়া হয় এবং নিঃসংকোচে খোলামেলাভাবে দেখা-সাক্ষাত ও হাসি-তামাশা করা হয়। যার পরিণাম হয় ভয়াবহ।

বলাবাহুল্য, একজন অপরিচিত পুরুষের পক্ষে কোন বেগানা স্ত্রী লোকের উপর লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা ততটুকু সহজ হয় না, যতটুকু সহজ হয় এ সকল আত্মীয়ের পক্ষে।

তাই সকল স্ত্রী লোকের জন্য জরুরী সর্বপ্রকার পরপুরুষের সাথে পর্দা করার পাশাপাশি এ ধরনের গায়রে মাহরাম পুরুষ আত্মীয়দের থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আড়াল করে রাখা। আর এ সমস্ত পুরুষেরও কর্তব্য নিকট আত্মীয়ের বিবিদের থেকে কঠোরভাবে পর্দা করা।

(২) অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

عن ام سلمة رضـ انها كانت عند رسول الله صلى الله عيله وسلم وميمونة اذ اقبل ابن ام مكتوم رضـ فدخل عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبا منه فقلت يا رسول الله اليس هو اعمى لا يبصرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعميا وان انتما الستما تبصرانه

অর্থ : উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামাহ (রা.) বর্ণনা করেন, আমি এবং মাইমুনা (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম। ইতিমধ্যে অন্ধ সাহাবী হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.) সেখানে আসতে লাগলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বললেন, তোমরা তার থেকে পর্দা কর, আড়ালে চলে যাও। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি তো অন্ধ, আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন না। রাসূল (সা.) ইরশাদ করলেন, তোমরাও কি অন্ধ? তোমরা কি তাকে দেখতে পাচ্ছ না?

(আবু দাউদ শরীফ-২/ ৫৬৮)

উক্ত হাদীস দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, পর্দা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই। কোন পুরুষ যেমন কোন পর নারীর প্রতি তাকাতে পারবে না, কোন নারীও তেমনি কোন পরপুরুষের দিকে তাকাতে পারবে না। এখানে সু-দৃষ্টি আর কু-দৃষ্টিরও কোন পার্থক্য নেই। কারণ, বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.) যেমন একজন পূত স্বভাবের অধিকারী, পুণ্যবান মহান বুযুর্গ সাহাবী; অপরদিকে হযরত উম্মে সালামাহ (রা.) ও মাইমূনা (রা.) উভয়েই হলেন উম্মত-জননী এবং প্রিয়তম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন সঙ্গিনী। সুতরাং এ ক্ষেত্রে কুদৃষ্টির কথা চিন্তাই করা যায় না। তারপরও পর্দা করতে আদেশ করা হয়েছে। কাজেই সহজেই অনুমেয় যে, পর্দা কত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং তা পালন করা কত জরুরী।

(৩) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ ফরমান-

عن ابن عمر رضـ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان

অর্থ : নারী হলো গোপনীয় সত্তা। যখন সে ঘর থেকে বের হয়, তখন শয়তান তার দিকে দৃষ্টি উঁচু করে তাকাতে থাকে। (তিরমিযী শরীফ, ১/ ২২২)

অর্থাত, পরপুরুষদের নযরে তাকে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করে।

উক্ত হাদীসের স্পষ্ট ভাষ্য হলো : পর্দার ভেতর থাকাটাই নারীর জন্যে শোভনীয়। যদি কোন নারী ঘর থেকে বের হয় তখন শয়তান পুরুষদের মনে কু-মন্ত্রণা দেয় এবং মহিলার দ্বারা পুরুষদেরকে ফিতনায় ফেলতে চেষ্টা করে। যেমন এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, ‘মহিলারা শয়তানের জাল’। (রাযীন)

অর্থাত, পুরুষদেরকে গুনাহের মধ্যে লিপ্ত করে আল্লাহ তা‘আলার আযাবে নিপতিত করার জন্য শয়তানের বড় মাধ্যম হল মহিলা। শয়তান যখন গুনাহে লিপ্ত করার সর্বপ্রকার মাধ্যম হতে নিরাশ হয়ে যায়, তখন মহিলাদেরকে ব্যবহার করে।

(৪) আরো ইরশাদ হয়েছে-

عن عائشة رضـ ان اسماء بنت ابى بكر رضـ دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها ثياب وقاق فاعرض عنها وقال يا اسماء ان امرأة اذا بلغت المحيض لن يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا واشار الى وجهه وكفيه-

অর্থ : হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত আসমা (রা.) একবার পাতলা কাপড় পরিহিতা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আগমন করলে তিনি তাঁর দিক থেকে চেহারা ফিরিয়ে নেন এবং বলেন, হে আসমা! কোন মেয়ে যখন সাবালিকা হয় তখন তার মুখমণ্ডল ও হাতের কব্জি ব্যতীত অন্য কোন অঙ্গ খোলা রাখা জায়েয নেই। (আবু দাউদ শরীফ-২/ ৫৬৭)

উল্লেখ্য, অন্য বর্ণনায় বেগানা পুরুষদের সামনে মেয়েদের মুখমণ্ডল ও হাতের কব্জি খোলা রাখতেও নিষেধ করা হয়েছে।

(ফাতাওয়ায়ে রাহীমিয়া-৪/ ১০৬, কিফায়াতুল মুফতী-৫/ ৩৮৮)

যেমন- হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

عن قيس بن شماس وضـ قال جاءت امرأة الى النبى صلى الله عليه وسلم يقال لها ام خلاد وهى متنقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول فقال لها بعص اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم خئت تسألين عن ابنك وانت متنقبة فقالت ان ارزا ابنى فان ارزا حيائ

অর্থ : হযরত কায়স ইবনে শামমাস (রা.) বর্ণনা করেন, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এলো। তাকে উম্মে খাল্লাদ বলে ডাকা হত। তার মুখ ছিল নেকাবে ঢাকা। সে আল্লাহর পথে তার শহীদ পুত্র সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জানতে এসেছিল। তখন তাকে এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তোমার পুত্র সম্পর্কে জানতে এসেছ, আর মুখে নেকাব। তখন হযরত উম্মে খাল্লাদ (রা.) তাকে উত্তরে বললেন, আমি আমার ছেলেকে হারিয়ে এক বিপদে পড়েছি। এখন লজ্জা হারিয়ে তথা মুখমণ্ডলসহ গোটা শরীর পর্দা না করে কি আরেক বিপদে পড়ব?

(আবু দাউদ-১/ ৩৩৭)

উপরোক্ত হাদীস থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, মেয়েদের পর্দা তথা মোটা ও ঢিলা-ঢালা কাপড় দ্বারা চেহারাসহ সমস্ত শরীর ঢেকে রাখা জরুরী। পরপুরুষকে শরীরের কোন অংশ তারা দেখাতে পারবে না।

(৫) অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

عن بريدة رضـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى رضـ يا على لا تتبع النظرة فان لك الاولى وليست لك الاخرة-

অর্থ : হযরত বুরাইদা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে আলী! তুমি হঠাত কোন মহিলার উপর দৃষ্টি পড়ার পর দ্বিতীয়বার ইচ্ছা করে তাকাবে না। কারণ, প্রথমবার অনিচ্ছাকৃত তাকানো তোমার জন্য মাফ হলেও দ্বিতীয়বার ইচ্ছাকৃত তাকানো মাফ নয়।

(আবু দাউদ শরীফ-১/ ২৯২)

চিন্তা করুন, ৪র্থ খলীফা এবং চার তরীকা তথা চিশতিয়া, কাদেরিয়া, নক্‌শবন্দিয়া সোহরাওয়ার্দিয়ার সকল পীরের পীর হযরত আলী (রা.)। তাঁর জন্য হাদীসে পাকে এ নির্দেশ, তাহলে উম্মতের অন্যান্য পুরুষের জন্য পর্দার হুকুম যে কত কঠিন হবে, তা তো সহজেই অনুমেয়।

যুক্তির আলোকে পর্দার প্রয়োজনীয়তা

হাকীমুল উম্মত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর একমাত্র জীবিত খলীফা মুহিউস সুন্নাহ, বর্তমান শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক সাহেব (দা. বা.) বলেন, আপনারা বাজার হতে যখন গোশত বা কোন পণ্য খরীদ করে আনেন, তখন সেটাকে অত্যন্ত হিফাযতের সাথে ঢেকে আনেন, যাতে কাক ইত্যাদি উক্ত গোশত নিতে না পারে। তেমনিভাবে একশত টাকার নোট ভিতরের পকেটে সীনার সাথে মিশিয়ে রাখেন, যাতে চোর পকেট কেটে টাকা নিতে না পারে। খাদ্যদ্রব্যকেও ঢেকে রাখা হয়, যাতে ইঁদুর, বিড়াল ইত্যাদি প্রাণী তা খেয়ে না ফেলে।

এখন আপনারাই বলুন! মহিলাদের মূল্য কি আপনাদের নিকট এক সের গোশত, একশত টাকার নোট বা সামান্য খাদ্যদ্রব্যের মূল্যের চেয়েও কম যে মহিলাদের হিফাযতের জন্য পর্দায় রাখতে আপনারা যত্নবান নন?

অপরদিকে গোশত নিজে উড়ে কাকের নিকট, একশত টাকার নোট চোরের নিকট, খাদ্যদ্রব্য ইঁদুরের গর্তে একা যেতে পারে না। তা সত্ত্বেও এত হিফাযতের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু মহিলাদের তো নিজেদের উড়ার ক্ষমতা রয়েছে অর্থাত, মহিলাদের কারো প্রেমের জালে আবদ্ধ হয়ে পলায়নের ক্ষমতা রয়েছে। এরপরও কি তাদের দ্বীনী তা'লীম ও পর্দার ব্যবস্থা দ্বারা হিফাযতের প্রয়োজন নেই? অনেকেই আমরা নিজেদেরকে বুদ্ধিজীবী দাবী করি। সত্যিকারার্থে

বুদ্ধিজীবী হয়ে থাকলে চিন্তা করে দেখা উচিত যে, মহিলাদেরকে পর্দায় রাখার প্রযোজন আছে কিনা? (মাজালিসে আবরার পৃ. ৩২)

তাছাড়া দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি ও মহিলাদের হিফাযতের জন্যই আল্লাহ তা'আলা পর্দার বিধান চালু করেছেন। পর্দাই নারীর সারা জীবনের নিরাপত্তার চাবিকাঠি। কারণ, মানুষের রূপ-লাবণ্য, সৌন্দর্য ও যৌবন ক্ষণস্থায়ী, যৌবনের রূপ-লাবণ্যের আকর্ষণ বার্ধক্যে আর থাকে না। সুতরাং, স্ত্রী বার্ধক্যে উপনীত হলে তার প্রতি স্বামীর যৌন আকর্ষণ ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে।

এ পরিস্থিতিতে পর্দার বিধান না থাকলে স্বামী রাস্তার বেগানা যুবতী মহিলাদের রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে তার পিছনেই দৌড়াবে, তাদেরকে নিয়েই ব্যস্ত থাকবে, জীবন সঙ্গিনীর কোন খবরই নিবে না। পরিশেষে বৃদ্ধা বয়সে মহিলাদের পরিণাম এই দাঁড়াবে যে, সুখের জীবন আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলবে। বার্ধক্যে তার দেখাশুনার কেউ থাকবে না, অথচ বার্ধক্যে দেখাশুনার প্রয়োজন আরো বেশি।

সুতরাং কুরআন-হাদীস ছাড়াও যুক্তি বা বিবেকের দাবীও এটা যে, পর্দা নারী জাতির ইয্যতকে হিফাযত করে; তাদের জীবনকে করে সুখময়।

তাছাড়া পর্দা কখনো মহিলাদের জন্য অপমানজনক নয়। আপনি স্বর্ণ–রুপা, হিরক খণ্ড কিভাবে লোকচক্ষু থেকে আড়াল করে হিফাযত করেন? আলমারীর সিন্দুক, তার মধ্যে কুঠরী, তার মধ্যে ঐগুলোকে রাখেন। এতে কি ঐসব বস্তুর অবমাননা হয়? না-কি সেগুলো অতিমূল্যবান হওয়া প্রমাণিত হয়? পর্দার বিষয়টি ঠিক অনুরূপ। তাদের অধিক মূল্যবান (এমন কি নবী ওলীগণও তাদের পেটে জন্ম নিয়েছেন) হওয়ায় তাদের হিফাযতের লক্ষ্যে পর্দার হুকুম দেয়া হয়েছে।

পর্দাহীনতার কুফল

পর্দা শরীয়তের অবধারিত ফরয বা অত্যাবশ্যকীয় বিধান। এটা পালন করলে যেমন প্রভূত শান্তি, সম্মান লাভ হয় এবং আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ হয়, তেমনিভাবে এটা লঙ্ঘন করলে হয় অসংখ্য, অপূরণীয় ক্ষতি। পর্দার বিধান লঙ্ঘন করলে ধর্মীয়, আত্মিক, পারিবারিক ও সামাজিক বিভিন্ন অনিষ্ট ও ধ্বংস-বিপর্যয় দেখা দেয়।

বেপর্দা ও বেহায়াপনার গুনাহ শুধু নিজের মধ্যেই সীমিত থাকে না এবং বেপর্দা মহিলাই শুধু এর দ্বারা প্রভাবিত হয় না, বরং এর দ্বারা বেহায়াপনা, অশ্লীলতা, যিনা-ব্যভিচার, ধর্ষণ ইত্যাদি বিস্তার লাভ করে। পুরো সমপ্রদায় এর পার্থিব করুণ পরিণতি এবং আখেরাতের আযাব ভোগ করে।

নারীরা যেহেতু অভিভাবকের অধীনস্থ জীবন-যাপন করে অর্থাত, বিয়ের পূর্বে পিতা ও ভাই, আর বিয়ের পর স্বামী ও পুত্রের তত্ত্বাবধানে থাকে, তাই নারীকে যখন বেপর্দায় চলার দরুন আযাব দেয়া হবে, তখন এই চারজন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পুরুষকে আল্লাহ পাকের দরবারে জবাবদিহি করতে হবে।

মোদ্দাকথা, বেপর্দা চললে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফরমানী বা অবাধ্যতা করা হয়। বেপর্দার দ্বারা কবীরা গুনাহের ভাগী এবং ইবলীস শয়তানের অনুসারী সাব্যস্ত হয়। পর্দাহীনতা দ্বারা মানুষ অভিশপ্ত হয় এবং আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত হয়। পর্দাহীনতা জাহান্নামের পথ। হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী পর্দাহীনতা সমাজে অশ্লীলতা, চারিত্রিক অবক্ষয় ও পশুত্বের খাসলত জন্ম দেয়। নারীদের বেপর্দা চলা ও দেহ প্রদর্শন পুরুষদেরকে অবৈধ ও অশ্লীল কাজের প্রতি উত্তেজিত করে তোলে। ফলে যিনা-ব্যভিচার, ধর্ষণ, অপহরণ, নির্যাতন ইত্যাকার অপরাধ বৃদ্ধি পায়।

পর্দাহীনতার দরুন মানুষ আল্লাহর শাস্তি ও গযব প্রাপ্তির উপযুক্ত

হয়ে উঠে। আর এর পরিণতি আনবিক বোমা ও ভূমিকম্পের চেয়েও বেশি বিপদজ্জনক। পর্দাহীনতা পারিবারিক প্রীতির বন্ধন ছিন্ন করে এবং পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বস্ততা সৃষ্টি করে। পর্দাহীনতা তালাকের প্রসার ঘটার অন্যতম কারণ। এভাবে পর্দাহীনতা আরো বহু অনিষ্ট ও বিপর্যয় ডেকে আনে, যার থেকে বাঁচা একমাত্র পর্দার মাধ্যমেই সম্ভব।

এ ব্যাপারে মুহিউসসুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক সাহেব (দাঃ বাঃ) ২০০৩ ইং বাংলাদেশ সফরকালে একটি ঘটনা শুনান, জনৈক ব্যক্তি তার বিশেষ প্রয়োজনে রাতে ঘুম থেকে উঠলে আপন কন্যার ঘরে আওয়াজ শুনতে পেলেন। প্রথমে ডাকাতির আশংকা করলেন, তাই বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। অতঃপর বন্দুক প্রস্তুত করলেন। এরপর দরজা খোলার পর দেখলেন, প্রতিবেশীর ছেলে তার কন্যার সাথে অপকর্মে লিপ্ত। ক্রোধে তিনি গুলি করে উভয়কে একসঙ্গে হত্যা করলেন। দেখুন বেপর্দা কতগুলো সমস্যার কারণ হল।

সুতরাং, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিধান পালনার্থে বর্ণিত মারাত্মক কুফলসমূহ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্কা নারীর পর্দা করা অপরিহার্য ও ফরয দায়িত্ব।

বস্তুতঃ পর্দাই মানুষের মন, মস্তিষ্ক, পরিবার, সমাজ ও পরিবেশকে সুন্দর, মার্জিত ও সুখময় রাখতে পারে। আর পরকালীন প্রতিদান ও সুখকর পুরস্কার তো রয়েছেই।

পর্দা সংক্রান্ত জরুরী মাসায়িল

মহিলাদের পর্দা করার সময় ও পরিমাণ

মেয়েরা যখন কারীবুল বুলুগ বা বালেগা হওয়ার কাছাকাছি

পর্যায়ে পৌঁছে; অর্থাত, তারা নিজেরা কামভাব অনুধাবন করতে পারে এবং তাদের দিকে তাকালে অন্য পুরুষের মনে কামভাব সৃষ্টি হয়, তখন থেকেই তাদের জন্য পর্দা করা জরুরী হয়ে পড়ে। (আহসানুল ফাতাওয়া, ৮/ ৩৭)

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন, গায়র মাহরাম অনাত্মীয় হলে তাদের থেকে সাত বছর পূর্ব হতেই পর্দা করা উচিত এবং গায়র মাহরাম আত্মীয় হলে সাত বছর থেকেই পর্দা করা উচিত। কারণ, অনেক ক্ষেত্রে সাবালিকা মহিলা সামনে আসা-যাওয়া করাতে এ পরিমাণ ফিতনার আশংকা থাকে না, যে পরিমাণ আশংকা থাকে কারীবুল বুলুগ মেয়েদের সামনে আসা-যাওয়া করাতে। (ইসলাহে খাওয়াতীন- ৩৭২)

মেয়েদের পর্দার পরিমাণ বা ক্ষেত্র দুটি : এক. মাহরাম পুরুষ যথা বাপ, ভাই প্রমুখ হতে পর্দা করা। দুই গায়র মাহরাম পুরুষ যথা চাচাত ভাই, খালাত ভাই ইত্যাদি হতে পর্দা করা। মেয়েদের পরস্পর পর্দা বা সতর যতটুকু তথা নাভী হতে হাটু পর্যন্ত, মাহরাম পুরুষদের ক্ষেত্রে ততটুকু পরিমাণসহ পেট ও পিঠ ঢেকে রাখতে হবে। অর্থাত, মাহরাম পুরুষ বাপ, ভাই, ছেলে ইত্যাদি হতে পুরা শরীর ঢাকা যেমন ফরয নয় তেমনিভাবে পূর্ণ শরীর খোলারও অবকাশ নেই; বরং পেট পিঠসহ নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখা জরুরী। অবশিষ্ট অংশ মাহরাম থেকে ঢাকা জরুরী নয়।

(ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া ৬/ ৩৭৪, ৫/ ২১১২)

আর গায়র মাহরাম বা বেগানা পুরুষ তথা যাদের সাথে বিবাহ বৈধ তাদের সামনে সম্পূর্ণ শরীর ঢেকে পর্দা করা জরুরী। শরীরের কোন অংশ তাদের সামনে প্রদর্শন করা জায়েয নেই। (কিফায়াতুল মুফতী, ৫/ ৩৮৭, ৩৮৯)

উল্লেখ্য, প্রথম যমানায় প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মহিলাদের মুখমণ্ডল ও

দু'হাতের কব্জি, পায়ের পাতা খোলা রাখা তথা পর্দা না করারও অবকাশ ছিল। কিন্তু ফিতনার যমানা হিসাবে উলামায়ে মুতাআখখিরীনের ফাতাওয়া অনুযায়ী পর পুরুষদের সামনে মহিলাদের সম্পূর্ণ শরীর ভালভাবে ঢেকে রাখা জরুরী।

(ফাতাওয়ায়ে রাহীমিয়া-৪/ ১০৬, কিফায়াতুল মুফতী, ৫/ ৩৮৮)

মেয়েদের মুখমণ্ডলসহ সম্পূর্ণ শরীর ঢেকে পর্দা করার ব্যাপারে ফকীহগণের উক্তি নিম্নে প্রদত্ত হল

আল্লামা শামসুল আইম্মা সারাখসী (রহ.) লিখেন, নারীর মুখমণ্ডল দেখলে কু-খেয়াল ও কামভাব সৃষ্টি হতে পারে। এজন্য নারীর কোন অঙ্গের দিকেই দৃষ্টিপাত করা জায়েয নয়। (আল মাবসূত, ১০/ ১৬০)

আল্লামা ইবনে আবিদ্বীন শামী (রহ.) লিখেন, বর্তমান ফিতনার যুগে কোন অবস্থাতেই নারীর কোন অঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত করা জায়েয নয়। তবে অপরিহার্য কোন পর্যায়ে দৃষ্টিপাত করা ভিন্ন কথা। যেমন চিকিতসক, বিচারক বা সাক্ষী, যারা কোন ব্যাপারে নারীকে দেখে সাক্ষ্য বা ফয়সালা দিতে বাধ্য হয়।

(ফাতাওয়ায়ে শামী, ৬/ ৩৭০)

উক্ত কিতাবের নামায অধ্যায়ে বলা হয়েছে, নারীদের মুখমণ্ডল বেগানা পুরুষের সামনে খোলা নিষিদ্ধ। (ফাতাওয়ায়ে শামী, ১/ ৪০৬)

হযরত মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) বলেন : চার মাযহাবের সকল ইমামের ঐকমত্যে মহিলাদের জন্য পর্দার কাপড়, বোরকা, বড় চাদর ইত্যাদি দ্বারা সমস্ত দেহ ও মুখণ্ডল আবৃত করে রাখা অপরিহার্য। (মা'আরিফুল কুরআন, ৭/ ২২০)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মহিলাদের জন্য

গায়র মাহরাম পুরুষদের সামনে বা রাস্তা-ঘাটে চলার সময় চেহারা খোলা রাখা নাজায়েয। তেমনিভাবে উভয় হাতে মোজা পরিধান করে বের হওয়া এবং উত্তম হল পায়েও মোজা পরিধান করা, পা খোলা না রাখা।

(হিদায়া, ৪/ ৪৫৮, তালীফাতে রশীদিয়া, ৪৮৫, ইমদাদুল ফাতাওয়া, ৪/ ১২৪)

অবশ্য মহিলাদের নির্জনে নামায পড়ার সময় তার মুখমণ্ডল, হাতের কব্জি ও পায়ের পাতা সতর নয়। সুতরাং নামাযে তা ঢাকা জরুরী নয়।

(কিফায়াতুল মুফতী, ৫/ ৪৩১)

পর্দার স্তর বিন্যাস

যুগশ্রেষ্ঠ আলেম, সময়ের খ্যাতনামা সংস্কারক, হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানভী (রহ.) কুরআন ও সুন্নাহ-এর ভিত্তিতে মুসলিম মহিলাদের জন্য পর্দাকে তিনটি স্তরে বিন্যাস করেছেন। চাই সে যুবতী হোক বা বৃদ্ধা।

সর্বনিম্নস্তর : মুখমন্ডল, হাতের কব্জি এবং পায়ের পাতা ব্যতীত নারীর সমুদয় দেহ পর্দাবৃত রাখা।

মাধ্যমিক স্তর : মুখমণ্ডল, হাত এবং পাসহ সবকিছুই বোরকা দ্বারা আবৃত রাখা।

সর্বোচ্চ স্তর : নারী তার শরীর আবৃত রাখার সাথে সাথে নিজেও পর্দার আড়ালে এমনভাবে থাকা যে, না-মাহরাম পুরুষের দৃষ্টি তার পরিধেয় বস্ত্রের উপরও পতিত না হয়।

প্রত্যেক স্তর কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ও অনুমোদিত। নিম্নে তার কিঞ্চিত আলোকপাত করা হল।

প্রথম স্তর সম্পর্কে কুরআনে পাকে ইরশাদ হচ্ছে-

ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها

অর্থ : মু'মিন নারীরা যেন সাধারণত যা প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের আবরণ প্রদর্শন না করে। (সূরা-নূর, ৩১)

উল্লেখিত আয়াতে ماظهر منها মুফাসসিরগণ লিখেছেন, এর মর্ম হল, মুখমণ্ডল ও কব্জি পর্যন্ত উভয় হাত। অর্থাত মহিলারা প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মুখমণ্ডল ও উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত খালা রাখতে পারবে। শরীরের অন্য কোন অংশ খোলা রাখতে পারবে না। ফুকাহায়ে কিরাম কিয়াস করে নারীদের উভয় পায়ের পাতাকেও এই দু'অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। (তাফসীরে মাযহারী, ৬/ ৪৯৩)

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে- يا اسماء ان المرأة اذا بلغت الخ

অর্থ : হে আসমা! কোন মেয়ে যখন সাবালিকা হয়, তখন বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া তার মুখমণ্ডল ও হাতের কব্জি ব্যতীত অন্য কোন অঙ্গ প্রকাশ করা জায়েয নেই। (আবু দাউদ শরীফ, ২/ ৫৬৭)

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস শরীফের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মহিলাদের মুখমন্ডল, উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত এবং পায়ের পাতা ব্যতীত সম্পূর্ণ শরীর ঢেকে রাখা ফরয বা জরুরী, যা পর্দার সর্বনিম্নস্তর।

দ্বিতীয় স্তর সম্পর্কে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- يدنين عليهن من جلابيبهن

অর্থ : মহিলারা যেন নিজেদের উপর চাদর টেনে দেয়।

(সূরা আহযাব, ৫৯)

উল্লেখিত আয়াতে يدنين শব্দটি ادناء থেকে উদ্ভূত। এর শাব্দিক অর্থ নিকটে আনা। جلابيب শব্দটি جلباب এর বহুবচন। অর্থ বিশেষ ধরনের লম্বা চওড়া চাদর। এই চাদরের আকার আকৃতি সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, এই চাদর উড়নার উপর পরিধান করা হয়।

(তাফসীরে ইবনে কাসীর ৩/ ৫২৬)

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহ.) বলেন, আমি হযরত উবায়দা সালমানী (রহ.)-কে এই আয়াতের উদ্দেশ্য এবং বড় চাদরের আকার আকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কলে তিনি মস্তকের উপর দিক থেকে চাদর মুখমণ্ডলের উপর লটকিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে ফেললেন এবং ادناء ও جلباب এর তাফসীর বাস্তবে দেখিয়ে দিলেন। উক্ত আয়াত পরিষ্কারভাবে মুখমণ্ডল আবৃত করার আদেশ ব্যক্ত করেছে। তবে রাস্তা দেখার জন্যে এক্ষেত্রে এক চোখ খোলা রাখার অবকাশ আছে। অবশ্য কালো জর্জেটের নেকাব হলে কোন চোখ খোলার প্রয়োজন নেই।

(মা'আরিফুল কুরআন-৭/ ২৩৩)

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

فقالت يا رسول الله اعلى احدنا بأس اذا لم يكن لها جلباب الا تخرج فقال لتلبسها صاحبتها من جلبا بها

অর্থ : জনৈকা মহিলা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে কারো যদি বড় চাদর না থাকে তখন ঈদের নামাযের জন্য কিভাবে ইদগাহে যাবে? (তখন মহিলাদের ঈদের জামা'আতে যাওয়ার অনুমতি ছিল, বর্তমানে ফিতনার কারণে ওয়াক্তিয়া জুম'আ ও ঈদের জামা'আতে যাওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ। কিফায়াতুল মুফতী, ৫/ ৩৮৮) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমালেন, উক্ত মহিলার সাথী যেন স্বীয় চাদর দ্বারা তাকে আবৃত করে নেয়।

(বুখারী শরীফ, ১/ ৪০, ১৩৪)

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসের দ্বারা পর্দার দ্বিতীয় স্তর প্রমাণিত হল। অর্থাত প্রয়োজনের তাকিদে ঘর হতে বের হওয়ার সময় বড় চাদর বা বোরকা ইত্যাদি দ্বারা সমস্ত শরীর ঢেকে বের হওয়া। এ ব্যাপারে আরো কতিপয় শর্ত সামনে উল্লেখ করা হচ্ছে।

পর্দার তৃতীয় স্তর সম্পর্কে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى

অর্থ : তোমরা (মুসলিম মহিলাগণ) নিজ গৃহে অবস্থান করবে, বর্বর যুগের মহিলাদের ন্যায় নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বের হবে না। (সূরা আহযাব, ৩৩)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে- واذا سألتموهن متاعا فسئلو هن من وراء حجاب

অর্থ : যখন তোমরা মহিলাদের নিকট কোন খাদ্য সামগ্রী ইত্যাদি চাইবে তখন পর্দার আড়াল থেকে চাও। (সূরা আহযাব, ৫৩)

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- المرأة عورة فاذا خرجت استشر فها الشيطان

অর্থ : মহিলারা গোপন বস্তু, পর্দায় থাকার যোগ্য। তারা যখন ঘর থেকে বের হয় তখন শয়তান তার দিকে দৃষ্টি উঁচু করে তাকাতে থাকে। অর্থাত তার পিছনে লেগে যায় এবং বেগানা পুরুষদের সামনে তাকে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করে। (তিরমিযী শরীফ, ১/ ২২২)

উল্লেখিত আয়াতদ্বয় ও হাদীসের দ্বারা পর্দার তৃতীয় স্তর প্রমাণিত হল। অর্থাত, মহিলারা ঘরে অবস্থান করবে, কথার প্রয়োজন হলে পর্দার আড়াল থেকে কর্কশ ভাষায় বলবে, যাতে না মাহরাম পুরুষের দৃষ্টি মহিলাদের কাপড়েও পড়তে না পারে এবং তাদের দিলের মধ্যে কু-লোভ সৃষ্টি না হতে পারে।

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পর্দার ক্ষেত্রে মূল এবং শরীয়তের মুখ্য উদ্দেশ্য পর্দার তৃতীয় স্তরই। পর্দার দ্বিতীয় স্তরকেও (মুখমণ্ডল ও হাত-পা ঢেকে বের হওয়া) ফুকাহায়ে কিরাম জরুরী প্রয়োজনের সময় জায়েয বলেছেন। কিন্তু বিভিন্ন হাদীসে এ ব্যাপারে আরো কয়েকটি নির্দেশও বর্ণিত হয়েছে। যথা : সমস্ত শরীর আবৃত করে বের হওয়ার সময় উন্নতমানের আকর্ষণীয় লেবাস পরিধান করবে না; খুশবু ব্যবহার না করা, আওয়াজ সম্পন্ন অলংকারাদি ব্যবহার না করা, রাস্তার কিনারা ঘেঁষে চলা, ইত্যাদি।

তবে বিশেষ প্রয়োজন ও ঠেকার ক্ষেত্রে ফিতনার আশংকা না

থাকলে অর্থাত অতিশয় বৃদ্ধাদের ব্যাপারে পর্দার নিম্ন স্তরেরও অবকাশ রয়েছে। (মা'আরিফুল কুরআন,৭/ ২১৩, ইমদাদুল ফাতওয়া, ৪/ ১৮১, ইসলাহে খাওয়াতীন, ৩৪৩)

অবশ্য ফিতনার আশংকা কোথায় আছে আর কোথায় নেই, তা নির্ধারণের দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর ছেড়ে দেননি, বরং তিনি নিজেই তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

ইরশাদ হয়েছে- والقواعد من النساء التى لا يرجون نكاحا الخ

অর্থ : বৃদ্ধা নারী যারা বিবাহের আশা রাখে না, যদি তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে আলাদা পর্দার বস্ত্র খুলে রাখে, তাতে তাদের কোন দোষ নেই। তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা নূর, ৬০)

অর্থাত, যে সব নারীর ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গেছে এবং তারা আর বিবাহের উপযুক্ত নয়, বা বিবাহের আশা রাখে না। তারাই এই আয়াতের আলোচ্য নারী সমাজ। সেক্ষেত্রে তারা যদি তাদের পরিধেয় বস্ত্রের উপরের বড় চাদর বা বোরকা খুলে রাখে, তাহলে তাদের কোন ক্ষতি নেই।

উক্ত আয়াতের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, ফিতনার আশংকা শুধু ঐসব বৃদ্ধা মহিলাদের মধ্যে নেই, যারা রূপ-লাবণ্য হারা হয়ে বিবাহের উপযুক্ত নয়। তারা ব্যতীত যুবতী কিংবা মাঝবয়সী নারীদের মধ্যে ফিতনার আশংকা নেই, এ কথা বলা হয়নি; বরং তাদের মধ্যে ফিতনার পূর্ণ আশংকা রয়েছে। আর এই ফিতনার কারণেই তাদের জন্য মাধ্যমিক ও সর্বোচ্চ স্তরের পর্দা জরুরী হওয়ার বিধান দেওয়া হয়েছে।

শরীয়তের দৃষ্টিতে যুবতী এবং মাঝবয়সী মহিলাদের ব্যাপারে ফিতনার আশংকা সুস্পষ্ট। সুতরাং, একথা বলার কোন অবকাশ নেই যে, তাদের মধ্যে ফিতনার আশংকা নেই। কারণ আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন-

وما كان لمؤمن و لا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخير من امرهم-

অর্থ : আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কাজের আদেশ করলে বা কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্নমত পোষণের অবকাশ নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ অমান্য করবে। (সূরা আহযাব, ৩৬)

মোদ্দাকথা, সর্বনিম্ন স্তরের পর্দা ফরয বা জরুরী হওয়ার জন্য ফিতনার আশংকার কোন শর্ত নেই বরং সর্বাবস্থায়ই যুবতী ও মাঝবয়সী মহিলাদের জন্য তা ফরয।

আর মাধ্যমিক ও সর্বোচ্চ স্তরের পর্দা ফরয হওয়ার জন্য ফিতনার আশংকা হওয়ার শর্ত রয়েছে। আর ফিতনার আশংকা শুধু অতিশয় বৃদ্ধা মহিলাদের মধ্যে নেই। বরং যুবতী ও মাঝবয়সী নারীদের মধ্যে ফিতনার আশংকা রয়েছে। সুতরাং, যুবতী এবং মাঝবয়সী নারীদের সম্পূর্ণ শরীর ঢেকেই পর্দা করা ফরয।

(ইসলাহে খাওয়াতীন-৩৪১-৩৪৫)

পর্দার শর্তাবলী

পর্দার উদ্দেশ্য হল সম্পূর্ণ শরীরকে পরপুরুষ থেকে আড়ালে বা ঢেকে রাখা, যাতে পরপুরুষের মনে নারীদের সৌন্দর্য দেখে কু-কামনা-বাসনা সৃষ্টি না হয়। এ উদ্দেশে সফলতা লাভের জন্য নিম্নে পর্দার কয়েকটি শর্ত প্রদত্ত হল :

(১) মহিলাদের এ ধরনের কাপড় পড়া উচিত, যা সম্পূর্ণ শরীরকে আবৃত করে নেয়, যাতে মাথা থেকে পা পর্যন্ত কোন অংশই দৃষ্টিগোচর হয় না। হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আসমা (রা.)-কে পাতলা কাপড়

পরিহিত অবস্থায় দেখে বলেছিলেন, হে আসমা! মহিলারা বালিগ হওয়ার পর শরীরের কোন অংশ দৃষ্টিগোচর না হওয়াই সমীচীন। (আবু দাউদ, ২/ ৫৬৭)

(২) পর্দার কাপড় বা বোরকা ইত্যাদি ডিজাইন ও ফ্যাশন সম্পন্ন না হওয়া। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- ولا يبدين زينتهن

অর্থ : মহিলারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। (সূরা নূর-৩১)

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে–وقرن فى بيوتكن الخ

অর্থ : মহিলারা যেন নিজ গৃহে অবস্থান করে, বর্বর যুগের ন্যায় নিজেদেরকে প্রদর্শন করে চলাফেরা না করে। (সূরা নূর-৩৩)

(৩) তাদের পরিহিত কাপড় মোটা হওয়া চাই। পাতলা না হওয়া চাই যেন শরীরের গঠন আকৃতি দৃষ্টিগোচর হয়ে উঠে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের শেষপর্বে কিছু মহিলার আবির্ভাব হবে, যারা পোশাক পরেও উলঙ্গ থাকবে। তাদের মস্তক উটের পিঠের কুঁজের মত হবে। তারা জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। (মুসলিম শরীফ-২/ ২০৫)

(৪) কাপড় বা বোরকা ঢিলা-ঢালা হওয়া উচিত। শরীরের সাথে আঁটসাঁট হয়ে লেগে থাকার দরুন শরীর কাঠামো প্রদর্শিত হয় এমন কাপড় পরা নিষেধ।

(আহসানুল ফাতাওয়া-৮/ ২৮)

(৫) কোন আতর, সেন্ট, লিপস্টিক মেখে, অলংকার ও জাকজমকপূর্ণ পোশাক ব্যবহার করে বের হওয়া নিষেধ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মহিলারা যখন সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করে কোন সমাবেশের নিকট দিয়া যাতায়াত করে, তখন সে ব্যভিচারিণী মহিলা বলে বিবেচিত হয়। (তিরমিযী ২/ ১০৭)

(৬) মহিলারা পুরুষ সাদৃশ্য পোশাক পরিধান করবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম্ রিশাদ করেন, ঐ সব পুরুষ আমার দলভুক্ত নয়, যারা মহিলা সাদৃশ্য পোশাক পরে এবং ঐ সব মহিলা আমার দলভুক্ত নয়, যারা পুরুষ সাদৃশ্য পোশাক ব্যবহার করে। (বুখারী শরীফ-২/ ৮৭৪)

(৭) মু'মিন মহিলারা কাফের মহিলাদের আকার আকৃতি বা তাদের গঠন প্রকৃতির অনুগামী না হওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যারা যে সমপ্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করে তারা তাদের দলভুক্ত।

(আবু দাউদ-২/ ৫৫৯)

(৮) রিয়া বা লোক দেখানোর জন্য কোন পোশাক ব্যবহার করবে না। হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে : যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধি লাভের আশায় কোন পোশাক পরিধান করল, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে বেইজ্জতীর পোশাক পরিধান করাবেন এবং তার দ্বারা আগুন প্রজ্বলিত করবেন।

(আবু দাউদ-২/ ৫৫৮, ইবনে মাজাহ-২৫৭)

পুরুষগণ কোন্ ধরনের মহিলার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারবে

পুরুষগণ নিম্নে বর্ণিত ১৪ শ্রেণীর মহিলাদের সাথে দেখা সাক্ষাত করতে পারবে এবং তাদেরকে বিবাহ করা হারাম।

(১) আপন মা।

(২) আপন দাদী, নানী ও তাদের ঊর্ধ্বতন মহিলাগণ।

(৩) সহোদর বোন, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় বোন।

(৪) আপন মেয়ে, ছেলের মেয়ে, মেয়ের মেয়ে এবং তাদের গর্ভজাত যে কোন কন্যা সন্তান ও আপন ছেলে সন্তানদের স্ত্রী।

(৫) যে স্ত্রীর সঙ্গে দৈহিক মিলন সংঘটিত হয়েছে তার পূর্ববর্তী বা পরবর্তী স্বামীর কন্যা সন্তান এবং স্ত্রীর মা অর্থাত, শাশুড়ী, নানী শাশুড়ী ও দাদী শাশুড়ী।

(৬) ফুফু অর্থাত, পিতার সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় বোন।

(৭) খালা অর্থাত, মায়ের সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় বোন।

(৮) ভাতিজী অর্থাত, সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাইয়ের মেয়ে ও তাদের অধঃস্তন কন্যা সন্তান।

(৯) ভাগ্নী অর্থাত, সহোদর, বৈমাত্রেয়, বৈপিত্রেয় বোনের মেয়ে ও তাদের অধঃস্তন কন্যা সন্তান।

(১০) দুধ সম্পর্কীয় মেয়ে, মেয়ের মেয়ে, ছেলের মেয়ে ও তাদের অধঃস্তন কোন কন্যা সন্তান এবং দুধ সম্পর্কীয় ছেলের স্ত্রী।

(১১) দুধ সম্পর্কীয় মা, খালা, ফুফু, নানী, দাদী ও তাদের ঊর্ধ্বতন মহিলাগণ।

(১২) দুধ সম্পর্কীয় বোন, দুধ বোনের মেয়ে, দুধ ভাইয়ের মেয়ে এবং তাদের গর্ভজাত যে কোন কন্যা সন্তান।

(১৩) যৌন শক্তিহীন এমন বৃদ্ধা, যার প্রতি পুরুষের কোন প্রকার আকর্ষণ নেই।

(১৪) অপ্রাপ্ত বয়স্কা এমন বালিকা, যার প্রতি পুরুষদের এখনো যৌন আকর্ষণ সৃষ্টি হয়নি।

উল্লেখ্য, ১৩ ও ১৪ নং বর্ণিত মেয়েদের সাথে বিবাহ জায়েয আছে।

উপরোক্ত মহিলাগণ ব্যতীত পুরুষের জন্য অন্য কোন মহিলার সাথে দেখা-সাক্ষাত মোটেও জায়েয নয়, বরং সম্পূর্ণ নাজায়েয ও হারাম।

(সূরা নিসা ২৩, তাফসীরে মাযহারী-২/ ২৫৪, মা'আরিফুল কুরআন, ২/ ৩৫৬-৩৬১)

মহিলাগণ কোন্ ধরনের পুরুষের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারবে

মহিলাগণ নিম্নে বর্ণিত ১৪ শ্রেণীর পুরুষদের সাথে দেখা-সাক্ষাত করতে পারবে এবং তাদের সাথে বিবাহ হারাম।

(১) পিতা, দাদা, নানা ও তাদের ঊর্ধ্বতন পুরুষগণ।

(২) সহোদর ভাই, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাই।

(৩) শ্বশুর, আপন দাদা শ্বশুর ও নানা শ্বশুর এবং তাদের ঊর্ধ্বতন পুরুষগণ।

(৪) আপন ছেলে, ছেলের ছেলে, মেয়ের ছেলে এবং তাদের ঔরসজাত পুত্র সন্তান।

(৫)স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র।

(৬) ভাতিজা অর্থাত, সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাইয়ের ছেলে ও তাদের অধঃস্তন কোন ছেলে।

(৭) ভাগিনা অর্থাত, সহোদর, বৈমাত্রেয়, বৈপিত্রেয় বোনের ছেলে ও তাদের অধঃস্তন কোন ছেলে।

(৮) আপন চাচা অর্থাত বাপের সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাই।

(১০) দুধ সম্পর্কীয় ছেলে, উক্ত ছেলের ছেলে, দুধ সম্পর্কীয় মেয়ের ছেলে ও তাদের ঔরসজাত যে কোন পুত্র সন্তান এবং দুধ সম্পর্কীয় মেয়েদের স্বামী।

(১১) দুধ সম্পর্কীয় বাপ, চাচা, মামা, দাদা, নানা ও তাদের ঊর্ধ্বতন পুরুষ।

(১২) দুধ সম্পর্কীয় ভাই, দুধ ভাইয়ের ছেলে, দুধ বোনের ছেলে এবং তাদের ঔরসজাত যে কোন পুত্র সন্তান।

(১৩) যৌন শক্তিহীন এমন বৃদ্ধ, যার মহিলাদের প্রতি কোন আকর্ষণ নেই এবং তার প্রতি মহিলাদেরও কোন আকর্ষণ নেই।

(১৪) অপ্রাপ্ত বয়স্ক এমন বালক, যার এখনও যৌন আকর্ষণ সৃষ্টি হয়নি।

উল্লেখ্য, ১৩ ও ১৪ নং বর্ণিত পুরুষদের সাথে বিবাহ জায়েয। মহিলার জন্য উপরোক্ত পুরুষগণ ব্যতীত অন্য কোন পুরুষের সাথে দেখা-সাক্ষাত করা জায়েয নেই, বরং তা সম্পূর্ণ নাজায়েয ও হারাম।

সুতরাং, মহিলাদের জন্য চাচাত ভাই, খালাত ভাই, ফুফাত ভাই, মামাত ভাই, দেবর, ভাশুর, খালু, ফুফা, চাচাত শ্বশুর, উকিল বাপ, ধর্মবাপ, ধর্মভাই, দুলাভাই, বেয়াই, ননদের জামাই ইত্যাদির সাথে দেখা-সাক্ষাত করা হারাম এবং তাদের সাথে বিবাহ শাদী জায়েয।

উল্লেখ্য, স্ত্রীর বর্তমানে বা তার ইদ্দতের সময় তার বোনকে বিবাহ করা হারাম।

(সূরা-নূর-৩১, তাফসীরে মাযহারী-৬/ ৪৯৭-৫০২, মা'আরিফুল কুরআন-৬/ ৪০১-৪০৫, হিদায়া-২/ ৩০৭, ফাতহুল কাদীর-২/ ১১৭)

পর্দাহীন মহিলাদের সাথে পর্দানশীন মহিলাদের পর্দা করা

পর্দা শরীয়তের দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ফরয। যে সকল সম্ভ্রান্ত মহিলা ইসলামের মহান আদর্শ ও শরীয়তের পর্দার ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ফরয নির্দেশ সর্বাবস্থায় যথাযথভাবে মান্য করে চলতে চেষ্টা করে, তাদের পক্ষে বেপর্দা মহিলা, যারা শরীয়তের অত্যাবশ্যকীয় হুকুম পর্দার নির্দেশ উপেক্ষা করে বেপর্দা অবস্থায় লাগামহীনভাবে ঘুরে বেড়ায়,

তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাত করা এবং খোলা-মেলা আলাপ-আলোচনা ইত্যাদি শরীয়তে অনুচিত। কারণ, এ ধরনের মহিলাকে শরীয়তে না মাহরাম পুরুষদের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

সুতরাং, পর্দানশীন সম্মানিতা মহিলাগণকে এ ধরনের বেপর্দা মহিলাদের থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকা এবং তাদের সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রাখা অনুচিত।

উল্লেখ্য, এ সমস্ত মহিলা-পুরুষদের আওতাভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বেগানা পুরুষদের জন্য ঐসব বেপর্দা মহিলাদের সাথে দেখা সাক্ষাত করা হারাম। এ ব্যাপারে অনেক লোক ধোকার মধ্যে আছে।

(মা'আরিফুল কুরআন-৬/ ৪০৪, আলমগীরী, ৫/ ৩২৭, ইমদাদুল ফাতাওয়া, ৪/ ১৯৬)

পুরুষদের জন্য মহিলাদের কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ করা বা মহিলাদের ছবি দেখা জায়েয নেই

মহিলাদের আওয়াজ, কন্ঠস্বরের ক্ষেত্রেও পর্দা করা উচিত। সুতরাং, মহিলাদের কন্ঠস্বরকে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বেগানা পুরুষ থেকে গোপন রাখা জরুরী। এমনকি বিনা প্রয়োজনে পর্দার আড়াল থেকেও পরস্পর কথাবার্তা বলা অনুচিত। একান্ত প্রয়োজনেই কেবলমাত্র পর্দার আড়াল থেকে মহিলারা কর্কশস্বরে কথা বলতে পারে।

বালেগা মহিলাগণ কুরআন শরীফ সহীহ করার জন্য শুনাতে চাইলে নিজের স্বামী/ মাহরামকে শুনাবে বা বালেগা মহিলাকে শুনাবে, বেগানা পুরুষকে শুনাবে না।

পুরুষদের জন্য বালেগা মহিলাদের তিলাওয়াত শ্রবণ করা আদৌ প্রয়োজনের আওতাভুক্ত নয়। কারণ, কুরআন শরীফ তিলাওয়াত বা অন্য কোন দ্বীনী আলোচনা শোনার জন্য মহিলাদের কন্ঠস্বর

ব্যতীত আরো যথেষ্ট মাধ্যম রয়েছে।

সুতরাং, মহিলাদের কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ করা প্রয়োজনের আওতাভুক্ত নয় বিধায় মহিলাদের তিলাওয়াত পুরুষের জন্য শোনা জায়েয হবে না।

(মা'আরিফুল কুরআন, ৬/ ৪০৬, ইমদাদুল ফাতাওয়া-৪/ ১৯৭, ২০০, ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া-৯/ ৪২৩)

বেগানা মহিলাদেরকে দেখা যেমনিভাবে নাজায়েয, তেমনিভাবে টিভি, সিনেমা, পত্র-পত্রিকা ম্যাগাজিন বা অন্যভাবে তাদের ছবি দেখাও নাজায়েয। এতদোভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, বরং ফটো বা ছবি দেখার দ্বারা নাজায়েয পাপের পাশাপাশি তা হৃদয়-যন্ত্রণারও কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

উপরন্তু দেখা ও কল্পনার দ্বারা চোখের যিনার গুনাহ হতে থাকে। তাই বেগানা মেয়েদের ফটো বা ছবি দেখা কোন অবস্থাতেই জায়েয নেই। বরং এটা দ্বীন-দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষতিকারক ও ধ্বংসাত্মক।

(বাইহাকী, হিদায়া-৪/ ৪৫৮, ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া-১/ ১২৬)

দুধভাই-বোন এবং যুবতী শাশুড়ীর সাথে পর্দা

নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি ইবাদতের ন্যায় পর্দাও গরুত্বপূর্ণ বিধান। নামায, রোযা ইত্যাদি ইবাদত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আদায় করলেই আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু পর্দা প্রতিটি মুহূর্তের জন্য ফরয। অল্প সময়ের জন্যেও ইচ্ছাকৃতভাবে পর্দার খেলাফ চললে কবীরা গুনাহ হবে। কাজেই প্রত্যেক নর-নারীর জন্য উচিত এমনভাবে চলা-ফেরা করা, যেন কোন অবস্থাতেই তার দ্বারা পর্দা লঙ্ঘিত না হয়।

বালিগ ছেলে-মেয়েদের প্রত্যেকের মাহরাম তথা যাদের সাথে

বিবাহ অবৈধ বা হারাম অর্থাত যাদের সাথে দেখা-সাক্ষাত জায়েয, তা তিন ধরনের সম্পর্কের কারণে হতে পারে : বংশের সম্পর্ক, বৈবাহিক সম্পর্ক, দুধ সম্পর্ক। উক্ত তিন ধরনের সম্পর্কের মাহরামের সাথে দেখা-সাক্ষাত মূলত জায়েয।

তবে ফিতনার আশংকায় উলামায়ে কিরাম তাক্ওয়া ও পরহেযগারীর লক্ষ্যে কিছু সংখ্যক মাহরামের সাথে দেখা সাক্ষাত জায়েয মনে করা সত্বেও তাদের সাথে মাহরাম সুলভ আচরণ তথা পর্দা করতে বলেছেন। যেমন যুবক বা মাঝ বয়সী শ্বশুর, যুবতী মহিলার জন্য নিজ মেয়ের স্বামী এবং দুধ সম্পর্কীয় ভাই ইত্যাদি।

সুতরাং, বৈবাহিক এবং দুধ সম্পর্কীয় মাহরামদের সাথে দেখা-সাক্ষাত জায়েয হলেও বর্তমান যামানায় ফিতনার আশংকায় তাদের সাথে বংশীয় মাহরামদের ন্যায় ব্যবহার বা চলাফেরা না করা উচিত; বরং পর্দা করাই নিরাপদ এবং নির্জনে তাদের সাথে একত্রিত হওয়া উচিত নয়। কারণ, আল্লাহ না করুন, যদি কোন মহিলার যুবক শ্বশুর বা মেয়ের স্বামীর সাথে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন না করায় কামভাব নিয়ে স্পর্শ বা এ ধরনের অন্য কোন আচরণ হয়ে যায় তাহলে প্রথম সুরতে তার স্বামী তার জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যাবে এবং ২য় ক্ষেত্রে তার মেয়ের স্বামী তার মেয়ের জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যাবে, যা মহাবিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

(আহসানুল ফাতাওয়া, ৮/ ৩৬, ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া ১৭/ ২৭৩)

হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্নী উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) ও তাঁর পিতা হযরত আবু বকর (রা.) দু'জনে কোন এক নির্জন স্থানে বসে কোন বিষয়ে পরামর্শ করছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে গিয়ে দেখতে পেলেন তাদের মাঝখানে শয়তান বসে আছে। হঠাত তিনি রাগ হয়ে বললেন,

খবরদার! কখনো এরূপ নির্জন স্থানে বসবেন না। কারণ, আপনাদের ধোঁকা দেবার জন্য দুষ্ট শয়তান আপনাদের মাঝখানে বসেছিল। আমি তা দেখেছি। এভাবে যে কোন নির্জন স্থানে একজন পুরুষ ও একজন নারী একত্র হলে সেখানে শয়তান হয় তৃতীয়জন। (তিরমিযী শরীফ, ১/ ২২১)

উক্ত হাদীস শরীফ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, শুধু বৈবাহিক বা দুধ সম্পর্কীয় মাহরাম নয়, বরং স্বামী-স্ত্রী ছাড়া যে কোন ধরনের মাহরামের সাথেও নির্জনে একত্রিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। সুতরাং, বৈবাহিক বা দুধ সম্পর্কীয় মাহরাম বিশেষ করে দুধভাই-বোন এবং যুবতী শাশুড়ীর ক্ষেত্রে মেয়ের জামাতার সাথে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

(শামী, ৬/ ৩৬৯, ইমদাদুল ফাতাওয়া, ৪/ ২০০, আযীযুল ফাতাওয়া, ৭৫৮, ইসলাহে খাওয়াতীন, ৩৭৬)

মহিলাদের মার্কেটিং বা অনুষ্ঠানে যাওয়া, চাকুরী করা

মহিলাদের স্বীয় দ্বীনদারী টিকিয়ে রাখার জন্য এবং দুনিয়া ও আখেরাতে সুউচ্চ মর্যাদার আসনে আসীন হওয়ার জন্য তাদের কর্তব্য হল সর্বদা বাড়ীর ভিতরে থাকা, কোন অপারগতা বা বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া পর্দা করেও বাড়ী থেকে বের না হওয়া।

বর্তমানে মহিলাগণ আনন্দ ফূর্তির সাথে যেভাবে মার্কেটে ঘোরাফেরা করছে তা সম্পূর্ণ নাজায়েয এবং জাহেলিয়াতের বেহায়াপনা। তবে একান্ত প্রয়োজনে অর্থাত এমন প্রয়োজন যে, বাড়ীর বাইরে বের না হলে বিশেষ অসুবিধা হতে পারে বা অস্বাভাবিক ক্ষতি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে অথবা শর‘ঈ কোন দায়িত্ব পালনের জন্য স্বামী বা মাহরাম পুরুষের সাথে পর্দার সাথে

বাইরে যাওয়ার অনুমতি আছে। মহিলাদের জন্য মার্কেটিং করা, স্কুল-কলেজের শিক্ষিকা হওয়া, অফিস-আদালতে পুরুষদের সাথে চাকুরী করা পর্দা লঙ্গিত হওয়ার কারণে নিষিদ্ধ। এ ব্যাপারে অনেক দলীল পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে কিছু দলীল-প্রমাণ ও ক্ষতির দিক তুলে ধরা হল।

কুরআন কারীমে মহিলাদের উদ্দেশে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেছেন- وقرن فى بيوتكن ‘তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে, মূর্খ যুগের মেয়েদের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বের হবে না।’ (সূরা আহযাব-৩৩)

এমনিভাবে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পরে হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্তমান পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করতেন, তাহলে তিনি অবশ্যই মহিলাদেরকে মসজিদে গমনে নিষেধ করতেন।

(বুখারী, ১/ ১২০, মুসলিম, ১/ ১৮৩)

ঐ সময় হযরত উমর (রা.) মহিলাদের জামা‘আতে হাজির হওয়ার জন্য মসজিদে আসা কঠোরভাবে নিষেধ করে দেন এবং সকল সাহাবা (রা.) তা মেনে নেন।

দ্বিতীয়ত স্ত্রীর নিজের পক্ষ থেকে জিনিস পছন্দ করাটা স্বামীর প্রতি পূর্ণ ভালবাসা ও বিশ্বাস না থাকার পরিচয় বহন করে। কারণ, লেবাস-পোশাক, অলংকার ইত্যাদি দ্বারা একমাত্র স্বামীকে খুশী করাই স্ত্রীর খোদা প্রদত্ত দায়িত্ব। সুতরাং, যাকে খুশী করা উদ্দেশ্য, তিনি নিজের পছন্দমত জিনিস কিনবেন এটাই তো যুক্তিযুক্ত। নতুবা স্ত্রীর পছন্দ হল কিন্তু স্বামীর নিকট বেঢঙ্গা মনে হল, সেক্ষেত্রে তো স্ত্রী স্বামীকে খুশী করতে ব্যর্থ হল এবং তার চেষ্টা তদবীরও পণ্ড হল, যা চরম মূর্খতা এবং দুঃখজনক বিষয়।

তাছাড়া মহিলাগণ স্বামীর সাথে বোরকা পরিধান করে মার্কেটে

গেলে যদিও তার সৌন্দর্য কোন বেগানা পুরুষ দেখতে পারবে না; কিন্তু সেতো একটি অযথা কাজ করতে গিয়ে নিজে বিভিন্ন পুরুষকে দেখবে, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপছন্দনীয় হবার বিষয়টি ইতিপূর্বে একজন অন্ধ সাহাবীর আগমনের ঘটনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

সুতরাং, মহিলাদের জন্য উচিত নিজ গৃহে অবস্থান করা। মার্কেটে, পার্কে এবং বিভিন্ন উতসব ও অনুষ্ঠানে না যাওয়া; বরং মার্কেটিংসহ বাইরের সকল কাজ-কর্ম স্বামীর উপর ন্যস্ত করে স্বামীর পছন্দকে নিজের পছন্দ বানিয়ে দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্য অর্জন করা।

বর্তমানে দ্বীনদার লোকেরা ওলীমা ইত্যাদি অনুষ্ঠানে মহিলাদেরকেও দাওয়াত করে এবং নিজেদের দ্বীনদারী বহাল রাখার জন্য মহিলাদের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা রাখে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে, এতে পর্দা তেমন রক্ষিত হয় না। বরং প্রচুর পরিমাণ বেপর্দেগী এবং পোশাক ও অলংকারের প্রদর্শনী হয়ে থাকে। মেয়েরা পুরুষদের মহলে চলে আসে। আবার অনেক স্থানে পুরুষ খাদেম দ্বারা মহিলাদের খানা পরিবেশন করা হয়। তাহলে শর‘ঈ পর্দা কোথায় থাকল এবং কোথায় তাদের দ্বীনদারী বজায় থাকল? (আল বাহরুর রায়িক-১/ ৬২৮)

এজন্য হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) কছ্দুছ ছাবীল (পৃ. ৭১) কিতাবে মহিলাদের এ ধরনের অনুষ্ঠানে যেতে নিষেধ করেছেন।

মহিলাদের মধ্যে আপনজনদের দ্বারা খানা পৌঁছান যেত বা কোন সুযোগে তাদেরকে নিজের বাড়ীতে মহিলাদের মাধ্যমে মেহমানদারী করা যেত; কিন্তু তা না করে দ্বীনদারীর নামে বদদ্বীনী তরীকায় এগুলি করা হচ্ছে, মুসরিম মিল্লাতের জন্য যা বড়ই পরিতাপের বিষয়। আল্লাহর পানাহ।

(ফাতাওয়ায়ে রাহীমিয়া-১/ ৩০)

অবশ্য যেসব মহিলার আয়-রোযগারের কেউ নেই, তাদের উচিত বেপর্দা হয়ে আল্লাহকে নারায না করে নিজের ঘরের মধ্যে থেকে সেলাই মেশিনের কাজ করবে, কাঁথা সেলাই করবে, হাঁস-মুরগী পালন করবে। অথবা নূরানী মহিলা মু'আল্লিমা ট্রেনিং নিয়ে কুরআনের শিক্ষিকা হয়ে নিজ ঘরের মধ্যে বেতন নিয়ে মেয়েদের কুরআন শিক্ষা দিবে।

মহিলাদের তা'লীম তরবিয়্যত

আল্লাহ তা'আলার বিধানে মেয়েদের জাগতিক বিষয়াবলীতে সাদাসিধা থাকা এবং বেশি চতুর না হওয়া মর্যাদার বিষয়। এর ব্যতিক্রম হলে তা হবে তাদের মান-মর্যাদা ক্ষুণ্নকারী। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

ان الذين يرمون المحصنت الغفلت الخ-

উক্ত আয়াতে মু'মিন মহিলাদের গুণাবলীর অন্যতম গুণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। الغفلت অর্থাত জাগতিক বিষয়াবলীতে গাফেল বা সাদাসিধা।

তাছাড়া যে সব ক্রুটির কারণে অধিকাংশ মেয়েলোককে জাহান্নামী বলা হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম একটি ক্রুটি হলো চালাক-চতুর হয়ে স্বামীকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলা এবং তার অবাধ্য হওয়া। (বুখারী শরীফ, ১/ ৯)

আর আধুনিক শিক্ষার দ্বারা মেয়েরা খুবই দুরুন্ত ও চতুর হয়ে এ ক্ষতির মধ্যে পতিত হয়। সুতরাং, বৈষয়িক শিক্ষা নাবালেগ অবস্থায় প্রয়োজন মাফিক দেয়াই যথেষ্ট। এর থেকে বেশি তাদের জন্য শোভনীয় নয় বরং তা তাদের মর্যাদা ক্ষুণ্নকারী।

সুতরাং, উক্ত আয়াতের আলোকে বৈষয়িক শিক্ষা যত বেশি

দেয়া হবে ততই তাদের মান-মর্যাদা আল্লাহর নিকট এবং আল্লাহওয়ালাদের নিকট কমতে থাকবে। (ইসলাহে ইনকিলাবে উম্মত-১/ ৩১৪)

ইংরেজরা নারী-পুরুষ সকলের একই সিলেবাস চালু করেছে। এটা তাদের নির্বুদ্ধিতার স্পষ্ট প্রমাণ। এ ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হল, যেহেতু উভয়ের কর্মক্ষেত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন; সুতরাং প্রত্যেকের শিক্ষা কারিকুলাম এমন হবে যা তার কর্মক্ষেত্রের সাথে সংগতিপূর্ণ। আর এটাই যুক্তিযুক্ত।

হ্যাঁ, কুরআন-হাদীসের শিক্ষা অর্জন করা প্রত্যেক নর-নারীর উপর ফরয। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে– طلب العلم فريضة على كل مسلم

অর্থ : ইলমে দ্বীন অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।

(ইবনে মাজাহ, ২০)

বর্ণিত হাদীসে ইলম দ্বারা ইলমে দ্বীন বুঝানো হয়েছে- বৈষয়িক বিদ্যা নয়। কাজেই বৈষয়িক বিদ্যা তথা ব্যারিষ্টার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি হওয়ার পিছনে অযথা সময় ব্যয় না করে দ্বীনী ইলম এবং সাংসারিক বিদ্যা শিক্ষা করা মেয়েদের জন্য জরুরী, যা তার কাজে আসবে।

হাদীসে আরো ইরশাদ হয়েছে-

الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة-

অর্থ : পৃথিবী পুরোটাই হল সম্পদ, আর পৃথিবীর সর্বোত্তম সম্পদ হল পুণ্যবতী মহিলা। (মুসলিম শরীফ, ১/ ৪৭৫)

এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, প্রত্যেক পিতার দায়িত্ব হলো, তার মেয়ের দ্বীনদারীসহ সকল ক্ষেত্রে এমনভাবে গড়ে তোলা যে, পরবর্তীকালে তাকে যেন তার স্বামী দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত বলতে বাধ্য হয়। কাজেই উক্ত হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী মেয়েকে ইলমে দ্বীন শিক্ষা দিয়ে পুণ্যবতী বানানো জরুরী।

কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে–وقرن فى بيوتكن

অর্থ : মহিলারা নিজ গৃহে অবস্থান করবে। উক্ত মূলনীতির আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, মহিলারা ঘরে চার দেয়ালের ভিতরে অবস্থান করে দ্বীনী ইলম অর্জন কবে। এটাই পর্দার সহায়ক এবং নিরাপদ।

(ক) কাজেই মহিলারা নিজ গৃহে স্বীয় মাহরাম পুরুষ তথা বাপ, দাদা, চাচা, নানা, ভাই, মামা প্রমুখের নিকট থেকে ইলমে দ্বীন অর্জন করবে।

(খ) মাহরামদের মধ্যে যোগ্য আলেম ব্যক্তি পাওয়া না গেলে মহিলারা মহল্লার কোন দ্বীনদার আলেমা মহিলার কাছে গিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে কুরআন ও ইলমে দ্বীন শিখবে এবং পড়া বা পাঠ সমাপ্ত করেই বাড়ীতে ফিরে আসবে। উক্ত বাড়ীতে পাঠ্য কার্যক্রম ব্যতীত বেশি সময় অবস্থান করবে না। এভাবে দৈনন্দিন যাওয়া আসা করে ইলমে দ্বীন অর্জন করবে।

(গ) দ্বীনদার আলেমা মহিলাও পাওয়া না গেলে স্বীয় মাহরামের সাথে, পর্দার সাথে কোন হক্কানী আলেমের নিকট গিয়ে ইলম শিখবে। অতঃপর পড়া বা সবক শেষ করে চলে আসবে। অর্থাত অনাবাসিকভাবে ইলমে দ্বীন ও জরুরী মাসায়িল শিক্ষা করবে।

হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে পাওয়া যায় যে, সাহাবায়ে কিরামের (রা.) মহিলাগণ মাসআলা মাসায়িল জানার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হন এবং তাদের জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করার আবেদন জানান। তাঁদের আবেদনের প্রেক্ষিতে তাঁদের তা'লীম তবরিয়্যতের লক্ষ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সপ্তাহে একদিন এক বাড়ীতে নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণও করে দিয়েছিলেন। (বুখারী শরীফ, ১/ ২০, ২১)

বর্ণিত পদ্ধতিগুলোর যে কোন একটির মাধ্যমে মহিলারা ইলমে দ্বীন শিক্ষা করবে এতে আলেমগণের মতানৈক্য নেই। হাকীমুল

উম্মত হযরত থানভী (রহ.)ও থানাভবনে দ্বিতীয় পদ্ধতি চালু করেছিলেন।

(ইসলাহে খাওয়াতীন, ৪৩৮)

তবে প্রচলিত আবাসিক মহিলা মাদরাসা যেখানে বিভিন্ন ধরনের মেয়েরা একত্রে দীর্ঘদিন বসবাস করে, যেখানে পরহেযগার দ্বীনদার মহিলা এবং পূর্ণ দ্বীনদার নয় এমন মহিলাও পরস্পর একত্রে অবস্থান করে। অথচ পুরুষ শিক্ষকগণ পর্দার কারণে তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে পারেন না।

অপরদিকে মহিলা শিক্ষিকাগণ মেয়েদের নিয়ন্ত্রণ করার তেমন যোগ্যতা রাখেন না। এই সুযোগে ভাল-মন্দ ঘরের মেয়েরা অবাধে আলাপ আলোচনা করে, এমনকি অশ্লীল আলোচনা করতেও তারা দ্বিধাবোধ করে না। এতে মন্দের সুহবতে ভাল ঘরের মেয়েরাও দুঃশ্চরিত্রা হয়ে যাওয়ার প্রবল আশংকা থাকে।

কাজেই এ ধরনের আবাসিক মহিলা মাদরাসায় বহুবিধ ক্ষতির দিক রয়েছে বিধায় মুহাক্কিক উলামায়ে কিরাম প্রচলিত আবাসিক মহিলা মাদরাসাকে পছন্দ করেন না।

(ফাতাওয়ায়ে রাহীমিয়া, ৯/ ৪৫, আওরত কী ইসলামী যিন্দেগী, ৭০)

মহিলাদের তাবলীগ

নিজ ঘরের মধ্যে দ্বীন শিক্ষা করার সঠিক ব্যবস্থা থাকলে মহিলাদের তাবলীগ জামা'আতে যাওয়া জরুরী নয়। ঘরের পুরুষদের থেকে মাসআলা-মাসায়িল শিখতে থাকবে এবং নিজ পরিবার তথা সন্তানাদি এবং মহল্লার মেয়েদেরকে বা তার সাথে দর্শনার্থী মহিলাদেরকে দ্বীনের দাওয়াত ও তা'লীম দিতে থাকবে। ঘরে অবস্থান করেই দ্বীনের খেদমত আনজাম দিবে।

আর যদি দ্বীন-ধর্ম বিমুখ কোন পরিবারের কোন পুরুষ সদস্য যথা পিতা, ভাই, স্বামী প্রমুখ দ্বীনের দাওয়াত পেয়ে দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট হয়; কিন্তু নিজের ইলম না থাকার দরুন অন্যদেরকে দ্বীনদার বানাতে অক্ষম হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে যেমন পুরুষ সদস্যদেরকে পুরুষদের তাবলীগের সাথে জুড়ে দিতে চেষ্টা করবে, তেমনি মহিলাদেরকেও নিজ যিম্মাদারীতে হাক্কানী উলামা কর্তৃক ইজাযত প্রাপ্ত বিশ্বস্ত আলেমা মহিলার তা'লীম-তাবলীগের সাথে জড়াতে চেষ্টা করবে।

এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে সফর করতে হলে স্বামী বা মাহরাম পুরুষ অবশ্যই সাথে থাকতে হবে এবং জামা'আতটি তাবলীগী মারকাযের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকতে হবে। কোন প্রকারের বেপর্দেগীর আশংকা যেন না থাকে। কোথাও যদি মহিলারা হাক্কানী উলামায়ে কিরাম বা মারকাযের অনুমতি ছাড়া নিজেরা স্বতন্ত্রভাবে তাবলীগী কর্মকাণ্ড চালাতে থাকে, তাহলে অভিভাবক ও মারকায কর্তৃপক্ষ দ্রুত হস্তক্ষেপ করে তা বন্ধ করে দিবে, নচেত দ্বীনের নামে বড় ধরনের ফিতনার দরজা উন্মুক্ত হবে এবং মহিলাগণ মারাত্মক গোমরাহীর মধ্যে লিপ্ত হয়ে দ্বীন ঈমান ধ্বংস করে ফেলবে। (ফাতহুল কাদীর-১/ ৩১৮)

বিভিন্ন এলাকা থেকে এ ধরনের ঘটনার ব্যাপারে ফাতাওয়া বিভাগ ফাতাওয়া তলব করা হয়েছে।

স্বামী, পিতা-মাতা বা অভিভাবকের আদেশে পর্দা ভঙ্গ করা জায়েয নাই

বালেগা মহিলাদের জন্য পর্দা করা ফরয তথা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ। কোন মাখলুককে খুশী করতে গিয়ে আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর নির্দেশকে উপেক্ষা করা বা অমান্য করা কোন অবস্থাতেই জায়েয নেই। হাদীসে পাকে ইরশাদ

হয়েছে, আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে কোন বান্দাকে খুশী করা বা তার কথা মান্য করা জায়েয নাই। বরং সে ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশকেই প্রাধান্য দিতে হবে। (মুসলিম শরীফ, ২/ ১২৪)

আর পর্দা প্রথা মনগড়া নয় বরং কুরআন-হাদীসে এর ফরয হওয়ার অকাট্য দলীল-প্রমাণ রয়েছে। কাজেই পর্দা ভঙ্গ করা আল্লাহর নির্দেশকে অমান্য করারই নামান্তর, যা কোন অবস্থাতেই জায়েয নয়। সুতরাং, স্বামী, মাতা-পিতা বা অভিভাবকের আদেশে পর্দা ভঙ্গ করা জায়েয হবে না। (শামী, ৬/ ৩৮৪)

বেপর্দা মেয়ের প্রতি পিতার করণীয়

ছেলে-মেয়েদেরকে সতপথে পরিচালিত করার জন্য বাল্যকালেই তাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেয়া মা-বাপের উপর ফরয করা হয়েছে। সেই প্রথম ফরয তরক করার কারণেই আজ বদদ্বীনী পরিবেশে অবস্থান করে এবং দ্বীনী শিক্ষার বদলে নাস্তিক্যবাদী কু-শিক্ষা পেয়ে তারা বিপথগামী হচ্ছে। তাদের বাল্যকালেই দ্বীন ও ইসলামের বিধি-বিধান শিক্ষা না দিলে অভিভাবকগণ পরকালে জবাবদিহির সম্মুখীন হবেন। যেমন ইরশাদ হয়েছে-

الا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

অর্থ : সাবধান! তোমরা সকলেই দায়িত্বশীল। আর তোমরা সকলেই তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। (তিরমিযী শরীফ, ১/ ২৯৯)

অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

عن ابى سعيد رضـ وابن عباس رضـ قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولدله ولد فليحسن اسمه وادبه فاذا بلغ فليزوجه فان بلغ ولم يزوجه فاصاب اثما فانما اثمه على ابيه

অর্থ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তির কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করবে তার উচিত সন্তানের জন্য

সুন্দর নাম রাখা এবং তাকে আদব তথা দ্বীনী ইলম শিখানো। অতঃপর সে প্রাপ্তবয়স্ক হলে তাকে বিবাহ দেয়া। নতুবা এ সন্তান যদি কোন গুনাহে লিপ্ত হয় তবে এ গুনাহ তার পিতার উপর বর্তাবে। (বায়হাকী শরীফ)

উক্ত হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মেয়ে বয়ঃপ্রাপ্তা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্বীনদার, পরহেযগার পাত্র দেখে তাকে অবিলম্বে বিবাহ দেওয়ার ব্যবস্থা করা পিতার বিশেষ দায়িত্ব। সাবালিকা হওয়ার পরও যদি অভিভাবক তার বিবাহের বন্দোবস্ত না করে এবং এমতাবস্থায় যদি সে পাপ কাজে লিপ্ত হয়, তবে অভিভাবকও সেই গুনাহের অংশীদার হবে।

(ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম, ৭/ ৪৩)।

নিজের মেয়েকে দ্বীনী শিক্ষা না দেয়ার ফলে বা যথাযথ খোঁজ-খবর না রাখার দরুন যদি মেয়ে বেপর্দায় চলাফেরা করতে থাকে, সেক্ষেত্রে পিতা বা অভিভাবকের করণীয় হল মেয়েকে সতপথে আনার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে অনুমতি প্রাপ্ত মহিলাদের কোন দ্বীনী পরিবেশে ও দ্বীনী তা'লীমের মধ্যে আনা নেয়ার ব্যবস্থা করা।

ততসঙ্গে দ্বীনদার পাত্র দেখে তাকে যথাশীঘ্র বিবাহ দেয়ার ব্যবস্থা করা। পাশাপাশি তার জন্য মহান আল্লাহর দরবারে দু'আও রোনাযারী করতে থাকা এবং দ্বীন শিক্ষা না দেয়ার কারণে নিজের ভুলের প্রতি অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দরবারে তাওবা করা। (ইসলাহে খাওয়াতীন, ৪২৩)

বেপর্দা ও অবাধ্য স্ত্রীর প্রতি স্বামীর করণীয়

পর্দা আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশিত বিধান। তাই এ বিধান পালন করা প্রত্যেক নর-নারীর

উপর ফরয। আখেরাতের কল্যাণ অর্জনের সাথে সাথে স্বামী-স্ত্রীর মায়া-মহব্বতের স্থায়িত্বের লক্ষ্যে এবং দাম্পত্য জীবন সুখ ও শান্তিময় করে গড়ে তোলার জন্যই এ বিধান।

কোন মহিলা যদি নির্বুদ্ধিতার কারণে নিজের জন্য যা উপকারী সেই পর্দার বিরোধিতা করে, পর্দা না করে এবং স্বামীর বলাতেও তার কথা না মানে, তাহলে সে একাধারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং স্বামীর অবাধ্যচারিণী সাব্যস্ত হবে।

এমতাবস্থায় স্বামী সাধ্যমত স্ত্রীকে বুঝাবে। এ ব্যাপারে দ্বীনী বই-পুস্তক পড়তে দিবে। স্ত্রীকে সতর্ক করার জন্য প্রয়োজন হলে একই ঘরে বিছানা আলাদা করে দিবে। এতেও যদি ফল না হয় তাহলে হালকা শাসন করা যেতে পারে। এতেও যদি স্ত্রী সু-পথে না আসে, তাহলে দু'পক্ষের দু'জন দ্বীনদার মুরব্বীর দ্বারা ফয়সালা করতে হবে। এতে ইনশাআল্লাহ ফায়দা হবে।

কোন কারণে এতেও ফায়দা না হলে নিজের ও সন্তানের দ্বীন-দুনিয়ার অনিষ্ট থেকে বাঁচার স্বার্থে স্ত্রীর মাসিক থেকে পবিত্র থাকা অবস্থায় এবং তার সাথে স্বামী সুলভ আচরণ থেকে বিরত থাকা অবস্থায়, রাগমুক্ত হালতে, সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কে শরীয়ত মুতাবিক শুধু এক তালাক দিবে। বাইন ইত্যাদি বলবে না, যাতে করে স্ত্রী অনুতপ্ত হয়ে দ্বীনদারী গ্রহণ করলে, তাকে দ্বিতীয়বার গ্রহণ করার সকল রাস্তা খোলা থাকে।

উল্লেখ্য, আমাদের দেশে তালাক দেয়ার পর ফাতাওয়া তলব করা হয়। এটা গলদ পদ্ধতি। সহীহ নিয়ম হল, প্রথমে তালাকের বৈধতার ব্যাপারে হাক্কানী মুফতীদের থেকে ফাতাওয়া নিয়ে সে অনুযায়ী আমল করা।

উল্লেখ্য, রাগ অবস্থায় তালাক দেয়া হারাম, কিন্তু কেউ এ অবস্থায় তালাক দিলে তালাক পতিত হবে। তেমনিভাবে এক সাথে

তিন তালাকই পড়ে যাবে।

অনেকে মনে করে শুধু মৌখিক তালাক পড়ে না বরং লিখিত হলে পড়ে, এটা শরীয়তের ব্যাপারে অজ্ঞতার প্রমাণ। কারণ, মৌখিক তালাকও পতিত হয়।

অবাধ্য স্ত্রীকে নিরুপায় হয়ে তালাক দেয়ার পর স্বামীর কর্তব্য হবে দ্বীনদার পর্দানশীন কোন মহিলাকে বিবাহ করার ব্যবস্থা করা। কারণ, একজন দ্বীনদার লোকের জন্য দ্বীনদার পর্দানশীন স্ত্রী হওয়া উচিত। বেপর্দা স্ত্রীকে নিয়ে ঘর-সংসার করায় মান-সম্মান নিয়ে জীবন-যাপন করা এবং তার থেকে নেক সন্তানের আশা করা অসম্ভব। (মা'আরিফুল কুরআন, ২/ ৩৯৯)

তাছাড়া স্ত্রীর পর্দার ব্যবস্থা করা স্বামীর কর্তব্যও বটে। স্বামী যদি এরকম বেপর্দা মহিলাকে নিয়ে ঘর-সংসার করতে থাকে তাহলে স্বামী অবশ্যই দায়ী হবে। হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে- সাবধান! তোমরা সকলেই দায়িত্বশীল। আর তোমরা সকলেই তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। এই হাদীসের শেষাংশে রয়েছে, একজন পুরুষ তার পরিবারের উপর দায়িত্বশীল। সুতরাং তাকে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে। (তিরমিযী শরীফ, ১/ ২৯৯)

আল্লামা মুল্লা আলী ক্বারী (রহ.) লিখেন, পরিবারের সকলকে বেপর্দা-বেহায়াপনা ও যাবতীয় পাপাচার থেকে বাধা দেয়া স্বামীর দায়িত্ব, অন্যথায় স্বামীকে দাইয়ূস হিসাবে গণ্য করা হবে। (মিরকাত, ৭/ ১৯৭)

আর দাইয়ূস সম্পর্কে হাদীসে ইরশাদ হয়েছে যে, দাইয়ূস বেহেশতে প্রবেশ করবে না। (মুসনাদে আহমদ)

অবাধ্য স্বামীকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট এবং দ্বীনের পথে আনার পদ্ধতি

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক সুখকর এবং ইহকালীন ও পরকালীন স্থায়ী শান্তির আশায় প্রত্যেক মুসলমান মেয়ের উচিত দ্বীনদার মুত্তাকী ছেলেদের নিকট বিবাহ বসতে চেষ্টা করা এবং অভিভাবকদেরও যিম্মাদারী যে, দ্বীনদার ছেলে দেখে তার নিকট নিজেদের অধীনস্থ মেয়েদেরকে বিবাহ দেয়ার ব্যবস্থা করা।

হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে-

اذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ان لا تفعلوه تكن فتنة فى الارض رفساد عريض

অর্থ : কেউ যদি তোমাদের নিকট বিবাহের প্রস্তাব দেয়, যার দ্বীনদারী ও চারিত্রে তোমরা সন্তুষ্ট, তাহলে অচিরেই বিবাহের ব্যবস্থা কর, নতুবা সমাজে মারাত্মক ফিতনা-ফাসাদ বিস্তারের সম্ভাবনা রয়েছে। (তিরমিযী শরীফ ১/ ২০৭)

এক্ষেত্রে অভিভাবকদের অবহেলায় বা বাস্তব পর্যবেক্ষণের অসম্পূর্ণতায় কেউ বদদ্বীন স্বামীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকলে, তখন তার উচিত স্বামীকে দ্বীনদার বানানোর সকল চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। তাকে হাক্কানী আলেমের সাথে সম্পর্ক গড়তে ও তাবলীগ জামা'আতের সাথে জুড়তে উতসাহিত করা এবং স্বামী যদি সুদ-ঘুষ খেতে অভ্যস্ত থাকে অথবা অন্য কোন অবৈধ রোজগারে অভ্যস্ত থাকে, তাহলে বিনয়ের সাথে তাকে বুঝাবে যে, আমার দামী দামী খানা-পিনা ও পোশাক, অলংকারের কোন দাবী বা চাহিদা নাই। আমি শুধু এতটুকু চাই যে, আমার জন্য দু'বেলা দু'মুঠো হালাল ডাল ভাতের ব্যবস্থা করবেন। সাধারণ কাপড় পরাবেন যাতে আমরা আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হই। দুনিয়া তো একভাবে চলেই যাবে। সুতরাং, আপনার রোজগারের মধ্যে কোনভাবে হারামের সংমিশ্রণ যেন না হয় সেদিকে আপনি খুবই সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন।

সেই সাথে স্ত্রী নিজেও পরিপূর্ণ দ্বীনদারীর সাথে চলতে চেষ্টা করবে। নিজেদের সুন্দর, সুখময় দাম্পত্য জীবনের জন্য সর্বদা

আল্লাহর দরবারে দু'আকরতে থাকবে। শরীয়তের আওতায় থেকে স্ত্রী নিজেকে সবসময় সাজিয়ে গুছিয়ে রাখবে। যাতে স্বামী তার রূপ-লাবণ্যে, সৌন্দর্যে এবং ব্যবহারে আকৃষ্ট হয়ে অন্য সব কিছু ভুলে যায় এবং দ্বীনদার হওয়ার চেষ্টা করে।

স্বামীর সাংসারিক কাজে ত্রুটি না ধরে আন্তরিকভাবে তার খেদমত ও সহযোগিতা করবে, তার আয়-উন্নতির ব্যাপারে সহযোগিতা করবে, কোন জিনিসের দাবী করবে না, বেহুদা খরচ করবে না। স্বামী প্রদত্ত প্রত্যেক জিনিসের প্রতি খুশী থেকে তার শুকরিয়া আদায় করবে এবং তার পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের খেদমত করে দু'আ নিতে থাকবে।

উপরোক্ত কাজগুলো ইন্‌শাআল্লাহ ফলদায়ক হবে এবং ধীরে ধীরে স্বামী দ্বীনের দিকে ও স্ত্রীর দিকে আকৃষ্ট হতে থাকবে। এরপরও যদি ফল না হয়, স্বামীর বদ–দ্বীনী বাড়তে থাকে, তাহলে নিজের ও সন্তানদের আখেরাতের চিন্তায় মুরব্বীর মাধ্যমে স্বামী থেকে খোলা তালাক গ্রহণ করে তার থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার অবকাশ রয়েছে।

উল্লেখ্য, এ ব্যাপারে অনেক মূর্খ মহিলা যাদু-টোনা, তাবীজ-কবজের মাধ্যমে স্বামীকে নিজের মুঠের মধ্যে রাখতে চেষ্টা করে, এটা জঘন্য অপরাধ। কারণ, পুরুষদেরকে আল্লাহ তা'আলা তুলনামূলক জ্ঞান বুদ্ধি বেশি দিয়েছেন, তার অভিজ্ঞতাও বেশী। সুতরাং, সে স্বাধীনভাবে মুরব্বীদের পরামর্শে চললে তার নিজের, বিবি বাচ্চাদের সকলের উন্নতি হবে। সংসারে শান্তি আসবে।

আর যদি অবৈধ পন্থায় তার স্বাধীনতা হরণ করে তাকে বেকুব বা গর্দভ বানিয়ে রাখা হয়, তাহলে এ ধরনের অকেজো স্বামী নিজ স্ত্রীর গোলামী করলেও তার দ্বারা স্ত্রীর নিজেরও কোন কল্যাণ হবে না; বরং ভবিষ্যতে মারাত্মক বিপদে পড়তে হবে।

সারকথা, স্বামীর স্বাধীনতা হরণ করাও নাজায়েয এবং যাদু টোনা করাও হারাম কাজ। আর কোন কোন অবস্থায় কুফরী কাজ।

সুতরাং, কোন অবস্থাতেই স্বামীকে বশ করার জন্য এ সব হারাম কাজ করে নিজের আখিরাত বরবাদ করবে না। (ইমদাদুল ফাতাওয়া, ৪/ ৮৭, ৬/ ১৯৮)

আল্লাহ তা'আলা সকল দম্পতিকে তাঁর হুকুম এবং প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা মত চলে দুনিয়া ও আখিরাতে কামিয়াব হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

সমাপ্ত

জীবনের শেষ দিন

সূচীপত্র

৫

জীবনের শেষ দিন

ভূমিকা

মৃত্যু অবধারিত। এ থেকে পালাবার কোন পথ নেই। মুমিন বান্দার জন্য এই মৃত্যু আরো গুরুত্বপূর্ণ। কেননা মৃত্যুর মাধ্যমেই তার মিলন ঘটে পরম প্রিয় মাওলার সাথে। মুমিনের জন্য মৃত্যু হচ্ছে একটি সেতু স্বরূপ। যা অতিক্রম করে সে বন্ধুর সাথে মিলিত হবে। তাই মৃত্যুর সময় থেকে নিয়ে দাফন পরবর্তী পর্যায় অত্যন্ত সুষ্ঠু ও শরীআত সম্মতভাবে অতিক্রম করা জরুরী। যাতে মাওলার সাথে তার মিলন মাওলার ইচ্ছানুযায়ী সম্পন্ন হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, এসব বিষয়ের শরঈ আহকাম না জানা থাকার দরুন আমরা মৃত ব্যক্তির সাথেও সুন্নতের বরখেলাপ আচরণ করে নিজেরাও গুনাহগার হচ্ছি আর তাকেও আযাবের সম্মুখীন করছি। সুতরাং মৃত ব্যক্তির সাথে কিরূপ আচরণ করতে হবে, কিভাবে তাকে দাফন করতে হবে এবং দাফন পরবর্তী সময়ে আমাদের কি করণীয় রয়েছে– সে সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে অত্র পুস্তিকায়। পূর্ববর্তী সংস্করণ কিছুটা সংক্ষিপ্ত থাকায় এবং হাওয়ালা না থাকায় বর্তমান সংস্করণে সেসব বৃদ্ধি করে পূর্ণতা দানের চেষ্টা করা হয়েছে। আল্লাহ পাক আমাদের এই মেহনত কবুল করে নাজাতের উসীলা বানিয়ে দিন। আমীন।

বিসমিহী তা‘আলা.

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على سيد المرسلين-

.

মৃত্যু অবধারিত.

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন : .

كل نفس ذائقة الموت ط وانما توفون اجوركم يوم القيامة ط فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز ط وما الحيوة الدنيا الا متاع الغرور-

.অর্থ : জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর তোমরা কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ বদলা প্রাপ্ত হবে; অতঃপর যাকে দোযখ থেকে মুক্তি দেয়া হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে হবে সাফল্যবান। বস্তুত পার্থিব জীবন ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়। (সূরা আলে ইমরান–১৮৫).

তাফসীর : আখিরাতের চিন্তা মূলত যাবতীয় দুঃখ বেদনার প্রতিকার ও সমস্ত সংশয়ের উত্তর। উক্ত আয়াতে এই বাস্তব তাকেই স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। তাই এ দুনিয়াবী ক্ষণস্থায়ী জীবনে যদি কখনো কোথাও কাফিররা বিজয়ী হয়ে যায় এবং পরিপূর্ণ আরাম আয়েশ লাভ করে আর তারই বিপরীতে মুসলমানগণ যদি বিপদাপদ, জটিলতা ও পার্থিব উপকরণে সংকীর্ণতার সম্মুখীন হয়, তাহলে তা তেমন বিস্ময়কর কিছু নয়। তাতে দুঃখিত হওয়ারও কিছু নেই। কারণ, এ বাস্তবতা সম্পর্কে কোন ধর্ম, কোন মতাবলম্বী, কিংবা কোন দার্শনিকই অস্বীকার করতে পারে না যে, পার্থিব দুঃখ–কষ্ট বা আরাম আয়েশ উভয়টিই কয়েক দিনের জন্য মাত্র। উপরন্তু এর দ্বারা মুমিনের গুনাহ

মাফ হয়ে যায়, দর্জা বুলন্দ হয়। কোন জানদার বা প্রাণীই মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে না। তাছাড়া মুমিনের পার্থিব দুঃখ-কষ্ট কিংবা সুখ স্বাচ্ছন্দ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পৃথিবীতেই আবত্তিত হয়ে শেষ হয়ে যায়। আর পৃথিবীতে যদি শেষ না ও হয়, তবে মৃত্যুর সাথে সাথে সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায়। কাজেই কয়েকদিনের সুখ-দুঃখ নিয়ে চিন্তামগ্ন হয়ে থাকাকোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়, বরং মৃত্যুর পরবর্তী স্থায়ী জবিনের চিন্তা করাই উচিত যে, সেখানে কি হবে এবং তার জন্য ঈমান ও আমলের প্রস্তুতি কিভাবে নিতে হবে এবং কতটুকু নিতে পারলাম। এজন্যই এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর ¯^v` গ্রহণ করবে। আর আখিরাতে নিজের কৃতকর্মের পুরস্কার বা শাস্তি প্রাপ্ত হবে। সুতরাং বুদ্ধিমানের পক্ষে কেবল এ বিষয়েই চিন্তা করা উচিত এবং সেই লোকই সত্যিকার কৃতকার্য, যে দোযখ থেকে মুক্তি লাভ করবে এবং জান্নাতের স্থায়ী আরাম আয়েশ ও সুখ শান্তির অধিকারী হবে। পক্ষান্তরে কাফিরদের চিরস্থায়ী ঠিকানা হবে জাহান্নাম। কাজেই তারা যদি দুনিয়ার সামান্য কয়েকদিনের পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দের কারণে গর্বিত হয়ে উঠে, তবে সেটা একান্ত ধোকা ছাড়া কিছুই নয়। সে জন্যই আয়াতে বলা হয়েছে - দুনিয়ার জীবন তো ধোকার উপকরণ’। তার কারণ এই যে, সাধারণতঃ এখানকার ভোগ বিলাসই হবে আখিরাতের কঠিন যন্ত্রণার কারণ। পক্ষান্তরে, দুনিয়াতে দীনের জন্য দুঃখ-কষ্ট হবে আখিরাতের সঞ্চয়। (মা‘আরিফুল কুরআন, ২/ ২৫৫).

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ঐ ব্যক্তি, যে নিজের নফস ও খাহেশকে নিজের আয়ত্বে আনতে সক্ষম হয় এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে

রাখে।.

(তিরমিযী শরীফ- হাদীস নং ২৪৫৯, ইবনে মাজাহ শরীফ- হাদীস নং ৪২৬০, মিশকাত শরীফ, ২/ ৪৫১).

দুনিয়ার হায়াত কিভাবে কাটাবে?.

প্রত্যেকের জন্য নিম্নোক্ত কাজগুলো পরিপূর্ণরূপে আন্‌জাম দেয়া খুবই জরুরী। কেননা, উক্ত কাজগুলোই দীনের সারমর্ম।.

(ক) নিজের ঈমান আকীদা সহীহ ও মজবুত করা। কুফরী-শিরকী বিশ্বাস থেকে অন্তরকে পাকা রাখা।

.(খ) ইবাদত বন্দেগী আমলী মশকের মাধ্যমে পরিপূর্ণ সুন্নাত অনুযায়ী শিখে নেয়া।

.(গ) রিযিককে হালাল রাখার ফিকির করা।

.(ঘ) আরো কর্তব্য হচ্ছে- মা-বাপ, স্ত্রী-সন্তান তথা বান্দার হকের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা, যাতে করে কারোর হক যিম্মায় না থেকে যায়। কারণ এর পরিণতি হবে ভয়াবহ। হাশরের ময়দানে পাওনাদারকে নেকী দিয়ে তার পাওনা পরিশোধ করতে হবে। যদি তাকে দেয়ার মত নেকী না থাকে বা পাওনা পরিশোধ করতে যেয়ে নেকী শেষ হয়ে যায়, তাহলে পাওনাদারের গুনাহের বোঝা নিজের কাঁধে নিতে হবে এবং শেষে নেকীশূন্য অবস্থায় গুনাহের পাহাড় কাঁধে নিয়ে দোযখে যেতে হবে। হাদীস শরীফে এ ধরনের লোকদেরকে আসল মিসকীন বলা হয়েছে। সুতরাং সারা জীবন এ সব ব্যাপারে তৎপর থাকতে হবে। কারোর নিকট

ঋণী থাকলে, সাথে সাথে খাতা বা ডায়রীতে লিখে রাখতে হয় এবং পরিশোধের জন্য ব্যতিব্যস্ত থেকে যখনই ব্যবস্থা হয়, সেই মুহূর্তে পাওনাদারকে তার পাওনা পৌঁছে দেয়া জরুরী। যদি নির্ধারিত সময়ে ঋণ আদায় করা সম্ভব না হয়, তাহলে লজ্জাবোধ করে দূরে না থেকে পাওনাদারের সাথে যোগাযোগ করে তার থেকে পাওনা পরিশোধের সময় বৃদ্ধি করে নেয়া কর্তব্য। মূর্খ লোকেরা অযথা লজ্জা করে তার থেকে দূরে দূরে থেকে অপরাধী ও হক নষ্টকারী প্রমাণিত হয়। .(বুখারী শরীফ-মিশকাত শরীফ, ২/ ৪৩৫).

(ঙ) নিজের আত্মার রোগের চিকিৎসার জন্য এবং অন্তরের ভাল গুণসমূহ অর্জনের জন্য কোন হক্কানী বুযুর্গের সাথে সম্পর্ক রাখা।

. .(চ) গুনাহে কবীরা, হারাম, মাকরূহে তাহরীমী ও সন্দেহজনক মনে হয় এমন জিনিস থেকে কঠোরভাবে বিরত থাকা।

. .(ছ) নিজের পরিবারের লোকজন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও মহল্লাবাসী লোকদেরকে সর্বদা দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকা এবং তাদেরকে দীনের তা'লীম দিতে থাকা। সার কথা আল্লাহর দীনের জন্য প্রতিদিন কিছু সময় বের করা। . (সূরা বাকারা, আয়াত ১৭৭/ বুখারী শরীফ, ২/ ৮৯৬). উল্লেখিত পদ্ধতিতে জীবন-যাপনের পর যখন মৃত্যু আসন্ন মনে করবে তখন শরীআতের দৃষ্টিতে করণীয় ও বর্জনীয় কি? তা বুঝার সুবিধার্থে ছয় অধ্যায়ে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে-

মৃত্যুরোগীর ব্যাপারে অন্যদের করণীয়.

রোগীকে দেখতে যাওয়া অতিশয় সওয়াবের কাজ। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমরা করণীয় কাজগুলো থেকে দারুণভাবে গাফেল থাকি। আর যা করণীয় নয় তাতে লিপ্ত হয়ে পড়ি, যার ফলে মূল উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যায়। তাই এ ক্ষেত্রে করণীয় কাজগুলো জানা নিতান্তই জরুরী। মৃত্যুরোগীর ব্যাপারে অন্যদের করণীয় কাজগুলো নিম্নরূপ : .

(১) সুন্নাত হিসাবে রোগীর বৈধ চিকিৎসা সাধ্যমত চালিয়ে যাবে। কিন্তু ভরসা আল্লাহ তা'আলার উপর রাখবে, ঔষধের উপর নয়। কারণ, ঔষধের নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। আল্লাহ চাহে তো শেফা হবে।.

(আবু দাউদ শরীফ-হাদীস নং ৩৮৫৫)

. .(২) রোগীর উযু-নামাযের ব্যাপারে খুব খেয়াল রাখবে। হুশ-জ্ঞান ঠিক থাকা পর্যন্ত তাকে সব কাজে সহযোগিতা করে করিয়ে নিবে। সতর খোলা থাকতে দিবে না। তবে হ্যাঁ, চিকিৎসার প্রয়োজনে যতটুকু সতর না দেখলেই নয় ততটুকু সতর ডাক্তার সাহেব দেখতে পারেনী। অন্যদের জন্য ছতর দেখা হারাম।. (আদ্ দুররুল মুখতার-৬/ ৩৭০)

. .(৩) মৃত্যুরোগীর আত্মীয়রা মৃত্যুরোগীকে দেখতে যাবে। কেউ রোগীকে সকালে দেখতে গেলে ৭০ হাজার ফেরেশতা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার মাগফিরাত কামনা করে আল্লাহর দরবারে দু'আকরতে থাকে। .

(ইবনে মাজাহ শরীফ-হাদীস নং ১৪৪২, মুসনাদে

আহমদ-হাদীস নং ৬১৪, যাদুল মাআদ-১/ ৪৭৮).

রোগীকে শুনিয়ে নিমোক্ত দু'আসাতবার পড়বে-.

اسئل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك-

.ফযীলত : যদি ঐ রোগেই তার মৃত্যুর ফয়সালা না হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ পাক তাকে উক্ত দু'আর ওসীলায় দ্রুত সুস্থ করে দিবেন।.

(আবু দাউদ শরীফ-হাদীস নং ৩১০৬).

(৪) রোগী দেখতে গেলে তাকে তার হায়াত সম্পর্কে নিশ্চিত করবে এবং তার নিকট ভাল কথা আলোচনা করবে, দুনিয়াবী কোন বিষয়ে আলোচনা করবে না। কেননা, সে সময় ফেরেশতারা উপস্থিত লোকদের কথার উপর আমীন আমীন বলতে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমূর্ষু ব্যক্তিকে তার হায়াত সম্পর্কে এভাবে নিশ্চিত করতেন : . لا بأس طهور انشاء الله-

.অর্থ : ভয়ের কোন কারণ নেই, ইনশা-আল্লাহ আপনি দ্রুত সুস্থ হয়ে যাবেন। (বুখারী শরীফ, হাদী নং- ৩৬১৬, মুসলিম শরীফ, হাদীস নং- ৯১৮, তিরমিযী শরীফ- হাদীস নং ৯৭৭). কিতাবে লিখেছে, রোগীকে দেখতে যাওয়ার মূল উদ্দেশ্য এটাই যে, সাক্ষাতকারী তাকে তার হায়াত সম্পর্কে নিশ্চিত করবে। যাতে করে সে শান্তি ও সুস্থতাবোধ করে এবং যতক্ষণ বেঁচে থাকে নিশ্চিত মনে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী এবং যিকির আযকার করতে পারে।.

(আহকামে মায়্যিত-২০).

(৫) রোগী দেখতে গেলে তার নিকট দু'আ চাইবে।

কারণ, তার দু'আআল্লাহ তাআলার নিকট ফেরেশতার দু'আর মত মাকবুল।.

(ইবনে মাজাহ শরীফ-হাদীস নং ১৪৪১)

.(৬) তার জায়েয খায়েশ/ চাহিদা পূর্ণ করবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, একদা এক মুমূর্ষু রোগীকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, কি খেতে চাও? সে জবাবে বললো, গমের আটার রুটি। তৎকালীন যুগে আটা সহজলভ্য ছিল না। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের (রা.) মাঝে ঘোষণা করলেন তাদের কারো কাছে গমের আটা থাকলে অনতিবিলম্বে এ ব্যক্তির জন্য পাঠিয়ে দিতে। .

(ইবনে মাজাহ শরীফ, হাদীস নং ১৪৩৯).

(৭) মৃত্যু আসন্ন মনে হলে আত্মীয়-স্বজনদের মধ্য থেকে কেউ মুমূর্ষ রোগীর পাশে বসে সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করবে বা অন্যের মাধ্যমে তিলায়াতের ব্যবস্থা করবে। কারণ, তা দ্বারা রোগীর মৃত্যুকষ্ট অনেকটা লাঘব হয়।.

(আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং ৩১২১, ইবনে মাজাহ শরীফ, হাদীস নং ১৪৪৮, মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ২০৩২৫).

(৮) তাকে কালিমায়ে তায়্যিবার তালক্বীন করতে থাকবে। অর্থাৎ তার নিকট বসে সে শুনতে পায় এতটুকু আওয়াজে একজন উক্ত কালিমা পড়তে থাকবে। যাতে সে তা শ্রবণ করে নিজেও পড়তে আগ্রহী হয় এবং তা পড়ে নেয়। মৃত্যুর পূর্বে যদি একবার পড়ে নেয়, অতঃপর মৃত্যুর পূর্বে আর দুনিয়াবী কাথা-বার্তায় লিপ্ত না হয়, তাহলে সে

হাদীসের মর্মানুযায়ী (যার সর্বশেষ উচ্চারিত বাক্য হবে - লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। .(মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ৯১৬) জান্নাতের অধিকারী হয়ে যাবে। কিন্তু যদি কালিমা পাঠের পর কোন দুনিয়াবী কথা-বার্তায় লিপ্ত হয়ে পড়ে, তাহলে পুনরায় তার নিকট বসে উক্ত কালিমার তালকীন করতে থাকবে। যাতে করে সে পুনরায় পড়তে আগ্রহী হয়ে তা পড়ে নেয় এবং তার শেষ কথা - লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ হয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, একবার পড়ার পর আর পড়ানোর চেষ্টা করবে না।.

(মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ৯১৬, আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং ৩১১৭, আদ্ দুররুল মুখতার ২/ ১১৯).

মৃত্যুরোগীর করণীয়.

মৃত্যুরোগে আক্রান্ত অবস্থায় করণীয় সম্পর্কে অবগতি লাভ করার পূর্বে শরীআতের দৃষ্টিতে মৃত্যুরোগ বা মুমূর্ষু অবস্থা কাকে বলে ও তার হুকুম কি তা জানা আবশ্যক।.

মৃত্যুরোগ.

শরীআতের দৃষ্টিতে মৃত্যুরোগ বলা হয় এমন রোগকে যার মধ্যে একই সাথে তিনটি শর্ত পাওয়া যায়। শর্ত তিনটি নিম্নরূপ :

. . (ক) অসুস্থতা ও দুর্বলতা এমন পর্যায়ে চলে যাওয়া যে, অসুস্থ ব্যক্তি একেবারেই কর্মক্ষম হয়ে নিজের একান্ত ক্ষুদ্র কাজ আঞ্জাম দিতেও অন্যের মুখাপেক্ষী হয়।

. (খ) অসুখ এক বছরের মধ্যে সীমিত থাকা।

. (গ) এ অসুখেই মৃত্যুবরণ করা, মাঝখানে আর সুস্থ না হওয়া।

মৃত্যু রোগের হুকুম.

উপরোক্ত শর্ত তিনটি যার মধ্যে পাওয়া যাবে, শরীআতের দৃষ্টিতে সেই মুমূর্ষু রোগী। আর কোন ব্যক্তির এ অবস্থায় উপনীত হওয়ার পর তার গোটা সম্পদের তিন ভাগের দুইভাগ থেকে তার মালিকানা নিঃশেষ হয়ে যায় এবং তার পক্ষ থেকে কৃত যাবতীয় অসিয়্যত মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া গোটা সম্পদের তিন ভাগের এক ভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং সম্পদের এতটুকুর মধ্যেই তা প্রযোজ্য হয়। তবে এ অসিয়্যতও আবার প্রযোজ্য হয় ওয়ারিছ (মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদে যাদের অংশ শরীআত কর্তৃক নির্ধারিত) ব্যতীত অন্যদের বেলায়। কারণ, শরীআতের দৃষ্টিতে কোন ওয়ারিছের জন্য অসিয়্যত করা নাজায়েয। হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে : . لا وصية لوارث

.অর্থাৎ, কোন ওয়ারিছের জন্য কোন অসিয়্যত জায়েয নেই।.

সুতরাং মৃত্যুরোগী কোন মহিলা যদি মুমূর্ষাবস্থায় তার স্বামী নিকট প্রাপ্য স্বীয় মহরকে মাফ করে দেয়, তাহলে তার এ মাফ করে দেওয়াটা নাজায়েয হবে এবং তা মাফ হবে না। বরং সেই মহরের অর্থের মধ্যে সকল ওয়ারিছের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। তেমনিভাবে মৃত্যুরোগী ঐ অবস্থায় কাউকে কিছু দিলে তাও অসিয়্যত গণ্য হবে। সুতরাং ঐ অবস্থায় যদি নিজের কোন ওয়ারিছকে-যেমন নিজের ছোট ছেলে বা মেয়েকে কিছু দেয়, তাহলে ওয়ারিছের

জন্য অসিয়্যত বাতিল বলে গণ্য হবে। আর ওয়ারিছ ব্যতীত অন্য কাউকে দিলে তার সমুদয় মালের তিন ভাগের একভাগ পর্যন্ত দিতে পারবে।

মুমূর্ষু অবস্থায় করণীয়.

সারা জীবন আল্লাহর হক ও বান্দার হক আদায় করতে চেষ্টারত থাকা অবস্থায় যখন অনুভব হয় যে, আমি হায়াতের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছি বা সম্ভবত আমার মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হয়ে গেছে, তখন খুব লক্ষ্য করে দেখবে যে, আল্লাহর হক নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি থেকে কোনটা বা কোনটার আংশিক অনাদায় রয়ে গেছে কি-না? যদি থেকে থাকে তাহলে তার জন্য অসিয়্যত করে যাওয়া জরুরী। যেমন, উমরী কাযা পড়ার পরেও হয়ত কিছু নামায বা রোযা রয়ে গেছে, হয়ত কোন বছরের যাকাত আদায় করা হয়নি বা ফরয হজ্জ আদায় করা হয়নি। তাহলে অসিয়্যতের মাধ্যমে সেগুলো আদায়ের বন্দোবস্ত করে যাওয়া জরুরী। এমনিভাবে এটাও দেখবে যে, বান্দার কোন হক রয়ে গেছে কি-না? বাপ-মায়ের নাফরমানী বা তাদের যথাযথ খেদমত না করা, স্ত্রীর মহর ও হক আদায় না করা, বোন, মেয়ে বা এ জাতীয় অন্য কারো প্রাপ্য হক ঠিকমত না দেয়া বা কারো ঋণ পরিশোধ না করা, অর্থ-সম্পদের ঋণ হোক বা তাদের জান মাল বা ইজ্জতের ক্ষতি করার ঋণ হোক। যেমন- অবৈধভাবে কারো দোষ চর্চা করা, তার ইজ্জতের ক্ষতি করা- এ ধরনের কোন ঋণ বা বান্দার হক রয়ে গেলে তাও দ্রুত পরিশোধ করার ব্যবস্থা করবে বা তাদের থেকে মাফ চেয়ে নিবে। অর্থ-কড়ির ঋণ টাকা-পয়সা দ্বারা শোধ করতে হবে। সম্পূর্ণ না পারলে

যতটুকু সম্ভব তা-ই দিয়ে অবশিষ্ট অংশের জন্য মাফ চেয়ে নিতে হবে। এমনকি যদি মোটেও না দিতে পারা যায়, তবুও লজ্জা না করে মাফ চেয়ে নিবে। কারণ, দুনিয়ার মা'মুলী লজ্জার চেয়ে আখেরাতের আগুন কোটি গুণ ভয়াবহ ও মারাত্মক। কারো গীবত করে থাকলে বা মৌখিকভাবে কাউকে গালমন্দ করে কষ্ট দিয়ে থাকলে তাদের থেকে মাফ চেয়ে নিতে হবে। তাদের কেউ যদি মৃত্যুবরণ করে থাকে তাহলে তার ওয়ারিছদেরকে দিয়ে দেবে, আর যদি তাদের কাউকে না পায় তাহলে তার জন্য ইস্তিগফার করবে এবং সম্ভব হলে তার জন্য কিছু দান-খয়রাত করবে। ইনশাআল্লাহ তাতে সে খুশি হয়ে ঋণ মাফ করে দিবে।

মুমূর্ষু অবস্থায় আমলগুলো করবে বা অন্যের মাধ্যমে করিয়ে নিবে.

(১) নিজে বেশি বেশি ইস্তিগফার, কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকবে, আর মৃত্যুর পর তাকে কেন্দ্র করে যাতে কোন রকম শরীআত বিরোধী কাজকর্ম না হয়, তার আত্মীয়-স্বজনদের কারো থেকে মৃত ব্যক্তির জন্য কষ্টদায়ক কোন কাজ যেমন : আওয়াজ করে ক্রন্দন করা, বুক-মাথা চাপড়ানো, পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়ে ফেড়ে ফেলা, মুখে জাহিলী যুগের শব্দ উচ্চারণ করা ইত্যাদির কোন কিছু যেমন প্রকাশ না পায়, বিশেষ করে দাফনে যাতে বিলম্ব না করা হয় বরং তাকে তাড়াতাড়ি তার ঠিকানা বেহেশতের বাগান কবরে পৌঁছে দেয়া হয় এবং তিন দিনা, সাত দিনা, ত্রিশা, চল্লিশা, কুলখানী বা অর্থের বিনিময়ে খতম, মীলাদ ইত্যাদির আয়োজন যেন কিছুতেই না করা হয়, সে জন্য আত্মীয়-

স্বজনকে জোর তাকিদমূলক অসিয়্যত করে যাবে। বরং আগেই অসিয়্যত নামা লিখে যাবে। .

(বুখারী শরীফ, হাদীস নং ১২৯৪, ১২৮৭, ১৩১৫, ২৬৯৭, ২৭২৭৩৮, মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ৯৩৩, ১৭১৮, ১৬২৭).

(২) হায়াতে ছেলেদেরকে কোন কিছু হেবা করলে মেয়েদেরকেও সেই পরিমাণ হেবা করবে। তবে সন্তানাদির কেউ যদি বেশি দীনদার বা আলেম হয় এবং সে আর্থিক দিক দিয়ে অসচ্ছল হয়, আর অন্যরা সম্পদশালী হয়। কিংবা এমন হয় যে, তাদেরকে সম্পদ হেবা করে গেলে আল্লাহর নাফরমানীতে তা খতম করে ফেলবে, তাহলে এ ক্ষেত্রে দীনদার ছেলেকে সম্পদ বেশি দিলে শরীআতে কোন নিষেধ নেই। বরং এটা হবে উত্তম কাজ। কারণ, এ সুরতে ঐ সম্পদ আল্লাহর দীনের কাজে ব্যয় হবে। . (আল বাহরুর রায়িক ৭/ ৪৯০).

(৩) যথাসম্ভব সর্বক্ষণ কোন না কোন আমলের মধ্যে নিমগ্ন থাকার চেষ্টা করবে। বিশেষ করে নিম্নোক্ত আমলগুলো গুরুত্ব সহকারে করবে : .

(ক) বেশি বেশি কালিমায়ে তায়্যিবা ও কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করবে।. (মুসতাদরাকে হাকেম-হাদীস নং-১২৯৯, মুসনাদে আহমদ-হাদীস নং-২২০৯৫, আবু দাউদ শরীফ- হাদীস নং-৩১১৬).

(খ) নিম্নের এই দু‘আ৪০ বার পাঠ করবে-.

لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين لا اله الا الله والله اكبر- لا اله الا لله وحده لا شريك له لا له الا الله له الملك وله الحمد لا اله الا لله لا

حول ولا قوة الا بالله-

.উপরোক্ত দু‘আপাঠ করে মৃত্যুবরণ করলে বিছানায় মৃত্যুবরণ করেও শাহাদাতের মউত নসীব হয়। আর ঐ অসুখে মৃত্যু না আসলেও উক্ত দু‘আ পাঠের ফযীলতে সমস্ত সগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যায়। . (মুসতাদরাকে হাকেম-১/ ৫).

(গ) মৃত্যুর আলামত প্রকাশ পেলে কিবলামুখী হয়ে ডান কাতে শুয়ে পড়বে, বা অন্য কাউকে শুইয়ে দিতে বলবে এবং নিম্নোক্ত দু‘আ পাঠ করবে।.

اللهم انى اهوذبك فى غمرات الموت وسكرات الموت-

.উক্ত দু‘আ পাঠ করলে মৃত্যুকষ্ট অনেকটা লাঘব হয়। .
(তিরমিযী শরীফ-১/ ১৯২)

.বি.দ্র.- মৃত্যুর আলামতসমূহ নিম্নরূপ : .

(১) নাক একদিকে সামান্য বাঁকা হয়ে যাওয়া।.

(২) শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত বেগে প্রবাহিত হওয়া ও ঘন ঘন নিঃশ্বাস নেয়া।.

(৩) পা ঢিলা হয়ে যাওয়া এবং দাঁড়াতে না পারা।.

(৪) কানপট্টি ভেঙ্গে যাওয়া। .

(আদ্ দুররুল মুখতার-২/ ১৮৯, আহকামে মায়্যিত-২২৬).

(ঘ) মৃত্যুর আলামত পুরোপুরি প্রকাশ পেলে পড়তে থাকবে-.

اللهم اغفرلى وارحمنى والحقنى بالرفيق الاعلى-

.এবং সেই সাথে কালিমায়ে তায়্যিবা বা অন্য কোন যিকির করতে চেষ্টা করবে। (তিরমিযী শরীফ-২/ ১৮৭, আবু দাউদ শরীফ-হাদীস নং-৩১১৬)

মৃত্যুরোগে আক্রান্ত অবস্থায় বর্জণীয় কাজ.

(ক) রোগীর চিকিৎসার ব্যাপারে হালাল হারামের খেয়াল করা হয় না, অনেক সময় হারাম জিনিস দ্বারা চিকিৎসা করা হয়, হিন্দুদের থেকে ঝাড়-ফুঁক, তাবীজ নেয়া হয়, অথচ তারা কুফরী কালাম দিয়ে এগুলো করে থাকে। . (আবু দাউদ শরীফ-হাদীস নং-৩৮৭০, ৩৮৭৪, আহকামে মায়্যিত-২২৩).

(খ) রোগীর উযু, নামায, সতর ইত্যাদির ব্যাপারে খেয়াল করা হয় না, অথচ এ অবস্থায়ও তার উপর এগুলো জরুরী। তাই মৃত্যুরোগীর নিকটাত্মীয়দের এগুলোর ব্যাপারে যত্নবান হওয়া উচিত।. (আহকামে মায়্যিত-২২২, ২১৯).

(গ) অনেকে রোগী দেখতে যেয়ে সুন্নাত মুতাবিক দু'আতো পড়েই না উপরন্তু রোগীর সামনে এমন এমন কথা বলে যার দ্বারা রোগী তার হায়াত থেকে নিরাশ হয়ে যায়, এটা মরাত্মক ভুল। . (মুসলিম শরীফ-হাদীস নং-৯১৯, নাসায়ী শরীফ-হাদীস নং-১৮২৫, আবু দাউদ শরীফ-হাদীস নং-৩১১৫).

(ঘ) মুমূর্ষাবস্থায় মৃত্যুরোগী এক তৃতীয়াংশের অতিরিক্ত সম্পদে কারো জন্য অসিয়্যত করবে না। কারণ, মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর এর অতিরিক্ত সম্পদ থেকে তার

মালিকানা খতম হয়ে যায়। . (আহকামে মায়্যিত-২২৬).

(ঙ) কোন ওয়ারিছের জন্য সম্পদের অসিয়্যত করবে না। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী অনুযায়ী ওয়ারিছের জন্য মৃতুরোগী কর্তৃক কৃত সম্পদের কোন অসিয়্যত গ্রহণযোগ্য নয় এবং তা জায়েযও নয়। সুতরাং পিতা তার পুত্রের জন্য বিশেষ কোন সম্পদের অসিয়্যত করতে পারবে না, যদিও তার ছোট ছেলে বা মেয়ের জন্য হোক না কেন? স্বামী তার স্ত্রীর জন্য কিংবা স্ত্রী তার স্বামীর জন্য মুমূর্ষাবস্থায় কোন অসিয়্যত করতে পারবে না। অন্যান্য আত্মীয়দের ক্ষেত্রেও একই হুকুম।.

(মুসনাদে আহমদ-হাদীস নং ১৭৬৮০, ইবনে মাজাহ শরীফ-হাদীস নং-২৭১৩).

(চ) মুমূর্ষাবস্থায় সন্তানাদিকে সামনে এনে বিভিন্ন সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। যেমন : টাকা কোন্ ব্যাংকে রেখেছ? অমুক জমির পজেশন কি? ইত্যাদি। এগুলো একেবারেই অনুচিত। কারণ, এর দ্বারা মৃত্যুরোগীর অন্তর দুনিয়ামুখী হয়ে যায়। আর জীবনের শেষ মুহূর্তে তার অন্তরকে দুনিয়ামুখী করা মারাত্মক ভুল। . (আহকামে মায়্যিত-২২৮) .

(ছ) মুমূর্ষাবস্থায় নিজের কোন অঙ্গ যেমন : চক্ষু, কিডনী ইত্যাদি দানের অসিয়্যত করে যাবে না। কারণ, কারো কোন অঙ্গ তার মালিকানাধীন নয়, বরং সবকিছুতেই মালিকানা একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের। মানুষকে সাময়িকভাবে হেফাজত করা ও দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণে ব্যবহার করার অনুমতি দেয়া হয়েছে মাত্র।

. (কানযুল উম্মাল : ২/ ৯৩, ফাতাওয়ায়ে শামী-৫/ ৫৮).

(জ) কালিমার তালক্বীন করার ক্ষেত্রে মৃত্যুরোগীকে কালিমা পড়তে আদেশ দেয়া হয়, যা একেবারেই অনুচিত। কারণ, মুমূর্ষুরোগী মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর হয়ে কালিমা পড়তে অস্বীকার করে বসতে পারে। পরিণতি এই হয় যে, একটা মুস্তাহাব আমল করাতে গিয়ে একজন ঈমানদার ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। কতবড় স্পর্শকাতর বিষয়! আমরা কি এক মূহূর্তও চিন্তা করে দেখেছি? সুতরাং তাকে কালিমা পড়তে হুকুম করবে না; বরং মৃত্যুরোগী শুনতে পায় এতটুকু আওয়াজে তার পাশে কালিমা পড়তে থাকবে, যাতে করে সে তা শুনে নিজেও পড়ে নেয়। একবার পড়ে নিলে দ্বিতীয়বার পড়ার জন্য আর তালক্বীন করবে না। শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত কালিমার তালক্বীন করতেই থাকতে হবে- এমন মনে করা ভুল।. (আদ্ দুররুল মুখতার ২/ ১৯১).

(ঝ) অনেকে মূর্খতাবশত রোগীর নিকট সূরা ইয়াসীন পড়তে দেয় না। তারা মনে করে এটা পড়াতে রোগীর আর বাঁচার আশা থাকে না, এমনটি মনে করা ভুল।.

(আবু দাউদ শরীফ-হাদীস নং-৩১২১, সহীহ ইবনে হিব্বান-হাদীস নং-২৯৯১, আদ্ দুররুল মুখতার-২/ ১৯১)

মৃত্যুর পর করণীয় কাজ.

(ক) কারো মৃত্যুর খবর কানে পৌঁছার সাথে সাথে এই দু'আ পড়বে : . انا لله وانا اليه راجعون- . (মুসলিম শরীফ-

হাদীস নং-৯১৮).

অতঃপর কিছু সূরা ও দরূদ শরীফ পড়ে তার রুহের মাগফিরাতের জন্য অন্তরে অন্তরে দু'আকরবে আর মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনরা নিম্নোক্ত দু'আটিও পড়বে اللهم اجرنى فى مصيبتى واخلفنى خيرا منها

. (মুসলিম শরীফ-হাদীস নং-৯১৮, মুসনাদে আহমদ-হাদীস নং-১৬৩৫০). এবং বিরহ বেদনার উপর সবর করবে, কোনরূপ অধৈর্য্য প্রকাশ করবে না।.

(খ) ইন্তিকাল হওয়া মাত্রই তার হাত-পা সোজা করে দিবে, উভয় পা ফিতা বা কাপড়ের টুকরা দ্বারা বেঁধে দিবে, চোখ-মুখ বন্ধ করে দিবে, মুখ সহজেই বন্ধ করা না গেলে বা বন্ধ না থাকলে থুতনি ও মুখ কোন কিছু দ্বারা বেঁধে দিবে এবং পেটে ভারী কিছু রেখে দিবে, যেমন হাওয়া ঢুকে পেট ফুলে না যায়। সম্পূর্ণ শরীর চাদর দ্বারা ঢেকে দিবে এবং তাকে আর মাটিতে বা ফ্লোরে রাখবে না, বরং কোন খাটিয়ার উপর রাখবে। . (আদ্ দুররুল মুখতার-২/ ১৯৩).

(গ) মৃত ব্যক্তিকে খাটিয়ায় রাখার সময় এই দু'আপড়বে : .

بسم الله وعلى ملت رسول الله-

.অতঃপর এই দু'আপড়বে-.

اللهم يسر عليه امره وسهل عليه ما بعده واسعده بلقائك واجعل ما خرج اليه خيرا مما خرج منه-

(ঘ) আর পার্শ্ববর্তী লোকজন বা আত্মীয়-স্বজনদের কর্তব্য হচ্ছে তারা মৃত ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দেরকে সান্ত্বনা

দিবে এবং তাদেরকে সবর করতে বলবে। বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দিলে তার বরাবর সওয়াব পাওয়া যায়।.

(ফাতাওয়ায়ে শামী, ২ : ১৯৩ ও ৬ : ২৬/ আহকামে মায়্যিত, ৩০-৩১, ৯৩, মুসনাদে আহমদ : ৫/ ২৭২).

(ঙ) ইন্তিকালের সাথে সাথে মৃত ব্যক্তির আত্মীয় বা অন্যরা তার মৃত্যুর খবর এ'লান/ ঘোষণা করে দিবে এবং কাফন-দাফনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার লক্ষ্যে যাবতীয় কাজ তথা গোসল, কাফন, কবর খনন ইত্যাদি ভাগ করে নিবে এবং নিজেরা কয়েকভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে।.

(বুখারী শরীফ, হাদীস নং ১৩১৫, (আবু দাউদ শরীফ- হাদীস নং-৩১৫৯, ফাতাওয়ায়ে শামী-৩/ ৮৩ মাকতাবায়ে যাকারিয়া).

কিছু লোক মৃতকে গোসল দেয়ার জন্য বরই পাতা মিশ্রিত পানি গরম করে গোসলের সব রকম ব্যবস্থা সম্পন্ন করবে। আত্মীয়-স্বজনদের মধ্য থেকে যে বেশি দীনদার তার মাধ্যমে গোসল দেয়ানো ভাল। অন্য যে কোন মুসলমান ব্যক্তিও গোসল দিতে পারেন। প্রয়োজনে স্ত্রী স্বামীকে গোসল দিতে পারে। তবে স্বামী স্ত্রীকে গোসল দিতে পারবে না। সুতরাং এরূপ অপারগতার ক্ষেত্রে স্বামী হাতে কাপড় পেচিয়ে স্ত্রীকে তায়াম্মুম করিয়ে দিবে। এ ক্ষেত্রে গোসলের প্রয়োজন নেই। গোসল এমন নির্জন স্থানে দিবে যেখানে অন্য লোকেরা ভিড় জমাবে না। . (ফাতাওয়ায়ে শামী-৩/ ৮৭, ৯০, ১৪৬- মাকতাবায়ে যাকারিয়া).

মৃত ব্যক্তিকে গোসল ও কাফন দেয়ার

তরীকা.

১. মায়্যিতকে খাটিয়ার উপর শুইয়ে তার নাভি থেকে হাটু পর্যন্ত মোটা কাপড় দ্বারা ঢেকে তার পরিধানের সব কাপড় খুলে দিবে।.

২. তারপর হাতে কাপড় পেঁচিয়ে ৩/ ৫ ঢিলা দ্বারা ইস্তিঞ্জা করিয়ে ঐ স্থান ধৌত করে দিবে।.

৩. তারপর নাকে, মুখে, কানে তুলা দিয়ে উযু করাবে। তবে মুখে ও নাকে পানি প্রবেশ করাবে না। প্রথমে চেহারা তারপর কনুইসহ দু'হাতে ধোয়াবে, অতঃপর মাথা মাসাহ করিয়ে উভয় পা ধোয়াবে।.

৪. গোলাপ, সাবান বা এ জাতীয় জিনিস দ্বারা মাথা ধোয়াবে।.

৫. মায়্যিতকে বাম কাঁতে শুইয়ে শরীরের ডান পার্শ্বে মাথা থেকে পা পর্যন্ত বরই পাতা মিশ্রিত হালকা গরম পানি তিনবার এমনভাবে ঢেলে গোসল করাবে যাতে পানি বাম পাশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অতঃপর ডান কাঁতে শুইয়ে শরীরের বাম পার্শ্বে মাথা থেকে পা পর্যন্ত আগের নিয়মে তিনবার ধোয়াবে।.

৬. অতঃপর মায়্যিতকে নিজের শরীরের সাথে ঠেস লাগিয়ে কিঞ্চিত বসিয়ে হালকাভাবে পেটের উপর থেকে নিচের দিকে মালিশ করবে। তারপর কাপড় পেচানো হাতে ইস্তিঞ্জার জায়গা মুছে ফেলে প্রয়োজনে ধুয়ে দিবে।.

উল্লেখ্য যে, এতে উযু গোসলের কোন ক্ষতি হবে না।.

৭. অতঃপর মায়্যিতকে আরেকবার বাম কাঁতে শুইয়ে কর্পুর মিশানো পানি শরীরের ডান পার্শ্বে মাথা থেকে পা

পর্যন্ত তিনবার এমনভাবে ঢালবে যেন বাম পাশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অনুরূপভাবে অপরদিকেও ঢালবে।.

৮. এরপর শুকনো কাপড় দ্বারা সমস্ত শরীর ভালভাবে মুছে দিবে।.

৯. মায়্যিতকে কাফনের উপর রাখার পর তার নাক-কানের তুলা বের করে ফেলবে। অতঃপর তার মাথায় এবং পুরুষ হলে দাঁড়িতেও আতর লাগিয়ে দিবে। কাফনের কাপড়ে আতর লাগাবে না বা তুলায় লাগিয়ে মায়্যিতের কানে ঢুকাবে না। তাছাড়া কপালে, নাকে, উভয় হাতের তালুতে, উভয় হাঁটুতে এবং পায়ে কর্পুর লাগিয়ে দিবে।.

১০. মায়্যিতের পশম, মোচ, চুল, নখ কাটবে না এবং তার চুল আচড়াবে না। যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় রেখে দিবে। গোসল শেষে কাফন পরিয়ে অতিসত্বর জানাযা নামাযের ব্যবস্থা করবে। .

(ফাতাওয়ায়ে শামী ২/ ১৯৮/ হিদায়া, ১/ ১৭৯/ আহকামে মায়্যিত, ৩৯-৪০).

আর কিছু লোক কাফনের কাপড় খরীদ করে তা প্রস্তুত করবে। পুরুষের জন্য ৩ কাপড় আর মহিলার জন্য পাঁচ কাপড় দিবে। পুরুষদের জন্য আড়াই হাত বহরের ৮/ ৯ গজ এবং মহিলাদের জন্য ১১/ ১২ গজ কাপড় হলেই যথেষ্ট। ঠেকাবশত এর চেয়ে কম হলেও চলবে।আর একদল লোক খাটিয়ার ব্যবস্থা করবে।আর কিছু লোক কবর খননের ব্যবস্থা করবে। মাটি শক্ত হলে বুগলী কবর তৈরী করা উত্তম, নতুবা সাধারণ কবর তৈরী করবে।আর কিছু মানুষ মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের বাড়ীতে মৃত্যুর খবর এবং জানাযা নামাযের সময় জানানোর জন্য যাবে।

এভাবে কাফন-দাফনের কাজ দ্রুত সমাধা করে ফেলবে।.

কাফন-দাফনের পর জরুরী করনীয় বিষয়.

(১) সবাই মৃত ব্যক্তির জন্য মনে মনে দু'আ-ইস্তিগফার করতে থাকবে।.

(২) জানাযা প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথেই ইমাম সাহেব জানাযা নামাযের ব্যবস্থা করবেন। ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান বা তার প্রতিনিধি জানাযা নামাযের ইমামতির প্রথম হক্কদার। তারা উপস্থিত না থাকলে মৃতব্যক্তির সন্তান যদি নেককার, পরহেযগার আলেম হন এবং মহল্লার ইমাম থেকে বেশি দীনদার হন, তাহলে তিনিই জানাযার নামায পড়ানোর বেশি হকদার। এজন্য প্রত্যেকেরই উচিত-ছেলেকে যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য তাকে খালিস দীনী শিক্ষায় শিক্ষিত করা। কারণ, নিজের ছেলে যে অন্তর নিয়ে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করবে, এটা অন্য কারো জন্য সম্ভবপর নয়। আর ছেলে যদি এ ধরনের যোগ্যতা সম্পন্ন না হয়, তাহলে মহল্লার ইমাম জানাযার নামায পড়ানোর বেশি হকদার। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে জানাযার নামায মহল্লার ইমাম সাহেব পড়াবেন। .

(আদ দুররুল মুখতার, ২/ ২১৯/ আহকামে মায়্যিত, ৭৯).

(৩) জানাযা যদি মাকরূহ সময়ে প্রস্তুত হয়, যেমন- সূর্য উঠা, সূর্য মাথার উপর থাকা বা সূর্য ডুবার সময় হয়, তাহলে দাফনে বিলম্ব রহিত করার জন্য সে সময়েই জানাযা পড়ে নিবে। দেরী করার প্রয়োজন নেই। তবে জানাযা প্রস্তুত হওয়ার পরে অলসতা করে বা কোন কারণে দেরী হওয়ায়

যদি উল্লেখিত মাকরূহ সময় এসে যায়, তাহলে সে সময় জানাযা পড়বে না; বরং মাকরূহ ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পরে জানাযা পড়বে। তবে ফজরের নামাযের পর বেলা উঠার আগে ও আসরের পরে বেলা ডুবার পূর্বের সময়টা নফল নামাযের জন্য মাকরূহ সময় হলেও জানাযার জন্য মাকরূহ সময় নয়। সুতরাং সে সময় জানাযার নামায পড়তে কোন অসুবিধা নেই।.

(হিদায়া, ১/ ৮৬/ ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম, ৫/ ৩৩৫).

জুমুআ বা ফরয নামাযের জামাআতের পূর্বে জানাযা প্রস্তুত হলে, যদি জানাযা পড়ে দাফন সেরে এসে ফরয নামাযের জামাআত পাওয়া যায়, তাহলে দাফন কার্য আগে সারতে হবে। তারপর জামাআতে শরীক হবে। এক্ষেত্রে ফরয নামাযের পরে জানাযা নামায পড়ার জন্য দেরী করা নিষেধ। কারণ, এতে দাফন বিলম্বিত হয়। আর যদি দাফন সেরে জামাআত পাওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে ফরয নামাযের পর জানাযার নামায আদায় করবে। জানাযা নামায সুন্নাতের পরেও পড়া যায় বা ফরয নামাযের পরপরই পড়ে নেয়া যায়। তবে বর্তমান যমানায় যেহেতু মানুষের অন্তরে সুন্নাতের তেমন কোন গরুত্ব নেই বললেই চলে, তাই জানাযার নামাযের জন্য বের হলে অনেকে সুন্নাত থেকে মাহরূম হয়ে যায় বিধায় ফুকাহায়ে কিরাম সুন্নাত নামাযের পর জানাযা পড়াকে উত্তম বলেছেন।. (ফাতাওয়ায়ে শামী, ২/ ১৬৭/ আহকামে মায়্যিত, ৬৫-৬৬).

(৪) লাশ কবরস্থানে নেয়ার সময় মধ্যম গতিতে চলবে। একেবারে ধীর গতিও নয় আবার খুব দ্রুত গতিও নয়।

(ফাতাওয়ায়ে শামী-৩/ ১৩৬).

(৫) যে স্থানে মৃত্যু হয়েছে মৃত ব্যক্তিকে তার নিকটস্থ কোন গোরস্থানে দাফন করে দিবে। শরঈ কোন উযর ছাড়া দাফনের জন্য দূরে নেয়া নিষেধ।

(ফাতাওয়ায়ে শামী-৩/ ১৪৬).

(৬) মৃত ব্যক্তি মহিলা হলে তার পূর্ণ শরীর ভালভাবে চাদরাবৃত করে রাখবে এবং চাদরাবৃত অবস্থায়ই তাকে কবরে নামাবে, যাতে তার কোন অঙ্গ না-মাহরামদের দৃষ্টিগোচর না হয়।

(৭) কোন অসুবিধা না থাকলে মুর্দার খাট কবরের পশ্চিম পার্শ্বে রাখবে এবং সেখান থেকেই মুর্দাকে কবরে নামাবে। আর অসুবিধা থাকলে খাটিয়া যে দিকে রেখে লাশ কবরে নামানো সুবিধা হয়, সেদিক দিয়েই তাকে কবরে নামাবে। (ফাতাওয়ায়ে শামী-৩/ ১৩৯).

(৮) কবরে নামানোর পর-. بسم الله وعلى ملت رسول الله .বলে মুর্দাকে সম্পূর্ণ ডান কাঁতে কিবলামুখী করে শোয়াতে হবে। এটাই সুন্নাত তরীকা। .(আবু দাউদ শরীফ/ আদ দুররুল মুখতার, ২/ ২৩৫/ ইমদাদুল ফাতাওয়া, ১/ ৪৮৫/ আহকামে মায়্যিত, ২৩৬).

উল্লেখিত দু'আর মধ্যে এভাবে শোয়ানোর কথা ঘোষণা করা হলেও আফসোসের কথা হচ্ছে, মুখে তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরীকায় শোয়ানোর কথা স্বীকার করা হয়; অথচ কাজ করা হয় তার সম্পূর্ণ উল্টো। অর্থাৎ মুর্দাকে চিৎ করে কবরে এমনভাবে শোয়ানো হয়, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে শিক্ষা দেননি। সুতরাং মুখের কথার মধ্যে আর কাজের মধ্যে কোন মিল

হয় না। এ ব্যাপারে শরীআতের মাসআলা হল, জীবিত মানুষ যেভাবে সুন্নাত তরীকায় ডান কাতে শয়ন করে, মুর্দাকে সেভাবে কবরে ডান কাঁতে শোয়ানো সুন্নাত। চিৎ করে শোয়ানো এবং ঘাড় মুচড়িয়ে চেহারাটাকে কোন রকমে কিবলামুখী করা শরীআত সম্মত নয় বরং সম্পূর্ণ ডান কাঁতে শোয়াবে, যাতে স্বাভাবিক ভাবে চেহারা কিবলামুখী হয়ে যায়। এ জন্য কোন বিজ্ঞ আলিম বা মুফতী সাহেবের নিকট থেকে কবর খননের নিয়ম শিখে নেয়া দরকার যাতে ডান কাতে শোয়ালে লাশ কোন দিকে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে। এ মাসআলাটি ব্যাপকভাবে প্রচার করা কর্তব্য; যাতে সকল মুসলমানকে কবরে সহীহ তরীকায় রাখা হয়।.

শরীআতের দৃষ্টিতে সীনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। সীনার মধ্যে থাকে কলব বা অন্তর। আর কলবের মধ্যেই থাকে ঈমান। সুতরাং সীনাকে কিবলামুখী করে রাখা উচিত। সীনা এত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ যে, নামাযে মুখ ঘুরে গেলে নামায মাকরূহ হয়, কিন্তু নামায ভঙ্গ হয় না; অথচ সীনা ঘুরে গেলে নামায ভঙ্গ হয়ে যায়। সুতরাং ভারতবর্ষে সীনা আসমানের দিকে রেখে চিৎ করে শুইয়ে দাফন করার যে গলদ তরীকা চালু হয়ে গেছে তার আশু অবসান হওয়া জরুরী।.

(ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী-১১৬৬, রহীমিয়্যাহ-৮/ ১৭৫).

(৯) যারা দাফন কার্যে অংশ নিবে, সম্ভব হলে তারা মৃত ব্যক্তির মাথার দিকে ডান হাতে তিনবার মাটি দিবে। প্রথমবার মাটি দেয়ার সময় পড়বে منها خلقناكم দ্বিতীয়বার মাটি দেয়ার সময় পড়বে- وفيها نعيدكم আর তৃতীয়বার মাটি

দেয়ার সময় পড়বে- ومنها نخرجكم تارة اخرى (আহকামে মায়্যিত-৮৯).

(১০) দাফন কার্য শেষে মৃত ব্যক্তির মাথার নিকট সূরা বাকারার শুরু থেকে مفلحون পর্যন্ত এবং পায়ের নিকট দাঁড়িয়ে ঐ সূরার শেষ দুই আয়াত অর্থাৎ امن الرسول থেকে শেষ পর্যন্ত পড়বে।.

(বাইহাকী শরীফ-হাদীস নং-৭০৬৮, তাবরানী শরীফ-হাদীস নং-১৩৬১৩ ইমদাদুল মুফতীন-৪৪৭).

(১১) সম্ভব হলে বেশি আপনজনেরা দাফনের পর কবরের পাশে আরো ঘন্টাখানেক অবস্থান করবে এবং মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আয় রত থাকবে যাতে মুনকার-নকীরের সম্মুখে তার প্রশ্নোত্তর সহজ হয়।

(আদ্ দুররুল মুখতার-২/ ২৩৭).

(১২) জানাযা নামাযের পর পরিচিত কেউ দাফনে শরীক না হয়ে চলে যেতে চাইলে মৃত ব্যক্তির ওলীদের নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে যাবে।

(আহসানুল ফাতাওয়া-৪/ ২১৪).

(১৩) দাফনকার্য শেষ হওয়ার পর সূরা ফাতিহা, সূরা ইখলাস এবং দরূদ শরীফ ইত্যাদি পড়ে মায়্যিতের জন্য সওয়াব রেসানী করতে পারে এবং সকলে মিলে দুআ করতে পারে। (আহসানুল ফাতাওয়া-৪/ ২২৩).

(১৪) পার্শ্ববর্তী আত্মীয়-স্বজনেরা মৃতব্যক্তির পরিবারবর্গের জন্য একদিনের খাবারে ব্যবস্থা করবে। কেননা, দুঃখ-বেদনার কারণে মায়িত্যের আত্মীয়দের খাবার পাকানো/ রান্না করা এবং তা খাওয়ার দিকে খেয়াল থাকে না।

(আযীযুল ফাতাওয়া-৩২৪)

মৃত্যুর পর বর্জনীয় কাজ.

(১) কারো ইন্তিকালের পর তার লাশ মাটির উপর রাখবে না বরং কোন খাটিয়ার উপর রাখবে। (আদ দুররুল মুখতার-৩/ ৮৪).

(২) সবরের পরিপন্থী কোন আচরণ কারো থেকে প্রকাশ না পায় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবে। যেমন : বড় আওয়াজে ক্রন্দন করা, পরিধেয় বস্ত্র ছিড়ে ফেড়ে ফেলা, মাথা-বুক চাপড়ানো, জাহিলী যুগের শব্দ মুখে উচ্চারণ করা ইত্যাদি থেকে অবশ্যই বিরত থাকবে। কারণ, এর ফলে মৃত ব্যক্তিকে অনেক ক্ষেত্রে আযাব ভোগ করতে হয়। তবে অন্তর ব্যথিত হওয়া এবং মৃত্যুশোকে চোখ দিয়ে অশ্রু বের হওয়া সবর পরিপন্থী নয়, বরং তা সুন্নাত।

স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পুত্র হযরত ইবরাহীম (রা.)-এর ইন্তিকালে পর রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চোখ দিয়ে পানি বের হয়েছে।.

(বুখারী শরীফ-হাদীস নং-৬২৯৪, তিরমিযী শরীফ-হাদীস নং- ৯৮৪).

(৩) মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার পূর্বে তার পাশে বসে কুরআন তিলাওয়াত করবে না বরং সওয়াব রেসানীর জন্য কুরআন খানী করতে চাইলে তা অন্য স্থানে করবে। তবে তা বিনা পারিশ্রমিকে হওয়া জরুরী। .

(আদ্ দুররুল মুখতার-৩/ ৮৩, রহীমিয়াহ-৮/ ১৯৭).

(৪) ইন্তিকালের পরও পর্দার বিধান বহাল থাকে। তাই জীবদ্দশায় যাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ নাজায়েয ছিল তারা

মৃত ব্যক্তিকে দেখতে পারবে না। সুতরাং বেগানা পুরুষের লাশ বেগানা মহিলাদের জন্য দেখা নিষেধ, তেমনিভাবে বেগানা মহিলার লাশ বেগানা পুরুষের জন্য দেখা নিষেধ। তবে স্বামীর-স্ত্রীর মৃত্যুর পর একে অপরের চেহারা দেখতে পারবে।.

(সূরা নিসা, আয়াত-২২, ফাতাওয়ায়ে শামী, ২/ ১৯৫-১৯৮/ আহসানুল ফাতাওয়া, ৪/ ২১৯/ ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া, ২/ ৩৯৮).

এমনিভাবে আত্মীয়-স্বজনদের মধ্য থেকে যাদের পরস্পরে দেখা-সাক্ষাৎ নাজায়েয, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা একে অপরকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে। এ জাতীয় হারাম কাজ থেকে অবশ্যই বিরত থাকবে। (৫) অনেকে মৃত ব্যক্তির ছবি উঠিয়ে তা সংরক্ষণ করে এবং পত্রিকায় দেয়, যা অত্যন্ত গর্হিত কাজ, বিধায় তা থেকে বিরত থাকবে। (আহসানুল ফাতাওয়া-৪/ ২১৯).

(৬) মৃত ব্যক্তির পশম, গোঁফ, নখ, কর্তন করবে না। এমনিভাবে তার চুল দাড়ি আঁচড়ানো থেকেও বিরত থাকবে। সমাজের অনেক মূর্খ লোক মৃতব্যক্তির নাভীর নীচের পশম কাটাকে সুন্নাত মনে করে তাদের এ ধারণা ঠিক নয়।

(আদ্ দুররুল মুখতার-২/ ১৯৮).

(৭) মৃত্যুর পরে বিভিন্ন অজুহাতে আমাদের দেশে দাফনে যে দেরী করা হয় তা শরীআত সম্মত নয়। কারণ, শরীআতে মুর্দাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দাফন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে স্পষ্ট অনেকগুলো হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং বেশি দেরী করার অবকাশ নেই। কাজেই মায়্যিতের ছেলে মেয়েদের উপস্থিতির জন্য দাফনে দেরী করা

ঠিক নয়; বরং তারা অনুপস্থিত থাকলেও উপস্থিত আত্মীয়-স্বজন তাৎক্ষণিকভাবে দাফন কার্য শেষ করে ফেলবে, পরে তারা এসে কবর যিয়ারত করবে এবং দু'আকরবে। তারা দূরে থাকে এবং এসে দেখবে- এই অজুহাতে তাদের জন্য দাফনে বিলম্ব করা যাবে না।

(তিরমিযী শরীফ-১/ ২০৬).

(৮) অনেকে মায়্যিতের চেহারা দেখানোর জন্য অনেক সময় নষ্ট করে; অথচ এর জন্য আলাদা সময় বরাদ্দ করা ঠিক নয় বরং স্বাভাবিক কাজ কর্মের মধ্যে এটা সেরে নেয়া কর্তব্য বা একান্ত জরুরত পড়লে কাফন পরানোর পর জানাযার পূর্বে অল্প সময়ের মধ্যে দেখিয়ে দেয়া যায়। কিন্তু জানাযার পর বা কবরে শুইয়ে দেখানো উচিত নয়। এর মধ্যে কয়েক রকমের ক্ষতি রয়েছে।

(আহসানুল ফাতাওয়া-৪/ ২১৯).

(৯) অনেকে জানাযার জামাআতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য নানা অজুহাত পেশ করে থাকে। যেমন তারা বলে থাকে যে, এখন সকাল আট ঘটিকায় জানাযা পড়লে জানাযায় লোক সংখ্যা বেশি হবে না। সুতরাং বাদ জোহর-বাদ জুমুআ জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হবে। তাদের এ কথাও শরীআত সম্মত নয়। মৃত্যুর এ'লানের পর কারো জানাযায় যদি বেশি লোক উপস্থিত হয়, তাহলে এটা তার ভাগ্যের বিষয় এবং ফযীলতের জিনিস। কিন্তু তাই বলে জানাযার নামাযে বেশি লোক হাজির করার জন্য জানাযার নামায এত বিলম্ব করার অনুমতি নেই। এটা গুনাহের কাজ। গুনাহের কাজ করে বেশি লোক হাজির করার দ্বারা মায়্যিতের তো কোন ফায়েদা হবেই না; বরং কবরে মু'মিনের জন্য প্রস্তুতকৃত জান্নাতের বিছানা, জান্নাতের

লেবাস, জান্নাতের হাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে।.

মৃত ব্যক্তি আমাদের কারো মা হতে পারে, বাপ হতে পারে, ভাই হতে পারে, বোন হতে পারে; কিন্তু তারা কেউ তো আমাদের বান্দা নয়, বান্দা তো আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের। শরীআতের হুকুম লংঘন করে দাফনে বিলম্ব করলে আল্লাহর নিকট আমাদের জবাবদিহী করতে হবে। শুধু তাই নয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ঐ মৃত ব্যক্তির নিকটও জবাবদিহী করতে হবে। সুতরাং শরীআতের হুকুম লংঘন করে দাফনে বিলম্ব করলে আল্লাহর নিকট আমাদের জবাবদিহী করতে হবে। শুধু তাই নয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ঐ মৃত ব্যক্তির নিকটও জবাবদিহী করতে হবে। সুতরাং শরীআতের হুকুম অমান্য করে তার জানাযা ও দাফনে বিলম্ব করে জান্নাতের বিভিন্ন নিআমত থেকে তাকে বঞ্চিত করার অধিকার আমাদের নেই।

(আহসানুল ফাতাওয়া-৪/ ২৪২).

(১০) অনেক লোককে দেখা যায়- তারা মৃত্যুর পর লাশ দেশের বাড়িতে বাপ-মায়ের সাথে দাফন করার অসিয়্যত করে যায়। অথচ এরূপ অসিয়্যত করা শরীআত সম্মত নয়, এবং অন্যদের জন্য সে অসিয়্যত পূর্ণ করাও ঠিক নয়। অনেকে এ ধরনের অসিয়্যত ছাড়াও নিজের আত্মীয়-স্বজনের লাশ দেশের বাড়িতে নিয়ে যায়। এক দেশ থেকে আরেক দেশে নিয়ে যায়, বিদেশ থেকে দেশে নিয়ে আসে। অথচ এগুলো দাফনে বিলম্ব হওয়ার কারণ হওয়ায় এ সব কাজ নিষেধ।.

শরীআতের ফয়সালা হল, যে ব্যক্তি যে স্থানে বা যে

শহরে মারা গেল, তাকে তৎপার্শ্ববর্তী মুসলমানদের কোন গোরস্থানে দাফন করে দিতে হবে। লাশ দূরবর্তী কোন স্থানে স্থানান্তর করা যাবে না। কারণ, এতে দাফন বিলম্বিত হয় এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশের বিরোধিতা করা হয়। তাছাড়া অনেক টাকা-পয়সারও অপচয় হয়। সুতরাং তা কঠোরভাবে পরিত্যাজ্য।.

উল্লেখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, অথচ এসব ব্যাপারে বেশি শৈথিল্য লক্ষ্য করা যায়। কাজেই প্রত্যেকেরই উচিত (বিশেষ করে বিশিষ্ট উলামাদের কর্তব্য হচ্ছে) নিজের সন্তানাদি, পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়দেরকে সুস্থ অবস্থায় মাসআলাটি বুঝিয়ে আমল করার জন্য জোর তাগীদ দিয়ে যাওয়া, যাতে তার আত্মীয়রা এরূপ গর্হিত কাজগুলো না করে। এছাড়াও কাফন-দাফনে বিলম্ব হওয়ার আরো যত কারণ হতে পারে, তার সবগুলো পরিহার করা সকলের জন্য জরুরী কর্তব্য এবং যত কম সময়ে সম্ভব কাফন-দাফন কার্য সমাধা করা জরুরী।.

(বুখারী শরীফ-হাদীস নং-১৩১৫, আদ্ দুররুল মুখতার-৬/ ৬৬৬, আল বাহরুর রায়িক-২/ ৩৩৫, আহসানুল ফাতাওয়া-৪/ ২০৯, ২১০, আহকামে মায়্যিত, ৮৫).

(১১) অনেক জানাযার ক্ষেত্রে আরেকটি বদরসম লক্ষ্য করা যায় যে, জানাযার নামাযের পূর্বে সমবেত মুসল্লদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়, লোকটি কেমন ছিলেন? সকলে উত্তর দেয়, ভাল ছিলেন। এর ফযীলত বর্ণনা করা হয় যে, যদি তিনজন লোক কারোর ব্যাপারে ভাল বলে সাক্ষ্য দেয়, তাহলে আল্লাহ তাকে মাফ করে দেন। এবং তাকে জান্নাতবাসী করেন। এ হাদীস তো ঠিক কিন্তু এর অর্থ এ

ভাবে জবরদস্তিমূলক সাক্ষ্য উসূল করা নয়। বরং এর অর্থ হল, লোকেরা তাদের নিজস্ব আলোচনায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুর্দা ব্যক্তির প্রশংসা করবে যে, আহ! অমুক ব্যক্তি দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে, লোকটা বড় ভাল মানুষ ছিল! এ ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসা যদি মু'মিনদের থেকে প্রকাশ পায়, তাহলে সেটা সত্যিই ভাগ্যের বিষয় এবং ফযীলতের জিনিস কিন্তু জবরদস্তি সাক্ষ্য উসূল করার দ্বারা এ ফযীলত হাসিল হয় না। বরং অনেকে বাধ্য হয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় এবং এমন কথা মুখে বলে যা তার অন্তর স্বীকার করে না। এরূপ করা উচিৎ নয়।.

(১২) জানাযার নামায একাধিক বার পড়া হয় এটা শরীআত সম্মত নয়। বরং তা একবার হওয়াই বাঞ্ছনীয়। হ্যাঁ, যদি মৃত ব্যক্তির কোন ওলী জানাযায় শরীক না হয়ে থাকে এবং তার পক্ষ থেকে পূর্বে আদায়কৃত নামাযের অনুমতিও না থেকে থাকে, তাহলে সেই ওলী পূর্বের নামাযে যারা অনুপস্থিত ছিল তাদেরকে নিয়ে দ্বিতীয়বার জানাযা নামায পড়তে পারে। কিন্তু প্রথমবার যদি জানাযায় কোন ওলী শরীক হয়ে থাকে বা জানাযা পড়ার অনুমতি দিয়ে থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার জানাযার নামায পড়া জায়েয নয়।.

(ফাতাওয়ায়ে শামী-২/ ২২২-২২৩, আহসানুল ফাতাওয়া-৪/ ২১৩).

(১৩) তেমনিভাবে গায়েবানা জানাযার যে প্রথা চালু রয়েছে, তা-ও হানাফী মাযহাবে সহীহ নয়। গায়েবানা জানাযা জায়েয থাকলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনেক প্রিয় সাহাবী (রাযি.) বিভিন্ন জিহাদে

যে শহীদ হয়েছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই মদীনায় থেকে তাদের গায়েবানা জানাযা পড়তেন। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করেননি। যে দু'টি ঘটনা উল্লেখ করে কেউ কেউ এ বিষয়টিকে জায়েয বলতে চান, মূলত সেগুলো গায়েবানা জানাযা ছিল না। বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কুদরতে লাশ সচক্ষে দেখে দেখে জানাযা পড়িয়েছেন। যদিও লাশ দূরে ছিল, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বিশেষ ইন্তিজামের কারণে তা সম্ভব হয়েছিল বলে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং ঐ ঘটনা দ্বারা গায়েবানা জানাযার দলীল পেশ করা সহীহ নয়।.

(ফাতহুল ক্বদীর, ২/ ৮১/ , জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া-২/ ১৮, ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া-৭/ ২২৭).

(১৪) আরেকটি বদরসম হল, অনেকে জানাযার নামাযের পরে মুর্দার চেহারা দেখায়। অথচ জানাযা নামাযের পরে মুর্দার চেহারা আর না দেখানো উচিত। কারণ, প্রথমত এতে দাফন বিলম্বিত হয়, যা শরীআতে নিষিদ্ধ। .

(আহসানুল ফাতাওয়া-৪/ ২১৯, ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া-২/ ৩৯৮, বুখারী শরীফ-হাদীস নং-২৬৯৭).

দ্বিতীয়ত জানাযার পর মুর্দার ব্যাপারে ভাল-মন্দের ফয়সালা হয়ে যায়। অনেকের চেহারায় পরিবর্তনও আসে। তাতে আল্লাহ না করুন, তার চেহারা দেখানো হলে মাঝে কুধারণার সৃষ্টি হতে পারে, যা মুর্দার জন্য খুবই খারাপ। কারণ, মুমিনদের ধারণার ভিত্তিতে অনেক ফয়সালা হয়ে থাকে। কাজেই জানাযার নামাযের পর বিশেষ করে কবরে মায়্যিতকে রেখে মুর্দার চেহারা দেখানোর প্রথা বন্ধ করা

উচিত।.

(১৫) আরেকটি বদরসম এই যে, মুর্দাকে কাঁধে করে কবরস্থানে নেয়ার সময় লোকেরা উচ্চৈঃস্বরে কালিমায়ে তায়্যিবা ও কালিমায়ে শাহাদাত পড়তে থাকে, এটা ঠিক নয়।.

(বুখারী শরীফ, হাদীস নং-২৬৯৭, আদ দুররুল মুখতার-২/ ২৩৩, আহকামে মায়্যিত-২৪০, ইমদাদুল মুফতীন-১৬৪, আল বাহরুর রায়িক্ব, ২/ ৩৩৬).

বরং এক্ষেত্রে স্বাভাবিক গতিতে নীরবে দু'আকালাম পাঠ করা এবং মুর্দার জন্য মনে মনে ইস্তিগফার পড়তে পড়তে কবরস্থানের দিকে অগ্রসর হওয়া কর্তব্য। কোন রকম হাসাহাসি বা রং তামাশার কথা বলবে না। চিল্লাচিল্লী করে কান্নাকাটি করবে না; বরং মনে মনে চিন্তা করবে যে, আজ যেভাবে আমি মুর্দাকে নিয়ে যাচ্ছি, আগামীতে যে কোন সময় ঠিক এভাবে আমাকেও লোকেরা কাঁধে করে কবরস্থানে দাফন করে আসবে। এর জন্য আমার কি প্রস্তুতি আছে বা প্রস্তুতি নেয়ার জন্য আমি কেন বিলম্ব করছি।.

অনেক স্থানে মায়্যিতের খাটের উপর কালিমা বা আয়াতুল কুরসী ইত্যাদি আয়াত খচিত চাদর দিয়ে মায়্যিতকে ঢেকে দেয়া হয়, আবার অনেকে কাফনের কাপড়ে আয়াতুল কুরসী বা অন্য কোন আয়াত লিখে দেয়, এ সবই নাজায়েয। কেননা, এর দ্বারা পবিত্র কুরআনের আয়াতের বেহুরমতী ও অবমাননা হয়। অনেক ক্ষেত্রে কুরআনের আয়াতে নাপাক লেগে গিয়ে তা গুনাহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং এ জাতীয় প্রথা পরিহার করে মহিলা মায়্যিতকে সাধারণ চাদর দ্বারা ঢেকে দিবে। পুরুষ মায়্যিতকে ঢাকার

কোন প্রয়োজন নেই, তারপরও ঢাকতে চাইলে সাধারণ চাদর দ্বারা ঢাকতে পারে। .

(বুখারী শরীফ, হাদীস নং-২৬৯৭, আহসানুল ফাতাওয়া-১/ ৩৫১, ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া-২/ ৪০১).

(১৬) অনেকে লাশের আগে আগে বা পাশাপাশি চলতে থাকে, এটাও ঠিক নয়। বরং লাশ বহনকারী ব্যতীত সকলেই লাশের পিছে পিছে চলবে এবং লাশ জমিনে রাখার পূর্বে কেউ বসবে না। .

(আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং-৩১৮০, আদ্ দুররুল মুখতার-২/ ২৩৬, আল বাহরুর রায়িক-২/ ৩৩৩).

(১৭) জানাযা নামাযের পর অনেক স্থানে দাফনের পূর্বে সম্মিলিতভাবে দু'আও মুনাজাত করা হয়, এটা নাজায়েয। শরীআতে এর কোন ভিত্তি নেই। শরীআতের দৃষ্টিতে জানাযাই হচ্ছে মুর্দার জন্য দূ'আ স্বরুপ। সুতরাং উক্ত দু'আর পর আরেকটি দু'আকরার অর্থ হচ্ছে পূর্বের দু'আটি যথার্থ ছিল না এমন মনে করা। এটা যে কত বড় অপরাধ, তা সহজেই অনুমেয়! সুতরাং এ রসম বন্ধ করা অপরিহার্য কর্তব্য।.

(বুখারী শরীফ ২/ ৬৫২, আল বাহরুর রায়িক ২/ ৩২১, আহসানুল ফাতাওয়া-১/ ৩৫২, খুলাসাতুল ফাতাওয়া-১/ ২২৫).

তবে দাফন কার্য শেষ হওয়ার পর সূরা-কালাম পড়ে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা যায়। (ফাতাওয়ায়ে শামী-২/ ২৩৭).

(১৮) জানাযার ব্যাপারে আরেকটি বদরসম হল, বিনা অপারগতায় মসজিদে জানাযা পড়া। শরীআতের দৃষ্টিতে

মসজিদে জানাযা পড়া মাকরুহ। চাই জানাযা ও মুসল্লী মসজিদে থাকুক বা লাশ মসজিদের বাইরে এবং মুসল্লী মসজিদের ভিতরে থাকুক, সর্বাবস্থায় জানাযার নামায মাকরুহ হবে। এভাবে জানাযা পড়লে জানাযার ফরযে কেফায়া আদায় হয়ে যাবে বটে; কিন্তু সকলেই জানাযার নামায পড়ার বিরাট সওয়াব থেকে মাহরুম হয়ে যাবে। সুতরাং বিনা অপারগতায় কখনো মসজিদে জানাযা নামায না পড়া উচিত। বরং মসজিদের সামনে জানাযা নামাযের জন্য স্থান রাখা উচিত।.

উল্লেখ্য, নিয়ম হল- কোন মাঠে-ময়দানেই জানাযা নামায পড়া, অবশ্য যেখানে জানাযা নামায পড়ার মত কোন স্থান নেই বা স্থান আছে কিন্তু বৃষ্টি-বাদলের কারণে সেখানে পড়া সম্ভব হচ্ছে না। এ ধরনের অপরাগতার ক্ষেত্রে মসজিদে জানাযা নামায পড়ার অবকাশ আছে। তবে সে ক্ষেত্রেও এতটুকু চেষ্টা করা দরকার, যাতে করে মুর্দাকে মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করাতে না হয়। বরং ইমাম বরাবর বাইরে কোন ব্যবস্থা রাখবে।.

(ফাতাওয়ায়ে শামী, ২/ ২২৪-২২৫, আলবাহরুর রায়িক ২/ ৩২৭, নাসবুর রায়াহ ২/ ২৭৫).

(১৯)স্বাভাবিক ভাবে জানাযা তৈরী হয়ে যাওয়ার পর ওয়াক্তিয়া নামাযের সময় হয়ে গেলে জানাযার নামায ফরয নামায পরবর্তী সুন্নাত আদায়ের পর আদায় করবে। (আদ্ দুররুল মুখতার-২/ ১৬৭, ইমদাদুল ফাতাওয়া-১/ ৭৩৭).

দাফন পরবর্তী করণীয়

কাজ.

(১)আত্মীয়-স্বজনেরা মৃত ব্যক্তির জন্য আল্লাহর দরবারে মাগফিরাতের দুআ করতে থাকবে। কিতাবে রয়েছে-.

هدية الاحياء الى الاموات-

.অর্থ : ইস্তিগফার হচ্ছে জীবিতদের পক্ষ থেকে মৃতদের জন্য হাদিয়া স্বরূপ। (শুআবুল ঈমান লিল বাইহাকী-হাদীস নং ৭৫২৭).

এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা নিজেই দু'আ শিখিয়েছেন :

. (ক) ربی ارحمهما کما ربیانی صغیرا

.অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি (পিতা-মাতার) তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর যেমনটি তারা করেছেন আমাদের সাথে শৈশবে। (সূরা-বনী ইসরাঈল, আয়াত-২৪)

(খ). ربنا اغفرلی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب

.অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে এবং আমার পিতা-মাতাকে আর সকল মুমিনদেরকে হিসাব দিবসে ক্ষমা করুন। (সূরা ইবরাহীম, আয়াত-৪১).

মৃতরা নিজের অনেক নেক আমল দেখে আশ্চার্যান্বিত হয়ে আল্লাহর দরবারে জিজ্ঞাসা করবে, আয় আল্লাহ! এসব আমল তো আমি দুনিয়ায় থাকতে করিনি, তবে এগুলো কোত্থেকে আসলো? আল্লাহ বলবেন, তোমার নেক আওলাদরা তোমার জন্য দু'আ ইস্তিগফার করেছে। (মুসনাদে আহমাদ : ১/ ৫০৯).

(২) বিভিন্ন নফল ইবাদাত করে তার সওয়াব মৃত ব্যক্তির নামে বখশিয়ে দিবে। একই ইবাদতের সওয়াব

একাধিক ব্যক্তির জন্য পাঠালে সবাই তার পরিপূর্ণ সওয়াব পাবে। আর যে এই সওয়াব রেসানী করবে সেও ঐ পরিমাণ সওয়াবের ভাগী গবে। পূর্বে কৃত নফল ইবাদাতের সওয়াব রেসানী না করে থাকলে পরে নিয়ত করলেও তা মৃতের রূহে পৌঁছে যাবে।.

(ফাতাওয়ায়ে শামী-৩/ ১৫১, ১৫২).

মৃত পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য সওয়াব রেসানী করা তাদের হক বা প্রাপ্য এবং এটা জীবিতদের কর্তব্য। জীবিতরা মুর্দা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য যতটুকু করবে, তারা মৃত্যুর পর তাদের জীবিত আত্মীয়দের থেকে সেরূপ পাবে। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতার জন্য কিভাবে আল্লাহর দরবারে দু'আ করতে হবে তার শব্দ গুলোও তিনি নিজেও শিখিয়ে দিয়েছেন, আর তা কবুল করার ওয়াদাও করেছেন।. (সূরা বনী ইসরাঈল, ২৪).

সুতরাং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য ঈসালে সওয়াব বা সওয়াব রেসানী করা খুবই দরকার। হাদীস শরীফে এসেছে, মানুষকে যখন কবরে দাফন করা হয়, তখন তার অবস্থা ডুবন্ত মানুষের ন্যায় হয়ে যায়। নদীতে বা সাগরে যদি জাহাজ তলিয়ে যায়, তখন মানুষ যেমন দিশেহারা হয়ে চতুর্দিকে হাত মারতে থাকে এই ধারণায় যে, হাতে কোন কিছু আসে কিনা যা আঁকড়ে ধরে সে নিজের জান বাঁচাতে পারে। মুর্দারও সে অবস্থাই হয় এবং সে জীবিতদের সওয়াব রেসানীর অপেক্ষা করতে থাকে। যদি তার আপনজন, আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধব কিছু সওয়াব রেসানী করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা সেটাকে বহু গুণ বৃদ্ধি

করে জীবিতদের পক্ষ থেকে তাদের খেদমতে হাদিয়া হিসেবে পৌঁছে দেন। . (শুআবুল ঈমান লিল বাইহাকী, হাদীস নং-৭৫২৭, মিশকাত-২০৬).

এ ব্যাপারে বুখারী শরীফে সুস্পষ্ট বহু হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। অনেকে না জানার দরুন সওয়াব রেসানীকে অস্বীকার করে থাকে। এটা ভুল, বরং সওয়াব রেসানী সহীহ ও সুন্নাত। .

(বুখারী শরীফ-হাদীস নং-৬৬৯৯, ফাতাওয়ায়ে শামী-৩/ ১৫২).

(৩) মৃত ব্যক্তির নিকটজন ও বন্ধু-বান্ধবদেরকে যথাসম্ভব ইয্যত সম্মান করবে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রথমা স্ত্রী হযরত খাদীজার (রা.) ইন্তিকালের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আত্বীয়-স্বজনদের নিকট হাদিয়া পাঠাতেন।

. (বুখারী শরীফ-হাদীস নং-৩৮১৬, মুসলিম শরীফ-হাদীস নং-২৪৩৫).

(৪) তার নিকটজন ও বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি তাদের বিপদ আপদের সময় সহায়তার হাত সমপ্রসারিত করবে।. (তিরমিযী শরীফ-২/ ১২).

(৫) মৃত ব্যক্তির ঋণ ও আমানত যা অন্যরা তার কাছে পায় তা তার মালিকদের নিকট পৌঁছে দিবে। কোন হক অনাদায় থাকলে চাই তা বান্দার হক হোক (যেমন-গীবত, কাউকে কষ্ট দেয়া, কারো টাকা-পযসার খেয়ানত করা ইত্যাদি) বা আল্লাহর হক হোক (যেমন- নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি) তা পরিশোধ ও আদায় করার

ব্যবস্থা করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কোন আল্লাহওয়ালা ঋণ আদায় না করে মারা গেলে কবরে তাকে জান্নাতের নিআমত থেকে বঞ্চিত রাখা হয়। কোন কোন হাদীসে আছে, তাকে বন্দী করে রাখা হয়। ফলে সে খুব পেরেশান থাকে। অতঃপর আত্বীয়-স্বজনরা উক্ত ঋণ আদায় করে দিলে নিআমত পেতে থাকে।

. (বুখারী শরীফ-হাদীস নং-২১২৭, আবু দাউদ শরীফ-হাদীস নং-৩৩৪১, আদ দুররুল মুখতার-৬/ ৭৬০).

কোন পিতা বা মাতা দুনিয়ার জেলখানায় বন্দি হলে সন্তানরা তাকে মুক্ত করার জন্য যাবতীয় চেষ্টা তদবীর চালিয়ে যায়। যে কোন উপায়ে তাকে মুক্ত করে আনে। অথচ পিতা তাকে মুক্ত করার জন্য সন্তানদেরকে বলে যায় না। ঠিক তদ্রুপ সন্তানদের কর্তব্য হল তারা স্বীয় পিতা-মাতা বা আত্মীয়দেরকে তাদের ঋণ পরিশোধ করে আখিরাতের জেলখানা থেকে মুক্ত করবে। কিন্তু সন্তানদের এই অনুভূতি জাগ্রত করার দায়িত্ব হচ্ছে পিতা-মাতা উভয়ের। আর এই অনুভূতি কেবল সেই সন্তানের মাঝেই জাগ্রত হবে যাকে তার পিতা-মাতা দীনী শিক্ষায় শিক্ষিত ও ইসলামী তাহযীব তামাদ্দুনে পরিপক্ক করে রেখে যাবে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে রেখে গেলে এবং তাদেরকে দীনদার বানিয়ে না গেলে বা দ্বীনদার বানানোর ব্যবস্থা না করে গেলে সন্তানের মধ্যে এই অনুভূতি জাগ্রত হওয়ার আশা দুরাশা বৈ কিছু নয়।.

(৬) মৃত ব্যক্তি কোন জায়েয ওসিয়্যত করে গেলে তার রেখে যাওয়া সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ দ্বারা তা পূরণ করবে। এর বেশি ওসিয়ত করে গেলে তা পূরণ করা

ওয়ারিছদের জন্য জরুরী নয়।.

(আদ দুররুল মুখতার-৬/ ৭৬০).

(৭) মাঝে মধ্যে তাদের কবর যিয়ারত করবে। হাদীস শরীফে কবর যিয়ারতের নির্দেশ ও ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। বিশেষ করে সন্তানের জন্য প্রতি শুক্রবার পিতা-মাতার কবর যিয়ারতের অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে।

. (শুআবুল ঈমান লিল বাইহাকী-হাদীস নং-৭৫২২, মিশকাত শরীফ, ১/ ১৫৪, রদ্দুল মুহতার-২/ ২৪২).

সুতরাং সম্ভব হলে প্রতি শুক্রবারে কবর যিয়ারত করা উচিত। প্রতি শুক্রবার সম্ভব না হলে যখনই সুযোগ হয় তখনই পিতা-মাতা ও অন্যান্য মুরব্বীদের কবর যিয়ারত করবে। এতে আখিরাতের কথা স্মরণ হয় এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা সহজ হয়। কবরে মায়্যিতকে দাফন করার পরপরই কবর যিয়ারত করা যায় এবং একাকী বা সম্মিলিত উভয় সূরতেই দু'আ করা জায়েয। কবর যিয়ারতের নিয়ম এই যে, সম্ভব হলে মুর্দার পায়ের দিক দিয়ে কবরের পশ্চিম পার্শ্বে গিয়ে পূর্বমুখী হয়ে অর্থাৎ মুর্দার চেহারামুখী হয়ে দাঁড়াবে। প্রথমে কবরবাসীদেরকে এইভাবে সালাম করবে :.

السلام عليكم يا اهل القبور، يغفر الله لنا ولكم انتم لنا سلف ونحن بالاثر

.এরপর সম্ভব হলে সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করবে বা কমপক্ষে সূরা ফাতিহা একবার, সূরা ইখলাস তিনবার এবং দরূদ শরীফ এগারবার পড়ে মুর্দার জন্য সওয়াব রেসানী করবে। যদি ঐ অবস্থায় পূর্বমুখী হয়ে দু'আ করে, তাহলে হাত তুলবে না। আর যদি কিবলামুখী হয়ে দু'আ করে, তাহলে হাত তুলতে পারে। এরপর আদবের সাথে কবরস্থান থেকে চলে আসবে এবং কবরবাসীদের থেকে নসীহত হাসিল করবে।

. (রদ্দুল মুহতার, ২/ ২৪২, ইমদাদুল ফাতাওয়া-১/ ৫০০, আহসানুল ফাতাওয়া-৪/ ২১২)

মহিলাদের ইদ্দত পালনের নিয়ম.

মৃত ব্যক্তি যদি পুরুষ হয়, তাহলে তার স্ত্রী গর্ভবতী না হলে চার মাস দশদিন ইদ্দত/ শোক পালন করবে। আর গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে। ইদ্দত পালনের অর্থ হল, স্বামী-স্ত্রী যে ঘরে বসবাস করত, উল্লেখিত সময় অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত ঐ ঘরেই তাকে অবস্থান করতে হবে। চিকিৎসা বা জীবিকার প্রয়োজন ছাড়া বাড়ি থেকে বাইরে বের হওয়া জায়েয নয়। সুতরাং ইদ্দত অবস্থায় কোথাও বেড়াতে যাওয়া, রোগী দেখতে যাওয়া বা কোন অনুষ্ঠানে যাওয়া নাজায়েয ও হারাম। তাছাড়া ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত কোন রকম সাজ-সজ্জা গ্রহণ করাও নিষেধ।.

কাজেই ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত অলংকার পরা, হাতে মেহেদী লাগানো, আতর বা খুশবু লাগানো, সাজগোজের কাপড় পরা, চিকন দাঁতের চিরুনী দ্বারা চুল আচড়ানো বা এ ধরনের যত সাজ-সজ্জা মহিলারা করে থাকে তা সবই নিষেধ। এ অবস্থায় একদম সাদাসিধা থাকা জরুরী। এমনকি পান খাওয়ায় অভ্যস্ত থাকলে তা খেয়ে ঠোট লাল করা যাবে না।

বর্ণিত মাসআলাটি সম্পর্কে সমাজের অধিকাংশ মহিলারাই অজ্ঞ। সুতরাং মাসআলাটির ব্যাপারে ব্যাপক আলোচনা ও প্রচার হওয়া জরুরী। . (আদ দুররুল মুখতার- ৩/ ৫১০, ৫১১, ৫৩১, হিদায়া-২/ ৪২৩, ৩/ ৪২৭).

এছাড়া যত আত্বীয়-স্বজন রয়েছে, তাদের মৃত্যুতে মাত্র তিনদিন শোক পালন করবে। এর বেশি জায়েয নেই। হযরত আবু সুফিয়ান (রা.)-এর ইন্তিকালে তদীয় কন্যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবি উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রা.) তিন দিন শোক পালন শেষ মেহেদী ব্যবহার করেছিলেন এবং বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল হয়ে গেছে, তাই মেহেদী ব্যবহারের কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু গতকাল আমার পিতার ইন্তিকালে আমার তিনদিনের শোক পালন শেষ হয়ে গেছে এটাকে কাজে পরিণত করে দেখানোর জন্যই এ মেহেদী ব্যবহার করেছি।

দ্রুত সম্পদ বণ্টন জরুরী.

কাফন-দাফন শেষে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোন হক্কানী আলিম মুফতীর মাধ্যমে ওয়ারিছদের মাঝে মীরাছ বণ্টন করে প্রত্যেককে তার নির্ধারিত অংশে তার মালিকানা বুঝিয়ে দিবে। নাবালিগ ছেলে বা মেয়ের অংশ-ইয়াতীমের যিনি অভিভাবক বা মুরব্বী হবে এবং ইয়াতীম ও তার ধন-সম্পদ যিনি দেখাশুনা করবেন, তার হাতে বুঝিয়ে দিবে। এটা খুবই জরুরী।.

(সূরা নিসা, আয়াত-৬/ মাআরিফুল কুরআন, ২/ ৩০৬).

কারণ, জরুরী ভিত্তিতে এটা করা না হলে প্রথমত ওয়ারিছদের মধ্যে কেউ নাবালিগ থাকলে তার মাল খাওয়া পড়বে। আর ইয়াতীমের মাল খাওয়া মানে জাহান্নামের আগুন দ্বারা উদর/ পেট ভর্তি করা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'নিশ্চয়ই যারা ইয়াতীমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে, তারা তাদের পেটে আগুন ভরে'।.

হ্যাঁ, যদি কেউ স্ত্রীকে গর্ভবতী অবস্থায় রেখে মারা যায়, তাহলে তখন বাচ্চা প্রসব হওয়া পর্যন্ত মীরাছ বণ্টনে বিলম্ব করবে। কারণ, পেটে ছেলে কি মেয়ে তা জানা নেই। আর উভয়ের মীরাছ এক সমান নয়, তাই দেরী করার প্রয়োজন রয়েছে।. (ইসলাহে ইনকিলাবে উম্মত-সূত্র : আহকামে মায়্যিত-১৯০).

দ্বিতীয়ত ওয়ারিশদের মধ্যে কেউ নাবালিগ না থাকলেও বোনদের অংশ গোটা সম্পদে রয়েছে। আর দ্রুত মীরাস বণ্টন না করা হলে শরঈ অনুমতি ব্যতীত তাদের সম্পদ ভক্ষণ করা হয়, এটাও জুলুমের পর্যায়ভুক্ত এবং অন্যের হক নষ্ট করার শামিল। তাছাড়া এর দ্বারা নিজেরও হারাম খাওয়া হয়, স্ত্রী-সন্তানদেরকেও হারাম খাওয়ানো হয়।

ইয়াতীমের দেখাশুনার ফযীলত.

কেউ যদি ইয়াতীম তথা নাবালিগ ছেলেমেয়ে রেখে মারা যায়, তাহলে সে যেন দীনী শিক্ষা লাভ করতে পারে মৃত ব্যক্তির নিকটজনরা সেদিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখবে। হাদীস শরীফে ইয়াতীমের দেখাশুনা করার অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ইরশাদ করেন, আমি ও ইয়াতীমের লালন-পালনকারী এই দুই আঙ্গুলের মত। অর্থাৎ হাতের দুটি আঙ্গুল যেমন পাশাপাশি আছে তদ্রুপ ইয়াতীমের লালন-পালনকারী জান্নাতে আমার সাথে পাশাপাশি অবস্থান করবে। .

(বুখারী শরীফ-হাদীস নং- ৫৩০৪, ৭১৩৮, মুসলিম শরীফ-হাদীস নং-১৮২৯).

বিধবা মহিলার বিবাহ দেয়া শরীয়তের হুকুম.

ইয়াতীম বাচ্চার দেখাশুনা বা এ ধরনের কোন শরঈ উযর না থাকলে আত্মীয়-স্বজনগণ বিধবা মহিলাদের বিবাহের ব্যবস্থা করবে। কুরআনে কারীমে তাদেরকে বিবাহ দেয়ার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে, তোমাদের মধ্যে যারা বিধবা তাদেরকে বিবাহ করিয়ে দাও।.

(সূরা বাকারা-আয়াত-২৩৪/ ২৪০, সূরা নূর, আয়াত-৩২).

হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিবিগণের মধ্যে হযরত আয়িশা (রা.) ছাড়া সবাই ছিলেন বিধবা।.

(সীরাতে খাতামুল আম্বিয়া-২৬, তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহিম-১/ ৯৭).

বিধবাদেরকে বিবাহ না দেয়া বা তাদের বিবাহ না বসা হিন্দুয়ানী প্রথা। কেউ এ প্রথাকে পছন্দ করলে তার ঈমান থাকবে না। ইসলাম বিধবা বিবাহকে ব্যাপক করার ব্যাপারে অনেক তাকীদ মূলক বাক্য ব্যবহার করেছে। .

(মুসনাদে আহমদ-হাদীস নং-১৯৮০৭).

বিধবা বিবাহের মধ্যে বহুবিধ কল্যাণ রয়েছে এবং তা না করার মধ্যে অনেক ক্ষতির আশংকা রয়েছে। যেমন, তাদের বিবাহ না হলে যিনা ব্যাপক হয়ে এমন রোগ ছড়িয়ে পড়বে, যার নাম পূর্বের লোকেরাও শুনেনি।

দাফন পরবর্তী বর্জনীয় কাজ.

সওয়াব রেসানীর নামে বর্তমানে এমন অনেক কাজ করা হয়, শরীআতে যার কোন ভিত্তি নেই।.

(১) জন্ম বার্ষিকী, মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা, এ সব ইহুদী, খৃষ্টান ও হিন্দুদের সংস্কৃতি। দীনী ইলম না থাকার দরুন এ সব বিদআত ও বদরসম মুসলমানরা ভাল কাজ মনে করে চালু করে দিয়েছে। এগুলো মারাত্মক গুনাহের কাজ। এ ধরনের গুনাহ থেকে অনেকের তাওবা ও নসীব হয় না। সুতরাং এগুলো অবশ্যই ত্যাগ করা কর্তব্য। .

(বুখারী শরীফ-হাদীস নং-৫৮৯২, মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-২৫৯).

শরীআতের দৃষ্টিতে সারা বছর বাপ-মায়ের জন্য সওয়াব রেসানী করা কর্তব্য। এর শরীআত কোন দিন তারিখ নির্দিষ্ট করেনি। সুতরাং আমাদের জন্যও মৃত্যুর দিনকে সওয়াব রেসানীর জন্য নির্দিষ্ট করে নেয়া জায়েয নেই, তারপরও একদিন যদি একটু বেশি করতে মনে চায় তা করবে, কিন্তু সেটা ঠিক মৃত্যুর তারিখে হওয়া জরুরী মনে করবে না বরং; যে কোন দিন করলে চলবে।.

(২) সওয়াব রেসানীর জন্য অনেকে তিন দিনা, সাত দিনা, ত্রিশা, চল্লিশা বা এ জাতীয় রসমী অনুষ্ঠান করে, কুলখানী করে, মীলাদ পড়ায়, ধুমধামের সাথে ধনী লোক ও আত্মীয়-স্বজনদের দাওয়াত করে খাওয়ায় ইত্যাদি। এগুলো ভুল ও হিন্দুয়ানী তরীকা। শরীআতের দৃষ্টিতে খুশীর সময় দাওয়াত খাওয়ানোর নিয়ম। আর পিতা-মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যু কোন খুশীর বিষয় নয়। তাই এ সময় দাওয়াত খাওয়ানো কুসংস্কার। একান্ত যদি সওয়াব পৌঁছানোর জন্য কেউ খানা খাওয়াতে চায়, তাহলে শুধু গরীবদেরকে দাওয়াত করে খাওয়াবে। আর উন্নতমানের গরীব হচ্ছে গরীব তালিবে ইলম। সুতরাং তাদেরকে খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে কোন ভাল মাদরাসার লিল্লাহ বোর্ডিংয়ে উক্ত টাকা দিয়ে দিবে।.

(রদ্দুল মুহতার, ২/ ২৪০, আহকামে মায়্যিত-২৪১, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুম-৫/ ৪৪, ফাতাওয়া রহীমিয়া-১/ ৩৯৬).

বলা বাহুল্য, মুর্দাকে কবরে রাখার পরবর্তী মুহূর্ত হতেই সে সন্তানাদি এবং আত্মীয়দের পক্ষ থেকে সওয়াব রেসানীর অপেক্ষা করতে থাকে। আর আত্মীয়-স্বজন চায় ত্রিশ দিন বা চল্লিশ দিন পর তা পাঠাতে। তাহলে তা কত বড় নির্বুদ্ধিতা! কারো পিতা যদি কোন কারণে জেলে যায়, তাহলে কোন আহমক ছেলে আছে কি যে চল্লিশ দিন পর পিতাকে জেল থেকে বের করার তদবীর শুরু করে? নিশ্চয়ই না! সুতরাং ত্রিশা, চল্লিশা হিন্দুয়ানী প্রথা, তা অবশ্যই পরিত্যাগ করা উচিত। . (ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়া, ১৩৭).

অনেকে টাকা-পয়সার বিনিময়ে অর্থাৎ চুক্তির মাধ্যমে কুরআন ও শবীনা খতম, মীলাদ ইত্যাদি পড়িয়ে সওয়াব রেসানী করে অথবা চুক্তি ছাড়া এমনিতেই হাদিয়া বলে তিলাওয়াতকারীদের কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে থাকে। তাদের এ কাজ হারাম ও নাজায়েয। এতে তারাও গুনাহগার হয় আর তিলাওয়াতকারীও গুনাহগার হয় এবং মাসআলা না জানার দরুন হারাম পয়সা গ্রহণ করে। আর মৃত ব্যক্তির আমলনামায় কিছুই পৌঁছে না।.

(ফাতাওয়ায়ে শামী-২/ ২৪১, ৬/ ৫৬, আহসানুল ফাতাওয়া-১/ ৩৭৫).

কারণ, এ ব্যাপারে শরীআতের বিধান হল, প্রথমে তিলাওয়াতকারী সওয়াব পায়। তারপর তিনি যার নামে বখশে দেন, সে ব্যক্তি সওয়াব পায় আর তিলাওয়াতকারী যদি বিনিময় গ্রহণের আশায় পড়ে বা পড়ার কারণে বিনিময় গ্রহণ করে, তাহলে গলত নিয়তের কারণে সে নিজেই কোন সওয়াব পায় না তথা তার সওয়াবই বাতিল হয়ে যায়। এরপর সে ব্যক্তি যদি অন্যকে বখশে দেয়, তাহলে কি জিনিস বখশে দিল? তার কাছে তো বখশে দেয়ার মত কোন সওয়াবই নেই। সুতরাং বর্তমানে এ জাতীয় যে প্রথা চলছে, কুরআন হাদীসের দৃষ্টিতে তা সম্পূর্ণ নাজায়েয এবং ধোঁকা ও প্রতারণার শামিল।.

(রদ্দুল মুহতার, ৬/ ৫৬-৫৭/ আহসানুল ফাতাওয়া-১১/ ৩৭৫).

হাশরের ময়দানে দেখা যাবে মুর্দার আলনামায় কিছুই পৌঁছেনি। তখন গলদ তরীকায় যারা খতম পড়িয়েছে এবং বুঝে শুনে এভাবে যারা খতমের বিনিময়ে হারাম পয়সা গ্রহণ

করেছে, তাদের চরম বেইজ্জতী হবে। সুতরাং মুর্দার আত্মীয়গণ নিজেরাই যতটুকু পারে কুরআন পড়ে সওয়াব বখশে দিবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, তিনবার সূরা ইখলাস পড়লে এক খতম কুরআন তিলাওয়াতের সওয়াব পাওয়া যায়। যারা তিলাওয়াত জানেনা তারা এটা পড়ে দিবে বা এমন আলিম দ্বারা পড়াবে যারা সওয়াব রেসানী করে টাকা-পয়সা গ্রহণ করেন না। এর জন্য উত্তম ব্যবস্থা হচ্ছে আলিম-উলামাদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং তাদের নিকট সর্বদা যাতায়াত করা। তাহলে তার আত্বীয়-স্বজনের মৃত্যুতে সে বিনিময় প্রদান ছাড়াই উক্ত আলিমগণের তিলাওয়াত অবশ্যই পাবে ইনশা-আল্লাহ। খবরদার! অনর্থক রসম পালন করবে না। কারণ, তাতে কোন ফায়েদা তো নেই, বরং হারাম পন্থায় পয়সা দেয়ার কারণে গুনাহগার হতে হয়।.

উল্লেখ্য যে, কেউ যদি দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে কুরআন শরীফ পড়ায়, যেমন-ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতির জন্য, রোগ-ব্যাধি ভাল হওয়ার জন্য বা ব্যবসা-বাণিজ্যে বরকত হওয়ার জন্য, তাহলে সেক্ষেত্রে বিনিময় দেয়া ও নেয়া উভয়টা জায়েয। এতে শরীআতের দৃষ্টিতে কোন অসুবিধা নেই। .

(বুখারী শরীফ-২/ ৮৫৪, মুসলিম শরীফ-২/ ২২৪).

(৩) সওয়াব রেসানীর আরেকটি তরীকা হচ্ছে-গরীব-মিসকীনদের কে খানা খাওয়ানো। অনেকে মায়্যিতের ইজমালী সম্পত্তি থেকে খানা খাওয়ায়। এ ক্ষেত্রে সকল ওয়ারিশ যদি বালিগ হয় এবং সকলের পরামর্শে বা সম্মতিতে তা হয়, তাহলে শরীআতের দৃষ্টিতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু কোন একজন ওয়ারিশও যদি নাবালিগ বা পাগল থাকে বা কেউ

এতে অসম্মত থাকে, তাহলে এরূপ করা নাজায়েয হবে এবং এই খানা খাওয়াও নাজায়েয হবে। এর দ্বারা ইয়াতীমের মাল খাওয়ার গুনাহ হবে, যদিও ঐ নাবালিগ বা পাগল অনুমতি দেয়। কেননা শরীআতে তার অনুমতি গ্রহণযোগ্য নয়। এজন্য উত্তম পদ্ধতি হল সম্পত্তি বন্টনের পর বালিগ ওয়ারিছগণ নিজস্ব মাল থেকে তাওফীক অনুযায়ী খাওয়াবে।.

(বাইহাক্বী শরীফ-৬/ ১০১)

ইয়াতীমের মাল খাওয়া.

বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইয়াতীমের মালের সঠিক তদারকী করা হয় না। যার পরিণতিতে ইয়াতীম নাবালিগ সন্তানের মুরব্বী যেমন, মা বা বড় ভাই যারা থাকে, তারা নিজেরাই ইয়াতীমের মাল খেয়ে তাকে। আত্বীয়-স্বজন ও মেহমানদের খাওয়ায়ে তাকে। মসজিদ-মাদরাসায় দান করে থাকে। আলেম উলামাদেরকে দওয়াত করে খাইযে থাকে। অনেক বছর পর ইয়াতীম সন্তান যখন বড় হয়, তখন তাকে শুধু জমি ও বাড়ির অংশ বুঝিয়ে দেয়া হয়। অথচ এত বৎসর তার ঐ সব সম্পত্তিতে যে ফসল উৎপন্ন হয়েছে বা ভাড়া পাওয়া গিযেছে বা উপার্জন হয়েছে, তা থেকে তার পিছনে আয়ের সবটা ব্যয় হয়নি! অথচ এ বর্ধিত অংশ নিজেরা খরচ করে ফেলে, ইয়াতীমকে বুঝিয়ে দেয় না।.

মনে রাখবেন, এসবই ইয়াতীমের মাল খাওয়ার দরুণ হারাম ও জাহান্নাম খরীদ করার শামিল। ইয়াতীম অর্থাৎ নাবালিগ সন্তান বড়দের সমান অংশ পাবে। কোন ক্ষেত্রে এক কড়া ক্রান্তিও কম পাবে না। তারপর ইয়াতীমের অভিভাবক উক্ত মাল থেকে তার ভরণ-পোষণ, চিকিৎসা ও লেখা-

পড়ার জন্য খরচ করতে থাকবে এবং অবশিষ্ট অংশ তার নামে হিফাজত করতে থাকবে। যখন ইয়াতীম সন্তান বালিগ ও বুদ্ধিমান হবে তখন তার সমুদয় সম্পত্তি এবং তার থেকে বর্ধিত আয় তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। ব্যাপারটি বড়ই নাজুক। কারণ, কুরআন শরীফে ইরশাদ হয়েছে, 'যারা অবৈধভাবে ইয়াতীমের মাল খায়, তারা তাদের পেটে জাহান্নামের আগুন ভরে'। . (সূরা নিসা, -১০).

উল্লেখ্য, শুধু মৃত গরীবের সন্তানকেই ইয়াতীম বলা হয় না, বরং কোটিপতির নাবালিগ ছেলে বা মেয়েও শরীআতের পরিভাষায় ইয়াতীম। সুতরাং তাদের মাল কোনভাবে খাওয়াও ইয়াতীমের মাল খাওয়া এবং জাহান্নামের আগুন খাওয়ার নামান্তর। . (কাওয়ায়িদুল ফিক্হ-৫৫৪).

 বোনদের মাল খাওয়া.

বোনদের অংশও তাদের হাতে বুজিয়ে দেয়া জরুরী। এ ক্ষেত্রে একটি মারাত্মক অপরাধ হচ্ছে যে, সাধারণত ভাইয়েরা বোনদের অংশ দেয় না বা দিলেও সামান্য কিছু দিয়ে বিদায় করে দেয়। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে, বোনেরা লৌকিকতা করে ভাইদেরকে বলে যে, আমি অংশ নিব না। ভাইকে দিয়ে দিলাম। বোনদের এ কথায় তো ভাইয়েরা মহাখুশী। বোনদের খুবই আদর-যত্ন শুরু করে দেয়। তারা একটিবারও চিন্তা করে না যে, বোনেরা এ কথা কেন বলে? তাদের কি সম্পদের প্রয়োজন নেই? না তাদের সন্তান নেই? সবই তো আছে! তাহলে তারা নিজেদের অংশ কেন ছেড়ে দিচ্ছে? আসল কথা এই যে, অধিকাংশ বোনেরা মনে করে যে, আমি যদি বাপের অংশ গ্রহণ করি, তাহলে বাপের

ভিটায় আসার রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে।.

ভাইয়েরা স্থান দেবে না, খাতির-তোয়াযও করবে না। সুতরাং সে রাস্তা জারী রাখার জন্য যখন দেখে যে, এর বিকল্প কোন পথ নেই, তখন তারা লৌকিকতা করে তাদের অংশের দাবী ছেড়ে দেয়। অথচ এভাবে দাবী ছাড়লে উক্ত সম্পত্তি ভাইয়ের জন্য কখনো হালাল হয় না। কেননা, অন্তরে পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে একজনের মাল অপরজনের জন্য হালাল নয়।.

(মিশকাত শরীফ-২/ ৪১৯, ১/ ২৬১, বাইহাক্বী শরীফ-হাদীস নং-১১৫৪৫, ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়া-২/ ২৫৫).

সুতরাং বোনদেরকে ঠকানো বা লৌকিকতার ভিত্তিতে প্রাপ্ত মাল অবৈধ ও হারাম। এতে বান্দার হক নষ্ট করা হয়, যা মহাপাপ। ইয়াতীমের মাল খাওয়ার মত এটা এত বড় পাপ যে, আল্লাহ তাআলা তা ক্ষমা করবেন না। কিয়ামতের ময়দানে এর বদলে নেকী দিতে হবে। নেকী শেষ হয়ে গেলে পাওনাদারদের গুনাহের বোঝা নিতে হবে। তাছাড়া এর দ্বারা নিজেও হারাম খাওয়া হয় এবং স্ত্রী সন্তানদেরকেও হারাম খাওয়ানো হয়। এতে সন্তান নাফরমান হয়ে যায়। সুতরাং কখনো এ ধরনের লোভ করা উচিত নয়।.

এ ব্যাপারে শরীআতের দৃষ্টিভঙ্গি হল, পিতা-মাতার মৃত্যুর পর ভাইয়েরা বোনদের ন্যায্য অংশ তাদের হাতে বুঝিয়ে দেবে এবং তাদের লৌকিকতার দান গ্রহণ করবে না বরং বুঝিয়ে বলবে যে, তোমাদেরও মালের প্রয়োজন আছে। তোমাদের সন্তানাদিরও মালের প্রয়োজন পড়বে।.

সুতরাং তোমাদের অংশ তোমরা অবশ্যই নিয়ে যাও। আমরা আজীবন আমাদের নিজস্ব মাল দ্বারা সাধ্যানুযায়ী

তোমাদের খেদমত ও দেখাশুনা করব ইনশাআল্লাহ। কারণ, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে, কেউ যদি নিজের হায়াত ও মালের মধ্যে বরকত চায়, তাহলে সে যেন সিলা রেহমী করে। আত্মীয়-স্বজন বিশেষ করে বোন, ফুফু ও খালাদের খেদমত করে এবং তাদের খোঁজ-খবর রাখে।.

(মাআরিফুল কুরআন বাংলা, সৌদি সংস্করণ, ২৩৬, বুখারী শরীফ-হাদীস নং-৫৯৮৬, মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-২৫৫৭, আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং-১৬৯৩, মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং-১২১৬, আযীযুল ফাতাওয়া-৭৮৩, ইমদাদুল মুফতীন-১০৫১).

এভাবে বুঝিয়ে বললে দেখা যাবে- তারা তাদের অংশ গ্রহণ করতে রাজী হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, এভাবে বুঝিয়ে বলে যখন তাদেরকে তাদের অংশের মালিক বানিয়ে দেয়া হবে, এরপরও যদি কোন বোন নিজের মালের একাংশ নিজের ভাইকে হাদিয়া দেয়, তাহলে শরীআতের দৃষ্টিতে সেটা গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই; বরং সেটা ভাইয়ের জন্য হালাল হবে। উল্লেখ্য যে, মহিলাদের মহরের ব্যাপারটিও এর উপর ভিত্তি করে বুঝে নেয়া কর্তব্য। কোন চাপে বা লৌকিকতা করে যদি তারা মহর মাফ করে দেয়, তাহলে তা কখনো মাফ হবে না; বরং মহরানা পরিশোধের পর বা পূর্ণরূপে তাদের মালিকানা বুঝিয়ে দেয়ার পর যদি তা থেকে কিছু হাদিয়া হিসেবে দেয়, তাহলে তা স্বামীর জন্য গ্রহণ করা জায়েয, অন্যথায় নয়।.

(সূরা নিসা-৪, মাআরিফুল কুরআন-২/ ২৯৮, বাইহাক্বী শরীফ-৬/ ১০১).

(৪) সওয়াব রেসানীর প্রচলিত আরেকটি বদরসম হল- মাইকে শবীনা বা খতম পড়ানো। শরীয়তের দৃষ্টিতে এর মধ্যে অনেকগুলি হারাম কাজের সমন্বয় পাওয়া যায়। যেমন রিয়াকারী, লোক দেখানো, কুরআন তিলাওয়াতের বেহুরমতী ইত্যাদি। . (ফাতাওয়ায়ে শামী-২/ ২৪১).

সুনাম-সুখ্যাতি উদ্দেশ্য না হলে মাইকে পড়ানোর প্রয়োজ কি? আল্লাহ তো আর বধির নন। তাছাড়া এলাকার লোকেরাও তার কাছে মাইকে কুরআন শোনানোর জন্য দরখাস্ত করেননি।তাহলে নাম কামানো ছাড়া আর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে? এছাড়াও এর কারণে সারারাত মানুষের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়ে তাদেরকে মহা সমস্যায় ফেলা হয়। আশপাশের লোকজন পেরেশান হয়ে যায়। অসুস্থ ব্যক্তিরা ঘুম না হওয়ায় আরোবেশী অসুস্থ হয়ে পড়ে। অথচ শরীয়ত কাউকে এভাবে সমস্যায় ফেলার অনুমতি দেয় না। যারা রাতে যিকির-আযকার করে, তাহাজ্জুদ পড়ে তাদেরও এ কারণে ভীষণ অসুবিধা হয়। তাছাড়া এতে কুরআনের বেহুরমতী হয় প্রচণ্ডভাবে। কেননা যেখানে সকলে মনোযোগের সাথে কুরআন শ্রবণ করে শুধুমাত্র সেখানেই উচ্চস্বরে কুরআন তিলাওয়াতের অনুমতি আছে। কিন্তু যেখানে সকলে স্ব স্ব কাজে ব্যস্ত, কুরআন শোনার মত ফুরসত তাদের কারো নেই সেখানে আওয়াজ করে কুরআন তিলাওয়াত ঠিক নয়। এভাবে অনেকগুলি হারামের সমষ্টির নাম হচ্ছে প্রচলিত শবীনা বা খতম পড়ানো। তারপর যদি তা আবার অর্থের বিনিময়ে হয়, তাহলে তো গুনাহের মাত্রা কয়েকগুণ বেড়ে যায়। এরপর এ সব হারাম ও গুনাহের সমষ্টিকে সওয়াব মনে করা আরেকটি হারাম এবং তা ঈমানের জন্য মারাত্মক হুমকী স্বরূপ। আর এতসব হারামকে

সওয়াব মনে করে বাপ-মায়ের রূহে বখশে দেয়া যে কতবড় অপরাধ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং এসব বদরসম বন্ধ করা একান্ত জরুরী।.

(সূরা আ'রাফ-২০০৪, মিশকাত শরীফ- ৪০৩, মাজমাউয যাওয়ায়িদ ১/ ১৯১, ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া-১/ ১৮৮, আযীযুল ফাতাওয়া-৯৮, আহসানুল ফাতাওয়া-১/ ৩৪৭).

তবে অবস্থা যদি এরূপ হয় যে, কোথাও জায়েয পন্থায় সহীহ ভাবে কুরআন তিলাওয়াত হয় বা কুরআন শরীফের খতম হয়, এবং অনেক লোক আদবের সাথে সেই তিলাওয়াত শুনতে আগ্রহী হয়, আর তিলাওয়াতকারীর আওয়াজ তাদের সকলের নিকট পৌঁছতে মাইকের প্রয়োজন হয় এবং এমন সাউন্ড বক্স ব্যবহার করা হয়- যার আওয়াজ উক্ত মজলিসে সীমাবদ্ধ থাকে, যাতে অন্য লোকদের অসুবিধা না হয় তাহলে এ ধরনের অনুষ্ঠানে মাইক ব্যবহার করতে কোন অসুবিধা নেই।.

(৫) সওয়াব রেসানীর আরেকটি গলত প্রথা হল, প্রচলিত পদ্ধতিতে মীলাদ পড়ানো। যার মধ্যে সূরা ক্বিরা'আত তেমন কিছু পড়া হয় না; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতেরও কোন আলোচনা হয় না বরং .

(ক) কিছু আরবী, ফারসী, বাংলা কবিতা গাওয়া হয়!
.

(খ) তাওয়াল্লুদ-এর নামে এক উদ্ভট জিনিস পড়া হয়, যার প্রমাণ শরীআতে নেই, . (গ) এরপর দরূদের নামে 'ইয়া নবী সালামালাইকা' ইত্যাদি পড়া হয়,

অথচ এটা কোন দরূদ নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের জন্য বহু দরূদ রেখে গেছেন- যা সহীহ হাদীসে বিদ্যমান রয়েছে। তার মধ্যে এ ধরনের কোন দরূদ নেই। যেভাবে পড়া হয় এবং যা পড়া হয় তার শব্দগুলোও সহীহ নয়। আর এগুলো আরবী ব্যাকারণেরও পরিপন্থী এবং এর অর্থও সহীহ নয়। এগুলোর ব্যাখ্যা কোন মুহাক্কিক আলিম থেকে জেনে নিবেন। এ ক্ষুদ্র পরিসরে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব নয়। উল্লেখিত তিনটি গলতের সমষ্টির নাম হচ্ছে মীলাদ বা মৌলুদ শরীফ। এর মধ্যে সওয়াব হওয়ার মত কিছুই নেই। এরপরও সেটাকে মহা সওয়াবের কাজ মনে করে বখশে দেয়া হচ্ছে। উম্মত দ্বীনী শিক্ষার ব্যাপারে গাফেল থাকার কারণেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তবে কেউ যদি সহী ভাবে মীলাদ পড়াতে বা দু'আ করাতে চায়, তাহলে তার পদ্ধতি হল- কুরআনে কারীম থেকে সূরা ইখলাস বা সূরা ইয়াসীন কিংবা অন্য কোন সূরা তিলাওয়াত করবে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত (যা তার দুনিয়ায় আগমনের এবং মীলাদের প্রধান উদ্দেশ্য) থেকে কিছু বর্ণনা করবে। তারপর সহীহ হাদীসে যে সব দরূদ বর্ণিত হয়েছে, তার থেকে যেটা সহজ মনে করা হয়, সেটা প্রত্যেকে নিজস্ব ভাবে এগারবার বা কম বেশি পড়ে নিবে। এরপর উপস্থিত লোকেরা সকলে মিলে দু'আকরে দিবে। এরূপ মীলাদ যদি সওয়াব রেসানীর উদ্দেশ্যে পড়ানো হয়, তাহলে এর দ্বারা সওয়াবের আশা করা যেতে পারে।.

বরং এ ধরনের মীলাদ বা বয়ানের দ্বারা যেহেতু সাধারণ মানুষ শরীআতের অনেক জরুরী মাসায়িল শিক্ষা লাভ করে থাকে, যা দীনের দাওয়াত ও তা'লীমের বিরাট মাধ্যম। সুতরাং এর দ্বারা বড় ধরনের সওয়াবের আশা করা যায়

এবং তা বখশেও দেয়া যায়। তবে এর জন্য কোন প্রকার বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয হবে না। আর যদি দুনিয়াবী কোন উদ্দেশ্যে মীলাদ পড়ানো হয়, তাহলে বিনিময় গ্রহণ ও লেনদেন করতে কোন অসুবিধা নেই।

. (নাসায়ী শরীফ-১৫৭৮, তালীফাতে রশীদিয়া-১১২-১১৩, আহসানুল ফাতাওয়া-১/ ৩৪৮).

উল্লেখ্য, সওয়াব রেসানীর লক্ষ্যে এ'লান বা ঘোষণা করে লোকজন জমা করা এবং শোকসভা করা শরীআতের দৃষ্টিতে ঠিক নয়। মৃত্যু সংবাদ জানার পর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব প্রত্যেকে নিজ স্থানে যতটুকু সম্ভব কুরআন তিলাওয়াত করে বা তিনবার সূরা ইখলাস পড়ে সওয়াব রেসানী করে দিবে, এটাই সহীহ তরীকা। তাছাড়া এটাও হতে পারে যে, কোথাও জায়েয কোন উদ্দেশ্যে লোকজন জমা হয়েছে, যেমন- ওয়াজ মাহফিলে বা কোন বয়ানের ব্যবস্থা করা হলে বা মাদরাসার মধ্যে ছাত্র শিক্ষক এমনিতেই সর্বদা উপস্থিত থাকেন; তারা নামাযের পর বা অন্য কোন সময় খাস কোন মুর্দার জন্য দু'আ করে দেবেন। এতে কোন অসুবিধা নেই। .

(ফাতাওয়ায়ে শামী-২/ ২৪০, আহকামে মায়্যিত-২৪৪).

(৬) মৃত ব্যক্তি নাজায়েয কোন অসিয়্যত করে গেলে তা পূর্ণ করবে না। যেমন- অনেকে দূর দেশে বা নিজ বাড়ীতে তাকে দাফন করার জন্য অসিয়তে করে গেছে এমনিভাবে মৃত্যুর পর তার চোখ বা কিডনী কাউকে দান করে দেয়ার ব্যাপারে অসিয়্যত করে যায়, সেই অসিয়্যত সম্পূর্ণ নাজায়েয এবং তা পূরা করাও নাজায়েয। . (আহকামে মায়্যিত-২২৬).

(৭) ত্বড়িৎ সম্পত্তি বন্টন করে যার যার অংশ বুঝিয়ে দেয়ার ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করা হয়। অধিকাংশ লোক সম্পদ বন্টনে কয়েক বছর দেরী করে থাকে। এমনকি অনেকে তো মীরাছ বন্টনই করে না, এটা নাজায়েয। যার ফলে একজন অন্যজনের, ভাইয়েরা বোনদের এবং মা-ভাই বোনেরা ইয়াতীমের অংশ খেতে থাকে। এতে করে তাদের রিযিকে হারামের সংমিশ্রণ ঘটে তাদের রিযিক হারাম হয়ে যায়। অনেকে এই অজুহাতে মীরাছ বন্টন করে না যে, এর দ্বারা আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবে, যা একেবারেই খোড়া অজুহাত। বরং এর দ্বারা আরো আত্মীয়তার সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। . (আহকামে মায়্যিত/ ১৪৬-১৪৯).

(৮) কোন কোন বিধবা মেয়েরা বলে থাকে যে, বিবাহ তো জীবনে একবারই হয়, এটা কুফরী কথা এবং হিন্দুয়ানী প্রথা। সুতরাং এ জাতীয় ঈমান বিধ্বংসী কথা-বার্তা থেকে খুবই সতর্ক থাকবে! পূর্বেও বলা হয়েছে যে, ইসলামে বিধবাকে বিবাহ দেয়ার ব্যাপারে খুবই তাকিদ দেয়া হয়েছে। এমনকি কোন বিধবা মহিলা যদি নিজের ইজ্জতের হিফাজতকে কঠিন মনে করে, সে ক্ষেত্রে তার জন্য বিবাহ করা ফরয করা হয়েছে। .

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ সব বিষয়ের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

সমাপ্ত